চক্রধারী

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বুক-ষ্ট্যাণ্ড

১/১/১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ ও
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল
বুক ষ্ট্যাণ্ড
১-১-১এ, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৫৪

মূল্য
চারি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৮২সি বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এ-নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি !
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী !
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',
আর, সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

কাজি নজরুল

নিবেদন

'চক্রধারী'র পিছনে একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু বলা আবশ্যক।

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর অনুপ্রেরণায় ভারতীয় আগষ্ট-বিপ্লবকে ভিত্তি ক'রে 'সৈনিক' নামে একটি বড়গল্প লিখে মাসিক বঙ্গশ্রী পত্রিকায় দেই। বঙ্গশ্রীর পরপর দু'সংখ্যায় 'সৈনিক' প্রকাশ হবার পর আমার কয়েকজন সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বন্ধু কাহিনীটিকে উপন্যাসে রূপ দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান এবং তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই বঙ্গশ্রীর পরবর্ত্তী সংখ্যা থেকে ঐ 'সৈনিক' নামেই উপন্যাস আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে মনোজ বাবুর উপন্যাস 'সৈনিক' বাংলা-সাহিত্যে আকস্মাৎ অনিন্দ-সার্থক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কাগজে কাহিনীর নাম পরিবর্ত্তন ক'রে লিখ্‌বো কিনা, এই নিয়ে উক্ত 'সৈনিক'-প্রকাশক শিক্ষাবিদ সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাথে আলোচনা করি এবং অভয় পাই। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রতে গিয়ে উপন্যাসের নাম-পরিবর্ত্তনের অপরিহার্য্যতা স্বভাবতঃই না বোধ ক'রে পারলুম না। এবং ভারতের চল্লিশকোটি নিপীড়িত জনগণ-মনের উদ্বেলিত চক্রশক্তির অভ্যুত্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নামকরণ করলুম 'চক্রধারী'। নামের আধুনিকতার ভিত্তিতে যদি কারুর এ-নামে আপত্তি থেকে থাকে, তবে আমার নীরব থাকা ভিন্ন উপায় নেই।

'চক্রধারী'র অনেকাংশই বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। বিশেষভাবে রাষ্ট্রীক্ ঘটনাপঞ্জীর নির্ম্মম সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কহিনীকে রূপ দিতে চেষ্টা ক'রেছি। আগষ্ট-বিপ্লবের ভিত্তিতে রচনার প্রথম প্রয়াস হ'লেও কঠোর সত্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি মূলতঃ আজাদ-হিন্দ্‌ আন্দোলন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের পটভূমিকায় প'ড়লেই গ্রন্থের মূল সত্য ধরা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে।

আর একটি কথা। নানাকারণে এবং নানা কাজের চাপে প'ড়ে বঙ্গশ্রীতে শেষ পর্য্যন্ত উপন্যাসের সম্পূর্ণাংশ প্রকাশ সম্ভব ক'রে তুল্‌তে পারি নি। এই নিয়ে বাংলা ও বাংলার বাহিরের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পাঠকের অনুযোগপূর্ণ চিঠি পাই বহুবার। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত ছিলেম ব'লে সে-সবের জবাবদিহি ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। বুকষ্ট্যাণ্ডের যুগ্ম-মালিক সুহৃদদ্বয় শ্রীযুক্ত শৈলবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ পাল ইতিমধ্যে গ্রন্থ-প্রকাশের ভার নেওয়ায় অনেকাংশে সেই লজ্জা থেকে মুক্ত হ'তে পারলুম! যদিও কাগজ-সঙ্কটের দরুণ সম্প্রতি গ্রন্থ-প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘ'ট্‌লো, তবু মনে ক'রলুম— আমার যে-সমস্ত প্রিয় পাঠক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কাহিনীর ক্রমিক অধ্যায়গুলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, পুস্তকাকারে আরও শোভন হ'য়ে তা' এবারে তাঁদের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট-অঙ্কনে প্রখ্যাত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈল চক্রবর্ত্তীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি। এবং শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আমার শুভানুধ্যায়ী সুহৃদবৃন্দের কাছেও তাঁদের অকৃত্রিম উৎসাহ ও সাহচর্য্যের জন্য এই অবকাশে ঋণ স্বীকারের সুযোগ পাচ্ছি।

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সাহিত্য-ভারতীর সাধক পুরোহিত

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

চক্রধারী

ভোরের আকাশে তখনও রাত্রির মোহাঞ্জন লাগিয়া আছে। উদয় সূর্য্যের রক্তিম অভায় ধীরে ধীরে নিদ্রা ভাঙিতেছে পৃথিবীর। ক্ষুধিত পৃথিবী। জাগিয়া উঠিয়াছে কুলী, মজুর, ঘুটেওয়ালী আর মাসোয়ারী জলওয়ালা। নিদ্রিত পৃথিবীর দুয়ারে প্রতিদিন প্রত্যাসন্ন প্রভাতীর সুর শোনায় তাহারাই। উপরে দেব-দারুর উচ্চ শাখায় পক্ষবিধুননে কলরব করিয়া ওঠে ঘুম-কাতর পাখীগুলি।

পশ্চিমের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি সহর।

সেণ্ট্রাল জেলের সদর দুয়ারে হাবিলদারের হাতে বেল বাজিয়া ওঠে—এক, দুই, তিন, চার, তারপর আরও জোরে, আরও কর্ণবিদারী শব্দে—পাঁচ। সেই মুহূর্ত্তে জেলের আরও নিভৃত অন্দরে ফাঁসিমঞ্চে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন পরাধীন ভারতের একজন মুক্তিসেনা। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কাছে একবার শেষবারের মতো প্রার্থনা জানাইলেন: 'হে সত্যদ্রষ্টা, হে নিপীড়িত চল্লিশ কোটি মানবের পরম পিতা, স্বাধীন ভারতের বাণী শোনাও, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দাও ভারতের কোটি কোটি নির্য্যাতিত প্রাণকে।'

পাশে ডাক্তার, সার্জ্জেন্ আর ডোম। আত্মীয়তার অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা নাই কোনো প্রাণের দাবীর।—হঠাৎ পায়ের নিচে হইতে জোড়া কাঠ সরিয়া গেল। ফাঁসির ধারালো দড়িতে মুহূর্ত্তে সমস্ত দেহটা ঝুলিয়া গেল বায়বীয় শূন্যতায়। ভারতের মুক্তিসেনার জন্য প্রস্তুত ছিল এই মৃত্যু—সভ্যতার জ্বলন্ত প্রতীক এই ফাঁসির দড়ি।

পরদিন কাগজে কাগজে ইউ. পি সংবাদ দিল:

আগষ্ট্-বিপ্লব সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি পাণ্ডের গত ১০ই নভেম্বর সকাল পাঁচ ঘটিকায় ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।...

চোখ দুইটি একবার ঝল্সিয়া উঠিল শ্রীমন্তের, দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল বুকের ভিতরটা। সামনের টেবিলে খোলা পড়িয়া আছে কাগজখানি: দুই আনায় আট পৃষ্ঠার কাগজ। তিনের পৃষ্ঠায় রৌদ্রতপ্ত মরুভূমির মতো জ্বালাময় হেডিং-এ মৃত্যু ঘোষণা গণপতি পাণ্ডের। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সহসা একবার ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে শ্রীমন্ত উচ্চারণ করিয়া উঠিল: "হাউ টেরিব্ল্ রুলিং—।"

সাথে সাথে দুই তিন জোড়া চোখ সচকিত হইয়া উঠিল শ্রীমন্তের দিকে। বাঁ-পাশের 'কাউন্টার'-এ বসিয়া ক্যাস মিলাইতেছিল এ্যাকাউন্টেন্ট্, সামনে 'উইথ্ড্রয়াল ফর্ম্ম্' হাতে পাটগুদামের আধাবয়সী কর্ম্মচারী; দক্ষিণের চেয়ারে বসিয়া

সিগারেট টানিতেছিল ম্যানেজার। মাস কয়েক হইল কলিকাতার কি একটা নতুন ব্যাঙ্কের এই ব্র্যাঞ্চ বসিয়াছে এইখানে, চরমুগরিয়ার এই বন্দরে। ম্যানেজার, ক্যাস-এ্যাকাউন্টেন্ট, সাধারণ ক্লার্ক একজন আর দরোয়ান। ব্যাঙ্কের উপরে বিশেষ কোনো বিপদ আসিলে লাঠি ঠুকিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে পারে মাদারীপুরের সদর পুলিশ।

কণ্ঠের উপরে বিশেষ রকম জোর দিয়া আর একবার উচ্চারণ করিল শ্রীমন্ত: "হাউ টেরিব্ল্—"

আপ্‌টুডেট সাধারণতন্ত্রী ম্যানেজার নিখিল ব্রহ্ম, সচকিত দৃষ্টিতে সহসা কতকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিল: "কি, কি ব্যাপার, আই-এন্-এ'র নতুন কিছু হোলো?"

বিষয়টা নিখিল ব্রহ্মের পক্ষে ভাবা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কাগজপত্রগুলিতে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের মুক্তিসৈন্যদের বিচার লইয়া আজকাল যে-ভাবে আন্দোলন চলিয়াছে, মুক্তিপ্রয়াসী ভারতবাসী প্রত্যেকের মনেই তাহা প্রতিমুহূর্তের আতঙ্ক, প্রতিমুহূর্তের দুঃসহ চিন্তা।

কিন্তু শ্রীমন্তের মন শুধু আতঙ্কে আলোড়িত নয়, অনবদমিত কঠিন বিদ্রোহে জ্বলন্ত। গণপতির মতই তো লক্ষ লক্ষ আত্মত্যাগী সেনার অসাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এই আজাদ-হিন্দ দল। হিন্দুস্থানের সেই আজাদ, সেই মুক্তির দিন কবে?

কাগজখানি আগাইয়া ধরিল শ্রীমন্ত নিখিল ব্রহ্মের দিকে:

"মিথ্যা কি, সুদূর প্রাচ্যে না গিয়েও বাংলার গভীর প্রত্যন্তে থেকেও যে জাতীয়-সৈন্যের ব্রত পালন ক'রেছে, সেই বা আই-এন্-এ'র না কেন? কিন্তু শেষ হ'য়ে গেল, তা'র জন্যে বাংলার জন-মতের অপেক্ষা রইল না, প্রীভিকাউন্সিলে আপিল উঠল, সাথে সাথে রায় বেরিয়ে গেল, শেষ নির্ব্বাচন—ফাঁসি। হাউ টেরিব্‌ল্, হউ সি।"

এ্যাশ্ট্রের মুখে বার কয়েক হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠুকিয়া নিল নিখিল ব্রহ্ম: "কিন্তু সরকারী রিপোর্ট তো সে-কথা বলে না। বড় রকমের 'কালপ্রিট্' ছিলেন মিঃ পাণ্ডে। তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমত গুণ্ডামির চার্জ্জ আনা হ'য়েছে।"

কথা শুনিয়া অস্বাভাবিক জোরে অদ্ভুত রকমের একবার বিকৃত হাসি হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত, তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাতে সজোরে একবার টেবিলের উপর আঘাত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "জানেন, এই নীতির উপরেই আমরা আজ বাসা বেঁধে আছি। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যারা অসহযোগ ক'রলো, যারা মানলো না প্রচলিত আইনকে, তারাই হ'লো গুণ্ডা, প্রাণদণ্ড তাদেরই জন্যে, আর—"

হঠাৎ বাধা দিল নিখিল ব্রহ্ম: "আপনি অকারণে উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়ছেন। বুঝতে পারছি, মিঃ পাণ্ডের মৃত্যু আপনার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত ক'রেছে, কিন্তু তার জন্যে উত্তেজিত হ'লে তো চ'লবে না! আর ধরুন, আমরা কি-ই বা ক'রতে পারি? চক্রব্যুহের মধ্যে দাঁড়িয়ে এমন কি শক্তি আছে

আমাদের, যার জোরে অন্ততঃ কিছুটাও আমরা এগিয়ে যেতে পারি! বিধাতার বর নিয়ে দ্বারা রক্ষা ক'রছেন শক্তিধর জয়দ্রথ।"

চোখের গাঢ় দৃষ্টিকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া আনিল শ্রীমন্ত, তারপর ম্যানেজারের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া বসিল: "একটা জিনিষ জানবেন মিঃ ব্রহ্ম, ক্ষয় এবং সৃষ্টি—এর বাইরে পৃথিবীর বিজ্ঞান আজও নতুন কিছু দেখাতে পারে নি। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে দিতে বিধাতার ক্ষমার পাত্রও একদিন নিঃশেষ হ'য়ে যায়। চিরদিনই অভিমন্যুরা মরে না, জয়দ্রথেরও ক্ষয় আছে। রক্ষণশীল পচনমুখী সভ্যতার উপরে তাই নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর দেখা দেয় শ্রমিকের; কিন্তু সেটাও দল। একদিন দেখবেন—তারও উপরে নতুন উষার বন্দনা গেয়ে এসেছে ক্ষুধাতুর নগ্নকায় জনগণ। এই হ'চ্ছে হিষ্ট্রী অব্ ইভলিউশন। মানুষের সমাজ, কোনো একটি মানুষেরও স্বাধীন মতকে অস্বীকার ক'রে কখনো সামাজিক অনুশাসন চ'ল্‌তে পারে না। এই অন্যায় অনুশাসনের জন্যেই আজ প্রত্যেকটি দেশে কেমন ক'রে জনগণ ন'ড়ে উঠেছে, চেয়ে দেখুন। আপনি কি ব'ল্‌তে চান মিঃ ব্রহ্ম, যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-বিনিময়েও আমরা এই চক্রব্যূহের দ্বার ঠেলে বেরুতে পারবো না? পাণ্ডের মতো নিঃশব্দে যারা শুধু প্রাণ দিয়ে গেল, তার কি কোনো ফলই ফ'ল্‌বে না ব'লে আপনি বিশ্বাস করেন?" ম্যানেজারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একবার দম নিল শ্রীমন্ত।

কিন্তু নিখিল ব্রহ্ম সহসা এ-কথার কিছু একটা জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এতক্ষণ সে নানাভাবে লক্ষ্য করিতেছিল শ্রীমন্তকে। বাস্তবিকই যে আলোচনা এতদূর গড়াইয়া আসিবে, আর শ্রীমন্তের মতো বাহির-হইতে-দেখা নির্ব্বিকার মানুষটির মধ্যে এমন প্রাণবন্ত মতবাদের আভাস পাইবে, কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্তও নিখিল ব্রহ্ম এতটা কল্পনা করিতে পারে নাই। হঠাৎ যেন নিজের কাছেই তাহার সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াকে বড় বিকৃত বলিয়া মনে হইল। অর্দ্ধশূন্য সস্তা সিজারের প্যাকেটটাকে এবারে সে সামনের ড্রয়ারের মধ্যে চাপিয়া দিয়া কতকটা সহজ হইতে চেষ্টা করিল প্রথমে, তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, "এক্স্‌কিউজ্‌ মি শ্রীমন্ত বাবু, আমার হয়ত মনে করা ভুল হবে না যে, আপনি কংগ্রেসের লোক। যে স্পিরিট আপনার মধ্যে র'য়েছে, তাকে বিকাশের পথ দেবার দরকার। এ কথা ব'ল্‌বো না যে, আমিও দেশের পূরো স্বাধীনতাকামী নই, কিন্তু নিজের মেরিটের উপরে আমার বিশ্বাস নেই। এতদিন আমাদের ব্যাঙ্কের শুধু শুভার্থী ব'লেই আপনাকে জানতুম, কিন্তু সত্যিকারের গোটা মানুষটার প্রকৃত পরিচয় পেতে আরম্ভ ক'রলাম আজ। এতদিন ছিল প্রীতির সম্বন্ধ, আজ তার সাথে শ্রদ্ধাও না জানিয়ে পারছি না।"

"শ্রদ্ধার কথা থাক।" অনুকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীমন্ত আবার সুরু করিল : "কিন্তু সত্যিই কি আমি কংগ্রেসের লোক হ'লে আপনি বেশী খুসী হন? দেশের দিকে একবার যদি ভাল

ক'রে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন, কংগ্রেসের টিকিট না নিয়েও মনে-প্রাণে আজ সবাই-ই কংগ্রেসী। কংগ্রেসের এই দীর্ঘ জীবনের আদর্শ, নিষ্ঠা আর ত্যাগের কাছে নতশির প্রত্যেকেই। দল-স্বাতন্ত্র্যে যারা আজ চারপাশে ছড়িয়ে আছে, বড় বেশী পৃথক সত্তায় তারা বিচ্ছিন্ন নয়, শুধু নামে।"

ও পাশের 'কাউন্টার' হইতে এতক্ষণ ক্যাস ফেলিয়া হা করিয়া কথা গিলিতেছিল একাউণ্টেণ্ট্ ব্রজবিহারী, এবারে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এক্‌জ্যাক্ট্‌লি সো, খাঁটি কথা ব'লেছেন শ্রীমন্ত বাবু।"

আরও অনেকখানি ঘন হইয়া বসিল শ্রীমন্ত, ব্রজবিহারীর দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, "আমি লজ্জিত মিঃ ব্রহ্ম যে, আজও আমি কংগ্রেসে নাম দেবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। সমস্ত দেশটাই আজ কংগ্রেস, তাকে অনুসরণ ক'রে যাওয়াই তার কাজ করা। বৃহত্তর বল্‌সেভিক দলের কাছে ক্ষীণকায় মেন্‌সেভিষ্ট্‌দের অস্তিত্ব এক-দিন লোপ পেয়েছিল। আমাদের মুক্তিসাধক জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও ধীরে ধীরে একদিন ক্ষীণসম্প্রদায়গুলি এসে মিলে যাবে। সেই জন-সমুদ্রের ঢেউকে কি কল্পনা ক'রতে পারেন মিঃ ব্রহ্ম? আজাদ-হিন্দ আজ এক নতুন জীবন-স্রোত এনে দিয়েছে কংগ্রেসকে।"

"কিন্তু আমার কথার তো জবাব পেলাম না শ্রীমন্ত বাবু?" ক্ষীণ একটা হাসির আভাস দেখা দিল এতক্ষণে নিখিল ব্রহ্মের:

ঠোঁটে : "জীবন অনিশ্চিত, হেড আপিস থেকে ট্রান্সফার-নোটিশ এলেই কবে না-জানি ছুটতে হ'বে আবার ক'লকাতায়। পরিচয়ের আভাস দিয়েই কি ঔৎসুক্য বন্ধ ক'রে দেবেন? আমাদের এই বন্ধুত্বকে আরও খানিকটা পাকা ক'রতে বাধা কি?"

স্বর অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছিল এতক্ষণে শ্রীমন্তের। গভীর উত্তেজনার সাথে আকস্মিক একটা বিনয়ের সংমিশ্রণে এবারে অদ্ভুত একরকমের আভা ফুটিয়া উঠিল শ্রীমন্তের মুখে। বলিল : "জীবনে এমন কোনো বড় কাজ করি নি—যার পরিচয়ে মানুষের সাম্‌নে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি। এই তো বড় পরিচয়, আপনার ব্যাঙ্কের জন্যে ডিপজিটারদের হাত ক'রছি, খেতে পারছি দু'বেলা পেট ভ'রে, বেঁচে থাক্‌বার মতো এর চাইতে বড় পরিচয় আর কি আছে?"

কিন্তু নিখিল ব্রহ্ম এইটুকুতেই খুসী নয়। ইতিমধ্যেই সে যেন গভীর অথচ অজ্ঞাত কি একটা বিচিত্র জীবন-স্রোত লক্ষ্য করিয়াছে শ্রীমন্তের মধ্যে। মাস কয়েকের পরিচয় মাত্র। নিখিল ব্রহ্ম ক্বচিৎ কখনও অন্যমনস্কতার মধ্যেও স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে—কোনো এক ক্ষেত্রেও বস্তুবিমুখতায় স্থির নয় শ্রীমন্ত। কখনও পুরানো কাগজের কাটিং লইয়া গভীর মনযোগে কী সব নোট করিতেছে, কখনও বা দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যেই ছুটিয়া যাইতেছে চষা মাটির পথ ধরিয়া দূর চাষী-পাড়ার দিকে। শ্রীমন্তই জানে, তাহার কাজের সমুদ্র

কোথায় যাইয়া কুল পায়! নিখিল ব্রহ্ম সে-সমুদ্র মন্থন করিয়া কিছু একটা জলজ ইতিহাসও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আজ যেন অনুসন্ধিৎসা তাহার একটু বড় বেশীই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

অথচ শ্রীমন্ত স্পষ্ট এ-কথা বলিতে পারে না যে, সে পলাতক; এখানে পুলিশ আর চৌকিদারের চোখের সামনে দিয়া অনবরত এই সারা বন্দরটা প্রদক্ষিণ করিলেও নিজের স্বরূপের কাছে সে একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যখনই এই নামের উপর হইতে আবরণ সরিয়া যাইবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ক্ষমা পাইবে না পুলিসের কাছে; সোজা মাদারীপুর থানা, তারপর সদর। তারপর প্রেসিডেন্সী, দমদম, আলিপুর কিম্বা মধ্য ভাবতের আরও হয়ত কোনো সুরক্ষিত জেল।···

কতকটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ভাসা ভাসা দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল নিখিল ব্রহ্ম শ্রীমন্তের চোখের 'পরে: "আপনি কোথায় যেন সত্যিই নিজেকে লুকিয়ে যাচ্ছেন! এটা ঠিক আশাপ্রদ নয়।"

ক্ষীণ একবার হাসিল শ্রীমন্ত: "কিন্তু আশা মানুষকে মরীচিকায় দগ্ধ করে, জানেন তো? ইংরেজের এই জড় সভ্যতা মানুষকে দেখাতে শিখিয়েছে বাইরের থেকে, অন্দর মহল সেখানে একেবারে ঢাকা। কবাট একবার খুলে দিলে কি শেষটায় ঘরে আর স্থান দেবেন?"

সহসা জিহ্বায় একবার কামড় দিল নিখিল ব্রহ্ম: "ছিঃ, ছিঃ,

কি যে বলেন,—এ-কথা আপনার মনে কেন আসে? চরমুগ-রিয়ার মতো এই বন্দরে যেখানে শুধু পাটের গুদামী কারবার, চালের ট্রান্স্‌পোর্টেশন ভিন্ন স্বাভাবিক সৌজন্যতার এতটুকুও পরিবেশ নেই, সেখানে আপনি যে আমাদের কতবড় বন্ধু হ'য়ে আছেন, তা আপনি জান্‌তে পারছেন না।"

উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল শ্রীমন্ত। স্তুতিবাদে আত্মসুখবোধ—মানুষের বস্তু-মনুসংহিতার কথাই তো! কিন্তু সেইদিকে মন যেন বড় বেশী সাড়া দিল না শ্রীমন্তের। একটা খণ্ডকালের জ্বলন্ত ইতিহাস যেন প্রতি-মুহূর্ত্তের মতই আর এক-বার বড় স্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠিল তাহার চোখের সাম্‌নে!

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ।—দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিয়াছে; পাশে বি. এ রেলওয়ের ডব্‌ল্‌ লাইন পূব-পশ্চিমে প্রসারিত, এপাশে ওপাশে বিস্তৃত ছাড়া-মাঠের মধ্যে ছোট্ট ষ্টেশন। সরকারী পরওয়ানার দপ্তর আছে জমিদারী সেরেস্তার সাথে আরও অনেকটা ভিতরে—বাজারের দিকে। রাত্রের শেষ ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে দশটায়। ওপাশে ষ্টেশন মাষ্টারের খড়ের চালায় সঙ্কীর্ণ বাংলো। বাহির হইতেও কান পাতিয়া শোনা যায় বন্ধ ষ্টেশন ঘরের বড় ক্লক্‌টার টিক্ টিক্ শব্দ। অদৃশ্য চোখে মিনিটের পর মিনিটের কাঁটা ঘুরিয়া আসে, ক্রমিক সংখ্যায় বেল বাজে—এগারো, বারো, এক—। আগষ্টের নিশুতি নিস্তব্ধ রাত্রি। ষ্টেশন মাষ্টারের বাংলোয় ঘুমের গাঢ়তা। ওদিকটায় আধো অন্ধকারে একেবারে খাঁ খাঁ করিতেছে

জমিদারী সেরেস্তার গায়ে সরকারী পরওয়ানার দপ্তর। গুপ্ত ঘাতকের মতো একদল অশরীরী ছায়া শব্দহীন পদসঞ্চারে একবার সেই ভুমি-সীমা প্রদক্ষিণ করিয়া গেল। ঘুমন্ত নিথর কালো রাত্রি। তার প্রতিটী পর্দ্দায় যেন এক-একবার ধমনীর রক্তচাপের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে প্রহরগুলি।—বড় ক্লক্‌টায় আর একবার বেলের শব্দ শোনা গেল : দেড়টা— ঘুমন্ত গ্রামের নিস্তব্ধ রাত্রির দেড়টা।—হঠাৎ দেখা গেল দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিয়াছে, সহস্র শিখায় ঠেলিয়া উঠিয়াছে আগুন আকাশের দিকে। দেখিতে দেখিতে ঘুমভাঙা সচকিত চীৎকারে আবার ভরিয়া উঠিল বাংলোটা। ওদিক হইতে সারা বাজারের লোক মোটঘাট জিনিষ-পত্র সরাইতে সরাইতে সারা গ্রামখানিই একরকম অগ্নিকাণ্ডের সাম্‌নে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—এর প্রধান হোতা মথুর দত্ত তাহার দল লইয়া ততক্ষণে পায়ে হাঁটিয়া একেবারে গা ঢাকা দিয়াছে পাশের গ্রামে।···

কিন্তু ঘটনার প্রায় মাঝের স্তর এটা। মথুর দত্তের আরও কিছুটা বিশেষ-রকমের মরমী ইতিহাস আছে গোড়ার দিকে। কোনো একটা মুহূর্ত্তকেও মনে করিতে ভুল করিল না শ্রীমন্ত।—

ষ্টেশনের পিছনে বিস্তৃত কাঁচা সড়ক ক্রোশখানেক উত্তরে যাইয়া খালের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেইখানেই সঙ্কীর্ণ 'হাউলি' পাড়া বারোখাদা। এককালে হাঁটা-পথে খাদ ছিল বারোটাই, এখন অবিশ্যি বর্ষায় ধ্বসিয়া খাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

গ্রামের বুদ্ধিজীবী বনিয়াদিদের এই পাড়াতেই বাস। পাল-পার্ব্বণ এটা-ওটা আছেই।—সেবার রথের মেলার দিনে হঠাৎ মথুর দত্তের সঙ্গে কি একটা সূত্রে পরিচয় হইয়া গেল সৌদামিনীর। সুন্দর ঝক্‌ঝকে সহুরে ভাব, পরিচ্ছন্ন রুচি। হাসে যখন সৌদামিনী—তার চঞ্চল স্বপ্নাতুর আবেগের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে সচকিত একটা বিদ্যুতাভা।—ভাল লাগিল মথুর দত্তের।

এম্‌নিতর একটা হাসির মুহূর্ত্তেই অতর্কিতে একদিন অদ্ভুত রকমের একটা প্রশ্ন তুলিয়া ধরিল সে সৌদামিনীর কাছে।—"তোমার কি মনে হয় এ সম্বন্ধে?"

সৌদামিনীর চোখে দৃঢ়তা ও বিস্ময়।—"সম্বন্ধ কিছু একটা জান্‌তে পারি, তবে তো মনে ক'রবো?"

"এই যে দেশ জুড়ে এত অনাসৃষ্টি, হাহাকার, দারিদ্র্য।" কিছুটা জোর দিল কণ্ঠস্বরের উপর মথুর দত্তঃ "কেন ভারতবর্ষের এম্‌নিতর মৃত্যু, ব'ল্‌তে পারো সৌদামিনী?"

পাতলা ঠোঁটে স্বাভাবিক হাসি টানিয়াই সৌদামিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল : "পরাধীনতা?"

অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া বসিল এবারে মথুর দত্ত।—"এই মরা হাড়ে আমরা কি আর স্বাধীন সূর্য্যের তাপ ফিরে পাবো না? সুখের অন্ন কি আর স্বস্তির সাথে মুখে নিতে পারবো না সৌদামিনী?"

"এত আশাহীন, দুর্ব্বল আর কাপুরুষ তুমি, তা তো জান্‌তুম না!" হাসিতে যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল সৌদামিনীর: "শ্রীকৃষ্ণের দেশ এটা জান তো? দুর্য্যোধনের কুরু রাজত্ব খুব বেশী দিন স্থায়ী ছিল ব'লে কি মহাভারতকার কোথাও ইঙ্গিত ক'রেছেন? জানো না, কবি সেই যে গেয়ে গেছেন— 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'; আজ হোক্, কাল হোক্, এ আসন সে নেবেই।"

নতুন প্রশ্ন তুলিতে যেন হঠাৎ ভুলিয়া গেল মথুর দত্ত। ভাল লাগিতেছিল তাহার সৌদামিনীর কথাগুলিকে, ভাল লাগিতেছিল তাহার গভীর মতবাদকে এমন সহজভাবে প্রকাশ করিবার ভঙ্গিটাকে।

কথা তুলিল সৌদামিনী: "এমন নিরাশার বালুচরে বাসা বেঁধে জীবনযুদ্ধে নাম্‌বে কি ক'রে? সাধারণ কেরাণীর কাজ ক'রতে গেলেও মনের জোর চাই।"

সহসা যেন পৌরুষে কোথায় আঘাত লাগিল, একটু নড়িয়া বসিল এবারে মথুর দত্ত: "দেখচি, বিষয়গুলি বড় সুন্দরভাবে প'ড়ে মুখস্ত ক'রেছ তুমি।"—কথাটা সৌদামিনীকে একরকম চটাইবার জন্যই যেন!

উচ্ছল গতিতে হঠাৎ বাধা পড়িল সৌদামিনীর। খানিকটা অভিমান যেন মনের কোথায় একবার উঁকি দিল।—"মুখস্ত? বেশ, এবার থেকে তাকে আর তবে প্রকাশের সুযোগ দেব না।"

আত্মস্বাতন্ত্র্যে দুইজনের মধ্যেই চোখের নিমেষে যেন একটা

অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল কোথা দিয়া ! সৌদামিনীর অভিমানটা ধরিয়া ফেলিল মথুর দত্ত। হো হো করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য-শব্দে সে হাসিয়া উঠিল এইবারে।—"দুর্ব্বল ব'ল্‌ছো আমাকে, কিন্তু যে-অভিমান মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় তোমার বড় বেশী-সহজেই নাড়া দিয়ে ওঠে, তাকে নিয়ে তুমিই কি বিশেষ কিছু জয়ের রাজ্যে পৌঁছতে পারবে, মনে করো ?"

সৌদামিনীও যেন কি মনে করিয়া এবারে আর কথা না কাটিয়া হাসিয়া ফেলিল ঃ সেই চঞ্চল স্বপ্নাতুর হাসি।—"আচ্ছা তুমি কী বল' তো ? কি দুষ্টু, কি অসভ্য !—ঝগড়া ক'রবার ইচ্ছে ছিল তো আগে থেকে ব'ল্‌লেই পারতে, কোমর বাঁধতুম।"

কিন্তু কৌতুকচ্ছলে এ কাথারও যথাযথ কিছু একটা উত্তর করিল না মথুর দত্ত। হাসিতে হাসিতেই স্থান ত্যাগ করিয়া সে কোথায় একদিকে উঠিয়া গেল।

ইহার পর একটি সুন্দর পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া সৌদামিনী গুণ-গুণ করিয়া কি একটা গান গাহিতেছিল। আড়াল হইতে আসিয়া কখন্ একসময় নিঃশব্দে কাছে দাঁড়াইয়া সুরে মিল দিল মথুর দত্ত। তারপর থামিয়া কহিল, "গান তো খুব হ'লো, ওদিকে যে আমাদের মেসিনগান উঠছে সিঙাপুরের আকাশে, খবর্ কিছু রাখো ?"

অপ্রস্তুত হইবার মতো এতটুকুও লক্ষণ দেখা গেল না সৌদামিনীর মধ্যে, বরং সহজ ভাবেই কহিল, "জানি, খবরটা সকাল বেলাই কাগজে পেয়েছি।"

"তা হ'লে?" স্বর তুলিল মথুর দত্ত: "এখন কি ক'রবে ব'লে ঠিক করেছ?"

"কিসের?" দৃঢ় নেত্রে তাকাইল সৌদামিনী।

"এই—দু'দিন পরে আগুণ যখন এম্‌নি সমস্ত গ্রামে এসেও ছড়িয়ে প'ড়বে! এদিকে তো চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে চ'ড়ছে; বাজার একেবারে ফর্‌সা। এরপর ধরো, জাপান যেমন ক'রে হা ক'রেছে, বোম্‌ এদিকে প'ড়লে কি দেশের লোক সত্যিই বাঁচবে?"

"আসুক না জাপান, ভয় কি? বরণ-কুলো সাজিয়ে রাখবো।" মিট্‌ মিট্‌ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল সৌদামিনী।

কিন্তু মথুর দত্ত মুখের ভাব এতটুকুও পরিবর্ত্তন না করিয়া গাম্ভীর্য্য অটুট রাখিয়াই কহিল, "একথা শুন্‌লে ফিপ্‌থ কলাম্‌নিষ্ট ব'লে আজই পুলিশে নিয়ে তোমাকে জেলে পূরবে।"

কথা শুনিয়া আরও জোরে এবারে হাসিয়া উঠিল সৌদামিনী: "তুমিও সঙ্গে যাবে তো? একা গিয়ে কিন্তু সত্যিই ভাল লাগ্‌বে না, যাই বলো!" স্বল্প থামিল সৌদামিনী, তারপর পুনরায় কহিল, "কি বলো, বেশ হয় কিন্তু, একটা চান্স্‌,—চলোই না

ঘুরে আসি কিছুদিন জেল থেকে! নাম হ'লে দেশের নেতৃত্ব ক'রবার সুযোগ পাবে।"

মথুর দত্ত স্পষ্ট বুঝিল যে, সৌদামিনী ঠাট্টা করিতেছে, কিন্তু তবু ভাল লাগিয়াছে সৌদামিনীকে মথুর দত্তের। ভিতরে আগুন আছে, যৌবন আছে সৌদামিনীর। আর সব মেয়ের মতো ও এই বয়সেই ফুরাইয়া যায় নাই। বলিল, "জেলে যাওয়াটাই বড় কথা নয়। প্রকৃত কাজ চাই। দেশের জন্যে তুমি আমি শুধু কারা-বরণ ক'রলেই কি এতবড় জাতটা একদিনেই মুক্তি পেয়ে যাবে? চারদিক থেকে লোক পালাচ্ছে, তালাবন্ধ দরজায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ট্রেণে ছুটছে প্রাণ নিয়ে। মালয়, সিঙ্গাপুর—এদিকে ব্রহ্ম দেশও যায় যায়। আত্মরক্ষা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম—যথেষ্ট কাজ এখন আমাদের সাম্‌নে। ঠাট্টা রেখে আর একটুখানি এগিয়ে আস্‌তে পারো না সৌদামিনী?"

"কেন পারবো না, এগিয়ে তো আছিই।" দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল সৌদামিনী মথুর দত্তের মুখের দিকে।—"বলো, কি করতে হবে?"

"বেশী কিছু নয়, গ্রামের সাম্‌নে একটুখানি শুধু মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাকী যেটুকু, তার জন্যে আমি আছি।" কর্ম্মদৃঢ়তায় একবার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল মথুর দত্তের চোখ দুইটি।

"বেশ, অঙ্গীকার ক'রছি।" বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের

আঙ্গুল হইতে সরু মিনা-করা আংটিটা খুলিয়া সহসা মথুর দত্তের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল সৌদামিনী।

চকিত আবেগে হঠাৎ যেন নড়িয়া উঠিল মথুর দত্ত।—“এ কি, এ কেন ক'রলে তুমি ?”

কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই উপুড় হইয়া একবার গড় করিল সৌদামিনী মথুর দত্তের পায়ে, তারপর কহিল, “প্রতিজ্ঞাতে দস্তখতের প্রয়োজন হয় ; এ-ই আমার অঙ্গীকারের চিরকালের স্বাক্ষর হ'য়ে রইল।”

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদে তখন গাঢ়তর দীপ্তি। জাগ্রত যৌবন যেন খাঁ খাঁ করে বাহিরে।

এতদিন এ আংটিটার দিকে বড় একটা দৃষ্টি যায় নাই মথুর দত্তের, এবারে মিনাটার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া কহিল, “তাই বলো, তোমার আর-একটাও তবে পোষাকী নাম আছে ?”

মাথা অপেক্ষাকৃত কিছুটা নত করিয়া লইল সৌদামিনী, লজ্জায় নয়, একটা ইতিহাসমুখর দুঃখের স্মৃতিতে। কহিল, “হ্যাঁ, মা ঐ ‘শ্রীময়ী’ নামেই চিরকাল আমাকে আদর ক'রে ডাকতেন ; মারা যাবার আগে তাই নামটা পাকা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন মিনাতে।”

সহসা সমস্ত কথার উৎস যেন এবারে হারাইয়া ফেলিল মথুর দত্ত। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর কহিল, “তাকে এম্‌নি ক'রে অমর্য্যাদা করা উচিত নয় তোমার সৌদামিনী। এ আংটি তুমি ফিরিয়ে নাও।”

কিন্তু মথুর দত্ত ভাবিতে পারে নাই যে, কথাটা আঘাত করিবে সৌদামিনীকে।—হঠাৎ যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন খেলিয়া গেল সৌদামিনীর সমস্ত মুখখানির উপর দিয়া। কহিল, "এ-হাতে আর ও-হাতে এখনও কি কিছু পার্থক্য আছে? মা আমাকে আদর ক'রে ডাক্‌তেন শ্রীময়ী ব'লে, তুমি না হয় আজ তার সম্পূর্ণ ভাগটাই নিলে! অঙ্গীকারে নইলে-যে আমার ফাঁকি থেকে যাবে।"

বিস্ময়ে আনন্দে আর রোমাঞ্চিত আবেগে যেন মথুর দত্ত একটা নূতনতর শক্তি খুঁজিয়া পাইল নিজের মধ্যে। কহিল, "সত্যিই তুমি শ্রীময়ী, শ্রী ফিরিয়ে আনো তুমি দেশের আর বৈদেশিক-শাসনবিক্ষুব্ধ এই জাতির।"

সৌদামিনীও যেন এতক্ষণে একটা দ্বিধা হইতে মুক্ত হইবার পথ খুঁজিতেছিল মনে মনে। কহিল, "আর তুমি হ'লে আজ থেকে শ্রীমন্ত। তুমি না হ'লে আমি কি এই কঠিন সাধনায় সত্যিই পূর্ণ হ'তে পারবো? শ্রী'র যোগেই না শ্রী'র বিকাশ! তুমি যেন চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রতে হাসিমুখে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেয়ো। কোনোদিনই তোমার সে ডাকে আমি পিছিয়ে থাক্‌বো না। আত্মরক্ষা আর স্বাধীনতা-সংগ্রাম —তুমিই তো ব'লেছো,—এস এগিয়ে যাই।"

খুসীর হাসি হাসিল একবার মথুর দত্ত। কহিল, "তার উদ্বোধন করো আজ তবে এইখানেই। ফ্রান্সে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, চীনে, সিঙাপুরে যখন জ্বলন্ত বোমা আর মেসিন-

গানের শব্দ উঠছে, ঘুমপড়ানি দুর্ব্বলতার গান তখন নয়, গাও বন্দেমাতরম।”

বাহিরে জ্যোৎস্না যেন আরও মদিরবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সৌদামিনী আর কোনো কথা তুলিল না; স্বভাবসুন্দর কণ্ঠে এবারে সে অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় গাহিয়া উঠিল—‘বন্দে-মাতরম্।......’

ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল মথুর দত্ত, তারপর কাঁচামাটির পথে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কয়েক দিনের মধ্যেই একটা নতুন চেতনা দেখা দিল যেন সারা গ্রামে। তার মূল উৎস বারোখাদা।

রবিবারে বুধবারে প্রকাণ্ড হাট বসে বাজারের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। গৃহস্থ ব্যাপারী, ফড়িয়া, পাটচাষীরা দুই তিন দিনের পাকা সওদা করিয়া নেয় লঙ্কা-মরিচ, 'ছোবা'র দড়ি, আঁখের পাটালি, মুসুরী-কালাই এমন কি চূণ, তামাকপাতা আর সুপারী পর্য্যন্ত। কিন্তু সেদিন বুধবারের হাটে সওদা ফেলিয়া সকলে আগুন হইয়া উঠিল। তিনগুণ দাম বাড়িয়াছে চাউলের। আট টাকা নয় টাকার কম মণপ্রতি চাউল ছাড়ে না মহাজন বাজারে। জমিদার আর তালুকদারের গুদাম তালাবন্ধ। সরকারের লোক আছে গ্রামে, কিন্তু কথা বলে না। পেয়াদা পুলিশেরা বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে অন্যপথ দিয়া হাঁটে।—মথুর দত্ত আড়াল হইতে শুধু টীকা ধরাইয়া দিল, নল দিয়া ধোঁয়া বাহির করিতে লাগিল ঐ ব্যাপারী, ফড়িয়া আর পাট-চাষীরাই। মাঝে মাঝে গোপনে ডাকিয়া নিয়া উস্কাইয়া দিল মথুর দত্ত: "বলো, পাট ধুয়ে কি আমরা জল খাবো? জমিতে এবার থেকে আমরা পাট বোনা বন্ধ ক'রলাম। ধান চাই আমরা। অতিরিক্ত এক পয়সা দামেও যদি আমাদের কাছে চাল বিক্রী

করা হয়, তবে আমরা আন্দোলন ক'রে জমির চাষ বন্ধ ক'রবো, বাধা দেবো সমস্ত চাষীকে।"

জমিদারী সেরেস্তা আর সরকারী দপ্তরের সাম্‌নে রীতিমত জাঁকিয়া দাঁড়াইল আসিয়া সকলে।

ভিতর হইতে উত্তর হইল: "মিথ্যে পাগ্‌লামী ক'রলে কে শুন্‌বে তোমাদের কথা? সরকারী ব্যবস্থা, যেতে দাও দুটো দিন, উপরে লিখে-প'ড়ে দেখি যদি কিছু সুবিধে ক'রতে পারি।"

কিন্তু তেমন কোনো সুবিধার কথায় কাহারও বিশ্বাস নাই। প্রতিবাদ করিয়া সমস্বরে এবারে চীৎকার করিয়া উঠিল সকলে। তাহারা জানে, সরকারী ব্যবস্থার চাইতে জমিদারী ব্যবস্থাই এখানে বড়। সরকারের আঁচলধরা লোক জমিদার আর তালুকদার।

ইতিমধ্যে কখন্ একসময় সৌদামিনীকে আসিয়া সমস্ত অবস্থাটা বিবৃত করিয়া কাছে দাঁড়াইল মথুর দত্ত, কহিল, "যাবে একবার দেখ্‌তে?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল সৌদামিনী: "হঠাৎ আজ ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে হাটের মধ্যে যাওয়া কি শোভন হবে?"

"তা না হয় না-ই গেলে, তবু দূর থেকে একবার—"

"কেউ দেখ্‌তে পাবে না তো?"

"পেলোই বা দেখ্‌তে!' একটু ক্ষিপ্র কণ্ঠেই জবাব দিল মথুর দত্ত: "ভয় ক'রতে যাবে কাকে, আর লজ্জাই বা কি?"

"আছে, আছে, মেয়ে মানুষের সত্ত্বর পায়ে পায়ে।" উত্তর দিল সৌদামিনী ঃ "কিন্তু কথা তা নিয়ে নয়, একটু বরং ধীরে সুস্থে সইয়ে নেওয়া ভাল নয় কি আমাকে দিয়ে? মেয়ে মানুষকে এটুকু কনসেশন দেওয়া তোমার উচিত। সত্যিই তো এ কিছু একটা আর প্রকাশ্য আন্দোলনে নামা নয়!" তারপর কিছুটা থামিয়া বলিল, "চলো, একটু আড়াল থেকে দেখাবে কিন্তু।"

হাসিয়া ফেলিল এবারে মথুর দত্ত ঃ "সাধে কি বলি, জয়ের রাজ্যে পৌঁছতে তোমার সহজে হ—বে না। লজ্জা, অভিমান, ভয়—এই তিন থাকতে নয়। নিজেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করো শ্রীময়ী, দামিনীর মতো একবার গর্জ্জে' ওঠ দেখি সৌদামিনী।"

এদিককার গর্জ্জনও ততক্ষণে কম নয়।

গম গম করিতেছে হাটের মানুষ। ভিতরের কথা শুনিয়া সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল—"ও সব ফাঁকি-কথায় আমরা ভুলবো না।"

ভিতরের গলা এবারে অনেকটা উগ্র শোনা গেল।—"বাজে হল্লা ক'রলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হ'ব, এই ব'লে দিচ্ছি।"

কিন্তু হল্লা আদৌ থামিল না, এবং অপর পক্ষ হইতেও যে তেমন কিছু একটা পুলিশে খবর গেল—এমনও বোঝা গেল না। অধিক রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরিল।...

সকালে আবার বাজার। শান্ত আবহাওয়া অনেকটা চারিপাশে। গত দিনের ব্যাপারে সত্যিই কিছু ফল হইয়াছে। দুই

টাকা নামিয়া গিয়াছে চাউলের মণ। কেহ কেহ বলিল, "সাময়িক একটা ফাঁদ মাত্র। দু'দিন পরে আবার ছ'গুণ না বাড়ে, তাই দেখ।"

কিন্তু দেখিবার অর্থে দৃষ্টিটা আসলে এখন মথুর দত্তেরই। অনেক কিছু এখন নির্ভর করে তাহার উপর। ব্যাপারী, ফড়িয়া আর পাটচাষীরা এখন সব কাজে আসিয়া বুদ্ধি নিয়া যায় মথুর দত্তের নিকট হইতেই।

আর একদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায় বসিয়া বসিয়া ইহাদের লইয়াই কথা হইতেছিল সৌদামিনীর সঙ্গে মথুর দত্তের।

মথুর বলিল, "পৃথিবীর যত কিছু আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তুলেছে এই এরাই। ফ্রান্স, রাশিয়া—যে দেশই যখন স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রেছে, এই নিরন্ন চাষী, ফ'ড়ে আর ব্যাপারীরাই সবার আগে বুলেটের সাম্‌নে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদের আন্দোলনই খাঁটি বেদনার বিদ্রোহ। গ্রামে আজ সবে নতুন জাগরণ ওদের স্থুরু হোলো। ভাবনা নেই সৌদামিনী, আমাদের একটু শুধু এগিয়ে গেলেই চ'ল্‌বে।"

গ্রাম বটে, কিন্তু গ্রামের মেয়েই নয় যেন আসলে সৌদামিনী। নিজের সংস্কৃতিতে সহর আর গ্রামকে সে নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ এক করিয়া নিয়াছে। ঘরে বইয়ের সেল্‌ফ আছে ; পরম শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে। বলিল, "এগিয়ে যাবো বটে, কিন্তু সত্যিকারের আন্দোলনের দিনে যেন শুধুই হাট দেখিয়ো না, টেনে নিয়ো আসল

প্রতিকারের কাজে, জনতার সেবায় লাগিয়ে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুল্‌বার সুযোগ দিয়ো আমাকে।"

মথুর দত্তের দক্ষিণ হাতের অনামিকায় তখনও শক্ত হইয়া আঁটিয়া আছে সৌদামিনীর মিনা-করা আংটিটি। সেইদিকে একবার লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিল মথুর দত্তঃ "অঙ্গীকারের স্বাক্ষর রেখেছ বটে আমার কাছে, কিন্তু এও জানি, প্রয়োজনের দিনে তোমাকে ডেকে নিতে হবে না, তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তোমাকে কঠিন বন্ধুর পথে টেনে আনবে।"

"তাই যেন হয়। পা বাড়িয়েই আছি। অপেক্ষায় রইলুম সেই কঠিন দিনের।" বলিয়া একবার থামিল সৌদামিনী। তারপর কহিল, "আজ যেন আর অম্‌নি অম্‌নি চ'লে যেয়ো না। যাই, উঠি, উনুনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আঁচ উঠেছে, নিজের হাতে রাঁধ্‌বো, তুমি খেয়ে দেয়ে তবে যাবে।"

একবার আপত্তি তুলিতে গেল মথুর দত্ত, কিন্তু পারিল না, প্রীতিধর্ম্মে হয়ত আঘাত লাগিল। তেম্‌নি ভাবেই সে বসিয়া রহিল একান্তে। পাশ কাটাইয়া ভিতরের দিকে উঠিয়া গেল সৌদামিনী।...

পত্রিকার পাতায় পাতায় প্রতিদিন যুদ্ধের গরম গরম খবর। জার্ম্মানীর দিনের পর দিন ক্রমঃ-অগ্রগতি, মিত্রশক্তির সাফল্য-জনক পশ্চাদপসরণ, জাপানের নতুন নতুন সহর দখল, চীনের জীবন-জয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রাম।...দুই তিন খানি কাগজ আসে

মাত্র গ্রামে। সারা গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়ে আসিয়া তাহাতেই!—
ইতিমধ্যে একদিন খবরে দেখা গেল—বৃটিশ-রাজদূত ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব সরকারী বার্ত্তা বহিয়া নিয়া আসিয়াছেন ভারতবর্ষে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছে তাঁর। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ একটা আগ্রহ জাগিয়াছে যেন সরকার-পক্ষের। কংগ্রেস যুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত নয়। কিন্তু ইহারই উপরে জোর দিয়া নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অজুহাতে ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব পাঁচ ছয় দফা অনুশাসন মেলিয়া ধরিলেন নেতৃবৃন্দের কাছে। কংগ্রেস জানাইয়া দিল: "দুঃখিত, ইহা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"—ফাঁসিয়া গেল ক্রীপ্‌স্‌-দৌত্য।

মথুর দত্ত প্রকাশ্যে সেদিন গ্রামবাসীকে বিষয়টা আরও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিল: "আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা যদি কখনও অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠে, তবেই সরকার অবস্থা বিশেষে বিবেচনা ক'রে দেখবেন—আমাদের হাতে আমাদের শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন কিনা। যুদ্ধের এই আকস্মিক দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁরা শাসন-ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্ত্তনের কথা ভাবতে পারেন না—কারণ তাতে ভারতের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা থাক্‌বে।"

কথা শুনিয়া কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ভারতের নিরাপত্তার কথা প্রতি-মুহূর্ত্তেই তবে সরকার ভাবছেন! আমাদের সুখী হওয়া উচিৎ,

সন্দেহ নেই। কিন্তু, আজ অব্যবস্থার ফলে আমাদের ক'বাড়ীতে যে উনুনে হাঁড়ি চ'ড়ছে না, সে-কথা কি সরকারের খাতায় টোকা আছে!"

মথুর দত্ত কিন্তু হাসিতে পারিল না, বরং আশু একটা দারুণ দুর্ভিক্ষের ছায়া যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। লোকজনেরা সেদিন একেবারে মিথ্যা অনুমান করে নাই। মাত্র দুই দিনই চাউলের দামটা বাজারে একটু নামিয়াছিল, আবার যেই—সে-ই হইল। উত্তরে মথুর দত্ত কহিল, "আপনারা যদি আন্দোলন ক'রে সরকারের সেই খাতা একবার দেখতে পারেন, তবেই তো বুঝতে পারবেন সব। চেষ্টা করুন্ না একবার!"

হঠাৎ যেন আবার একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল সকলের মুখে। কহিল, "চেষ্টা শুধু এ গ্রাম থেকে ক'রলে কী হবে? থামুন না, দেখ্‌বেন—কংগ্রেসই সে ব্যবস্থা ক'রবে।"

এবারে স্বরটা একটু উঁচুতে তুলিল মথুর দত্ত: "আমার আপনার পাঁচজনকে নিয়েই তো কংগ্রেস। ওয়ার্কিং কমিটিরই কি শুধু দায়িত্ব, আমার আপনার নেই? আমরা যদি নানা সহর থেকে গ্রাম থেকে না এগিয়ে দাঁড়াবো, তবে কংগ্রেস ল'ড়বে কা'কে নিয়ে? উনুনে হাঁড়ি চড়ে না আপনার, আপনার ক্ষুধা আপনার পেটে, আর ব'লে দেবে আর একজনে?"

আগুনে জল ঢালিবার মতই এবারে যেন সহসা একেবারে নিভিয়া গেল সকলে। প্রকাশ্যে কোনো দিন কেউ এমন জোরালো

মতবাদের পরিচয় পায় নাই মথুরের মধ্যে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছু-ক্ষণ চাহিয়া রহিল সকলে মথুর দত্তের প্রতিভায় উজ্জ্বল ও তেজোদৃপ্ত মুখখানির পানে, তারপর এ-কথায় সে-কথায় একে একে যে যাহার মতো পত্রিকার খবর সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

এতক্ষণে যেন একবার হাসিবার সুযোগ মিলিল মথুর দত্তের। মানুষের মজ্জায় মজ্জায় এখনও যে কতবড় ভীরু পাপ আর পলায়নী মনোবৃত্তি বাসা বাঁধিয়া আছে—ভাবিলে হাসি পায় বৈ কি? তারপর সেই নির্জ্জন পরিবেশেই একবার বজ্রমুষ্টিতে দুই হাত সাম্‌নে প্রসারিত করিয়া স্বগত উচ্চারণ করিল মথুর দত্ত—

'পাপের এ সঞ্চয়
সর্ব্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হ'য়ে যাক্ ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হ'য়ে, তার
কলুষ পুঞ্জ ক'রে দিক্ উদ্গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হারগিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।'...

ইহার পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। নিয়মিত আলাপ-আলোচনা চলিল সৌদামিনীর সঙ্গে। দুঃখে, অভাবে, দারিদ্র্যে

গ্রামের ফড়িয়া, ব্যাপারী আর চাষীরাও ক্রমান্বয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে এদিকে। ইন্ধন জোগাইয়াছে তাহাদের মথুর দত্ত। সৌদামিনীও যেন অনেকখানি লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া মুক্ত ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যে। কথায় কথায় একসময় সে কহিল, "চলো না বেরিয়ে পড়ি গ্রামে গ্রামে। কংগ্রেসের নাকি শীগ্ গিরই অধিবেশন ব'স্‌বে বোম্বাইতে! এদিকে যুদ্ধ, তারপর ক্রীপ্‌স্-প্রস্তাবের ব্যর্থতা, নতুন কিছু একটা কর্ম্মসূচী রূপ নেবে এবারে নিশ্চয়ই আগামী অধিবেশনে। কাগজপত্র প'ড়ে অন্ততঃ তাইতো মনে হয়। জন-মত গঠন ক'রবার কাজ—সে কি কিছু একটা কম?"

কথা শুনিয়া মথুর দত্ত প্রথমটা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল—স্বতঃপ্রণোদিত কি অদ্ভুত জাগরণ আসিয়াছে সৌদামিনীর মধ্যে! কহিল, "আগে নিজের গ্রামকে দাঁড় করাও, তবেই দেখ্‌বে—পাশাপাশি আর গ্রামগুলিও পিছনে প'ড়ে নেই। 'চ্যারিটি বিগিন্‌স্ এ্যাট্ হোম্', এইখানেই প্রথম উদ্বোধন, পরিণতিও এইখানেই হোক্ আগে।"

কিন্তু তেমন কিছু একটা অনিশ্চিত পরিণতির মধ্যে যে সহসা জীবনের এই দুর্ব্বার স্রোত একসময় আরও দুর্ব্বার গতিতে বহু দূরে ছুটিয়া যাইবে, এ-কথা ভাবিতে পারে নাই মথুর দত্ত।—

কাগজপত্রের আভাসানুযায়ী সৌদামিনী অনুমান করিয়াছিল মিথ্যা নয়।

বহু বিজ্ঞাপিত সংবাদের মধ্যে সত্যিই একদিন নিখিল

ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসিল বোম্বাইতে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের ৮ই আগষ্ট,—অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ 'ভারতীয় দাবীর সমস্তগুলি সর্ত্ত মানিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসীকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে অচিরেই সেই স্বাধীন ভারত মুক্তি-সংগ্রামে ও নাজীবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং এমন কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিবে। আর ইহার দ্বারা শুধু যে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ই মাত্র প্রভাবিত হইবে তাহা নয়, পরন্তু সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত মানব-সমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে আনয়ন করিবে। অথচ দেখা যায়—ভারত সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য ও নীতি—তাহা স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন ও ধনতান্ত্রিক প্রথা এবং উপায়কে কায়েম করিবার চেষ্টার উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত।' ...দীর্ঘতর প্রস্তাবে কাগজের এপাশ ওপাশ সম্পূর্ণ। শেষের দিকে স্পষ্টই ইঙ্গিত আছেঃ 'আজকের দিনের সঙ্কটত্রাণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা এবং বৃটিশ-শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়।—এ. আই. সি. সি. সমস্ত গুরুত্বের সহিত তাই বৃটিশ-শক্তির ভারত হইতে অপসারণের দাবী জানায়।'... দেখিতে দেখিতে চারিদিকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জাগিয়া উঠিল ভারতবর্ষ। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত দিকে দিকে মহাত্মার বাণী বিঘোষিত হইল—'ভারত ত্যাগ কর'। ভারতের চল্লিশ কোটী জনগণকে প্রকাশ্যে এবারে আহ্বান জানাইয়া বাণী দিলেন

মহাত্মাজী : "আজ থেকে প্রত্যেক নরনারী প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এই চেতনায় কাটাক্—'স্বাধীনতা লাভের জন্যই অন্ন গ্রহণ করিতেছি ও জীবন যাপন করিতেছি এবং প্রয়োজন হইলে সেই গন্তব্যে পৌঁছিবার জন্য জীবন দান করিব।"

সৌদামিনীর কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই একটা অভিনব কর্ম্ম-সূচীর পরিস্ফুরণ ভিন্ন কি! কিন্তু নেতৃবৃন্দের সমস্ত কাজের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন গভর্ণমেণ্ট। কারাগারে আবদ্ধ হইলেন মহাত্মা গান্ধী, ধরা পড়িলেন প্রেসিডেণ্ট আজাদ, জওহরলাল, মাতা কস্তুরবা আর কমিটির সমস্ত সদস্য। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কারাগারের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের বাতাসে বাতাসে যে অমোঘ বাণী ছড়াইয়া রাখিয়া গেলেন মহাত্মাজী আর নেতৃবৃন্দ, তাহা যেন দেখিতে দেখিতে অঙ্গারস্পর্শে বিষবাষ্পে পরিণত হইল। ক্ষেপিয়া উঠিল জনগণ। গত পঁচিশ বৎসরে যে ইতিহাস রচনা হয় নাই, মহাত্মাজীর এই আগষ্ট-আহ্বান যেন তাকে একদিনের রেখাঙ্কনেই পূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিল।

চারিদিকে মুক্তির দাবী নেতৃবৃন্দের। প্রকাশ্য আন্দোলন সাম্রাজ্যবিরোধিতার। পাঞ্জাব, অস্তিচিমুর, বালুরঘাট, তমলুক—সর্ব্বত্র ধরপাকড়, পুলিশের রাইফেলের শব্দ। লুঠপাট চারিদিকে : থানা, ট্রেজারী, ডাকঘর ; কোথাও রেল-লাইন উধাও, কোথাও বা দগ্ধ অঙ্গার। শান্তিকামী ভারত অশান্তির দুঃসহ দহনে দাহিকা-শক্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র দাবী : মুক্তি চাই নেতৃবৃন্দের, মুক্তি চাই ভারতের,...বন্দে মাতরম...জিন্দাবাদ।

মথুর দত্ত কহিল, "আহ্বান এসেছে, আমাদের চুপ ক'রে থাক্‌বার সময় নেই আর। ষ্টেশনের পাশের খোলা মাঠে জায়গা কম নেই। মিটিং-এর একটা ব্যবস্থা ক'রে কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেই। কি বলো?"

সৌদামিনীও কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, বলিল, "তাই করো।"

সেইদিনই নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তির দাবীতে লোক দিয়া সারা গ্রামে ঢেরা পিটাইয়া দিল মথুর দত্ত; গ্রামবাসীকে সনির্ব্বন্ধ উপস্থিতি জানাইল মিটিং-এ।

কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন ষ্টেশন-মাষ্টার কৈলাস চক্রবর্ত্তী। বলিলেন, "রেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে না জিজ্ঞেস্ ক'রে এ-জমিতে এ-রকম মিটিং হ'তে দিতে পারি না।"

আসলে এমন কিছু আইন হয়ত নাও থাকিতে পারে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের, কিন্তু দেখা গেল—একরকম নিজের নিরাপত্তার জন্যেই সহরে পাঁচ রকম সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিয়া পূর্ব্বাহ্নেই যথাস্থানে পুলিশ মোতায়েন করিলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তী। অবস্থা বুঝিয়া মিটিং সরাইয়া আনিল মথুর দত্ত খালের দক্ষিণ পারে ধান ক্ষেতের ধারে। অধিক রাত্রিতে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল, পরদিন কাগজে কাগজে রিপোর্ট গেল রেজিষ্ট্রি খামে। গ্রামের জমীদারী অব্যবস্থার সংবাদটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না তাহাতে।

সাধারণ জীবনে অসাধারণ হইয়া উঠিল মথুর দত্ত গ্রামে।

সৌদামিনী কহিল, "বিজয়ী বীর হও, শক্তিময়ীর আশীর্ব্বাদ যেন সর্ব্বক্ষণের জন্যে তোমার উন্নত শিরে বর্ষিত হয়, এই শুধু প্রার্থনা।"

মথুর দত্ত কহিল, "প্রার্থনা আপাততঃ রাখো। তেমন অবসর মূহূর্ত্ত অনেক পাবে। চারদিকে যে অবস্থা, কখন্ কি ক'রে বসি, কিছুই তো ব'ল্‌তে পারি না! কৈলাস চক্কত্তি যে অপমান ক'রলো, দেখ্‌লে তো? এম্‌নি ক'রেই প্রতি মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্যবাদ থেকে সুরু ক'রে গ্রামের নায়েব পেয়াদা প্রত্যেকের কাছে আমরা অনবরত অপমানিত হ'চ্ছি। কিন্তু দেখ্‌ছো না সৌদামিনী, নূতন সূর্য্যোদয় আমাদের সামনে! কি বিপুল তরঙ্গে নেচে উঠেছে জন-সমুদ্র, কি দারুণ ঝড় উঠেছে সারা ভারতে। এই কাল-রাত্রির সিংহ-দরজা ভেঙে আমাদের প্রবেশ ক'রবার সময় এসেছে নতুন সূর্য্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে। আজকের এই ঝড়ের রাত্রে তোমাকে বাইরে টানবো না। ঘরে থেকেও কাজ আছে। কর্ত্তব্যের দায়িত্বে আর প্রাণের ইঙ্গিতে সেই কাজ তুমি ক'রে যেয়ো। আমাকে নামতে হবে বাইরের কাজে, হয়ত আরও কোনো দুঃসহ পথে। সে পথ যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, দেখো।—"

অনর্গল বলিয়া গেল মথুর দত্ত। নিজের কাছেই যেন একটা প্রকাণ্ড বিবৃতি বলিয়া মনে হইল তাহার। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে কথা বলিবার সময় বহিয়া যায়। সৌদামিনীকে ভিন্ন কাহাকে সে এ কথা বলিবে?

সৌদামিনীও তাহা জানে। বলিল, "এমন কথা কেন, তোমার মনে আসে যে, আমাদের কথাগুলি বাইরেও প্রকাশ পেতে পারে !"

মথুর দত্ত কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, কহিল, "তোমার কথা নয় সৌদামিনী ; কিন্তু মেয়েদের মন বড় দুর্ব্বল জানো তো ? কখন্ যে সে নিজেকে প্রকাশ ক'রে ফেলে, তা সে নিজেই জানে না। তুমি আমার জীবনের উৎস, কর্ম্মের উন্মাদনা। সংগ্রামের পথে তোমাকে কোনো কথা এড়িয়ে যাওয়া কি আমারই উচিত ? জাতীয় মুক্তির পথে পা বাড়িয়ে আছ তুমি, যথাসময়ে তোমাকে তোমার যোগ্য কাজে ডেকে নেব। শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে এখন একটু বিশ্রাম চাই, দেবে ?"

অভিভূত নেত্রে চাহিয়া ছিল এতক্ষণ সৌদামিনী মথুর দত্তের মুখের পানে, কহিল, "নিজের বিশ্রাম নিজে সৃষ্টি ক'রে নাও, এতে দেবার কি আছে !"

সত্যিই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল মথুর দত্ত কয়েক দিনের দৌড়াদৌড়িতে। কিন্তু সে জানে, এখন থামিলেই সে একেবারে নিভিয়া যাইবে। সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে এ-চলায় বাধা দিলে। তবু একবার মুহূর্ত্তের জন্য কাঁৎ হইয়া লইল, কহিল, "বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে আজ, না ?"

সৌদামিনী বলিল, "মেঘ-মেঘ দেখাচ্ছে আকাশ, সম্ভবতঃ তাই খুব হাওয়া বইছে। তা—একটু না হয় ঘুমিয়েই নাও না ?"

মথুর দত্ত কথাটাকে ঘুরাইয়া লইল, কহিল, "দিনটা মেঘলা হ'লেই কি ঘুমুতে হবে? সব ঘুম আজ তোমার হাতে জমা থাক; স্বাধীন ভারতে এই সবগুলি ঘুম জড়ো ক'রে পরম স্বস্তিতে কিছুদিন আগে ঘুমিয়ে নেব। আজ আর একবার গাও না—"বন্দেমাতরম্!"

সৌদামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে কহিল, "যখন উঠ্‌বে, তখন গাইব; শুয়ে শুয়ে 'বন্দেমাতরম্' শুন্‌তে পার্‌বে না। অন্য কিছু গাই শোনো।"

বাস্তবিকই তখন যেন আর উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছিল না মথুর দত্তের। কহিল, "তাই তবে গাও।"

সৌদামিনীও সেই যে একদিন ভাবালু গান গাওয়া ত্যাগ করিয়াছে, আর গলায় কখনও ভাঁজে নাই। মৃদুস্বরে এবারে সে গাহিল—

জাগো বিপ্লবী, যুগের সারথী জাগো,
বাজে দুন্দুভি উষার উদয় দ্বারে।...

অনেকটা যেন ঘুমের জড়তাই আসিয়াছিল মথুর দত্তের চোখে। কিন্তু আর বিলম্ব করিল না, উঠিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ সে একই দৃষ্টিতে সৌদামিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর গান শেষ হইতেই দ্বিতীয় গানের আর অপেক্ষায় না থাকিয়া ধীরে ধীরে সে দুয়ারের বাহিরে সামনের পথে বাহির হইয়া পড়িল। সৌদামিনী কতক্ষণ যে সেইদিকে চাহিয়া আনমনে বসিয়া রহিল, তাহা বলা কঠিন।

ইহার পরের ইতিহাসটা খানিকটা দ্রুত। কাগজে পত্রে, টেলিগ্রামে, গুপ্ত খবরে অনবরত ধরপাকড়, গুলী……লাঠি, আগুন আর নানাজাতীয় সন্ত্রাস। 'সিভিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স' চারিদিকে। কারাগারের বাহিরে এমন নেতা নাই যে, এই উন্মত্ত গণ-আন্দোলনকে আজ নিয়ন্ত্রণ করিবে। জনগণের দিন: দ্রুত সঞ্চারমাণ মুহূর্ত্তগুলি।—দিন দুই-তিন বড় একটা দেখিতে পাওয়া গেল না মথুর দত্তকে হাটে বাজারে। হনুমানের লেজে নেক্‌ড়া বাঁধিবার প্রকাণ্ড একটা অবকাশ যেন। তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, তাহা সৌদামিনীও যেন হঠাৎ কিছু একটা বুঝিয়া উঠিল না।—দুপুর রাত্রে একসময় দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিল রেল ষ্টেশনঘর আর জমিদারী সেরেস্তায়। নিশুতি রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া দূর সীমান্তের পথ ধরিল মথুর দত্ত। তারপর দিনের পর দিন একে একে গত হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে '৪২, '৪৩, '৪৪—তারপর ১৯৪৫-এর এই চলা-পথ। দুঃস্বপ্নের মতো কাটিয়া গিয়াছে মুহূর্ত্তগুলি, মাসগুলি, বৎসরগুলি—অযোধ্যার চরে, তালমা হাটে সদানন্দ বৈরাগীর আখ্‌ড়ায়, মাণিকদহের হোটেলে, তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া এই চরমুগরিয়ার বন্দরে আসিয়া নৌকা ভিড়িয়াছে। সাম্‌নে প্রশস্ত কলমুখর নদী আড়িয়াল খাঁ। ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়া ওঠে এক-একবার বড় বড় মাল-নৌকাগুলি, কাছে দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া ওঠে মোটর-লঞ্চ আর ষ্টীমারের ধোঁয়া। এ-পাশে লম্বা পাট-গুদাম: আটচালা—বাহাত্তুর বন্দরী

,ঘর। চারিদিকে পুলিশের সশস্ত্র চোখ,—তাহারই মধ্য দিয়া অনবরত পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে মথুর দত্ত। সৌদামিনীর প্রীতি ধূলা দিয়া রাখিয়াছে তাহাকে প্রত্যেকের চোখে। মথুর দত্ত রূপ নিয়াছে শ্রীমন্ত রায়ে। পদবীটা একেবারে মিথ্যা নয়, বংশ-কৌলিন্যে মথুর দত্ত শুধু দত্ত নয়, দত্ত-রায়।—ফুটফুটে কামানো মুখখানি কালো মিস্‌মিসে লম্বা দাড়িতে ভরিয়া উঠিয়াছে, লম্বা বাব্‌রি নামিয়া গিয়াছে ছোট চুলে। রীতিমত সিদ্ধ পুরুষ যোগীর বেশ। আর চিনিবার উপায় কি তাহাকে মথুর দত্ত নামে! সৌদামিনীর শ্রীমন্ত আজ জন-সমুদ্রে, ভূমি-সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে বিজয়-গৌরবে। কিন্তু তবু সে যেন আজ নিজের মধ্যে একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এও একটা নির্ব্বেদ-মুহূর্ত্ত বৈ কি!

নিখিল ব্রহ্মের সপ্রশ্ন-দৃষ্টির দিকে এতটুকুও লক্ষ্য ছিল না এতক্ষণ। পর্দ্দার ছবির মতো যেন চোখের উপর দিয়া কাটা কাটা ঘটনাগুলি একে একে ভাসিয়া গেল শ্রীমন্তের। আজ যদি তাহার এই প্রচ্ছন্ন আবরণ খসিয়া যায়, তবে পুলিশের সুরক্ষিত পাহারায় কত দীর্ঘকাল যে কারাপ্রাচীরের নিভৃতে কাটিয়া যাইবে, তাহা চিন্তার অতীত। আর সত্যিই যদি জেলে যাইতে হয়, তবে একা-মনে কেমন করিয়া সে সেই কারাগারের জীবন সহ্য করিবে! প্রতি মুহূর্ত্তে সৌদামিনীর দীর্ঘশ্বাস আসিয়া যে তাহার সমস্ত সত্তাকে স্পর্শ করিয়া যাইবে। তাহার সমস্ত কাজের উৎস, সমস্ত চিন্তার প্রেরণা যে সৌদামিনী।

সৌদামিনীই যে জেলে যাইতে চাহিয়াছিল একদিন নিজে হইতে!—কিন্তু এইখানেই কি পরিণতি! সামনের টেবিলে রক্ষিত কাগজখানির দিকে আর একবার চাহিতে গিয়া আর একটি বড় প্রশ্নও সহসা সমস্ত মনখানিকে তাহার তিক্ত করিয়া তুলিল। আজ তো কারাপ্রাচীরই শুধু তাহার জন্য অপেক্ষায় নাই, অপেক্ষা করিয়া আছে যে ঐ ধারালো ফাঁসির দড়িও। গণপতি পাণ্ডে এমন কিছু একটা বেশী কি অপরাধী তাহার চাইতে? কিন্তু তাহা হইলে দেশমাতৃকার সেবার জন্য তাহাকে কি তবে আর মা বসুমতীর প্রয়োজন হইবে না? যাহারা তিলে তিলে অনাহারে দেশের বুকে শেষ নিঃশ্বাস রাখিয়া গেল, তাহাদের সেই শোণিত-প্লাবনে তবে কি শেষ প্রায়শ্চিত্তটুকুরও সে অধিকার পাইবে না?—ব্রহ্মতালুটা একবার যেন ঘুরিয়া উঠিল। কথা বলিবার মতো এতটুকুও ভাষা পাইল না নিজের মধ্যে। অভিভূতের মতো বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা নত করিয়া একই অবস্থায় নীরবে বসিয়া রহিল শ্রীমন্ত।

কিন্তু ক্রমশঃই যেন বড় বেশী উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে নিখিল ব্রহ্ম। বড় একটা কম সময় তো কাটিল না! এতক্ষণের মধ্যে শ্রীমন্তের মুখ হইতে কিছু একটা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, "আমার অবিশ্যি জোর করা ধৃষ্টতা শ্রীমন্ত বাবু, কিন্তু জানেন তো লোকের স্বভাব, একবার আশ্রয় পেলে নির্ব্বিবাদে সেই পরি-বেশকেই শক্তহাতে আঁকড়িয়ে ধ'রতে চায়। এ-ও ঠিক তাই;

'আপনাকে অত্যন্ত বেশী আত্মীয় মনে করি ব'লেই আপনার সম্বন্ধে একটুকুও না জেনে থাক্‌তে মন চাইছে না।"

দীর্ঘ সময় পরে এবার একবার মুখ তুলিল শ্রীমন্ত। চোখে যেন একটা অন্যরকমের জ্যোতি। কহিল, "আমাদের সমাজের রূপ যেমন ক'রে ধীরে ধীরে বদ্‌লাচ্ছে, তেম্‌নি পরিচয়ের সূত্রটাও ধীরে ধীরে নতুন রূপ গ্রহণ ক'র্‌ছে মিঃ ব্রহ্ম। আজ এ-কথা ব'ল্‌লে কারুর পরিচয় পূর্ণ হয় না যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বহু স্থাবর সম্পত্তির সে অধিকারী হ'য়েছে। যে বিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সীমায় এসে আমরা আজ দাঁড়িয়েছি, সেখানে ঘরের পরিচয় আজ একেবারেই গৌণ হ'য়ে গেছে। আজাদ-হিন্দ্‌ যখন মালয়ে, সিঙাপুরে, ব্রহ্মফ্রণ্টে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন তাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লো—ভারতের মুক্তিকামী সৈনিক। গৃহ তাদের তখন বিস্মৃত। মুক্তির উপাসক আমরা আজ প্রত্যেকেই। আমাকেই বা এই দুর্ভাগা দেশের একজন দীনতম সৈনিক ব'লেই ভেবে নিতে বাধা কি?"

উত্তর দিতে এবারে কিছুটা সময় লাগিল নিখিল ব্রহ্মের।

ও-পাশের 'কাউণ্টার' হইতে ব্রজবিহারী কহিল, "আপনাকে দেখে কিন্তু তা ঠিক মনে হয় না, যাই বলুন। জীবনে আপনি হয়ত নিশ্চয়ই কোনো সাধুর দীক্ষা নিয়েছেন, নইলে এ-বয়সেই এই বেশ—"

কথাটা শেষ হইল না। শ্রীমন্ত এবারে কণ্ঠস্বরে একটু

যেন বেশ জোর দিল—"হ্যাঁ দীক্ষা নিয়েছি বৈ কি, তবে সাধুর কাছে নয়, সাধ্বী এই মাটির মায়ের কাছে। আপনারাও নিন্ না !"

অনেকটা যেন বোকার মতই হঠাৎ আবার চুপ করিয়া গেল ব্রজবিহারী।

কথা বলিল নিখিল ব্রহ্ম, কহিল, "অনেকটা আঁচ ক'র্‌তে পেরেছি আপনাকে আগে থেকেই, কিন্তু ব'লেছি না, মেরিটের উপরে বিশ্বাস চাই। আসলে কি জানেন, সাধারণ ক্ষুদে চাক্‌রী করি, পেটের দায়েই ম'জে আছি, 'কন্‌সান্স' ব'ল্‌তে যা—সব হারিয়ে ফেলেছি। কথা দিয়ে শ্রদ্ধা ঢাক্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু জানেন না শ্রীমন্ত বাবু, নিজেরা ঠিক যেমনটা হ'তে চেয়েও হ'তে পারলুম না, চোখের সাম্‌নে আর কাউকে তেমন পেলে—তাকে কি সত্যিই শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকা যায় ! আপনার মতো এমন 'সেল্‌ফ্-মেড্ স্পিরিট' আজ ঘরে ঘরে জন্মাবার দরকার। আপনারা এগিয়ে গিয়েই তো নির্দ্দেশ দেবেন, আমাদের জন্যে থাকবে তার অনুসরণী। আপনার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের যে সৈনিক জেগে আছে, তাকে আজ যুক্ত-করে নমস্কার করি।"

ভাবোচ্ছ্বাসে শ্রীমন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, "তবে বলুন—'বন্দেমারতম্'। প্রার্থনা করুন ভগবানের কাছে—মৃত শহীদের পবিত্র আত্মার কল্যাণ হোক্।"—তারপর পুনরায় কাগজখানি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ৺। গণপতি পাণ্ডের অস্পষ্ট ছাপা ছবিখানির দিকে।

এ-দিকে ততক্ষণে প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। নিখিল ব্রহ্ম উঠিবার উদ্যোগ করিয়া কহিল, "এতদিন কম ডিপজিটার তো দিলেন না ব্যাঙ্কে! সে-দিকেও আমার ঋণ আপনার কাছে কম নয়। আমার সাধ্য ছিল কি এই পাটের কারবারী আর চাষীদের হাত ক'রবার!" তারপর কিছুটা থামিয়া কহিল, "চলুন, আজ আর আপনাকে মোটেই ছুটি দিচ্ছি না, রাত্রে আমার ওখানে খেয়ে-দেয়ে তারপর যাবেন। ব্রজবিহারী বাবুও সঙ্গে থাক্‌বেন'খন। দরকার হ'লে আলো নিয়ে আপনার আস্তানা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবে দরোয়ান।"

শ্রীমন্ত কিছুমাত্র আপত্তি তুলিল না। ব্রজবিহারীর বহুপূর্ব্বেই ক্যাসের কাজ শেষ হইয়াছিল। হ্যারিকেন জ্বালাইয়া বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ততক্ষণে দুইটান বিড়ি খাইয়া লইতেছিল দরোয়ান সিন্ধুরাম। বাবুদের সহসা উঠিবার আভাস পাইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা সে এবারে হাতের তেলোয় আড়াল করিয়া একরকম আড়মোড়া ভাঙিবার ভঙ্গিতেই স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠিল, "জয় সীয়ারাম।"

বাধা দিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "উঁহু, বলো—জয় ভারতমাতা কি জয়, গান্ধী মহারাজ কি জয়, নেতাজী কি জয়।" তারপর ধীরপদে সাম্‌নের পথে পা বাড়াইল শ্রীমন্ত।

নানা ব্যঞ্জনে পরম পরিচ্ছন্ন রুচিতে কাছে বসিয়া যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ণ করিয়া খাওয়াইল মালতি : নিখিল ব্রহ্মের বোন। বয়স বেশী নয়, ষোলো ছাড়িয়া সবে সতেরোয় পড়িয়াছে, ঘরে বসিয়া প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক্-সিলেকশন্ মুখস্থ করে। চমৎকার রাঁধে। বেশ লাগিল শ্রীমন্তের। সেই যে কবে সৌদামিনী নিজের হাতে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া কত আদর করিয়াই না খাওয়াইয়াছিল, মালতির ব্যঞ্জন-স্বাদে সৌদামিনীর আদা-পেঁয়াজের সম্ভারের গন্ধই যেন শ্রীমন্তের জিহ্বায় আর নাকে আর-একবার বড় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। এইখানেই মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের কেমন যেন একটা আত্মিক যোগ! হেঁসেলের দরজায় যেন তাহারা একসত্তায় একমূর্ত্তি নারায়ণী।

"আপনি তো বেশ লোক, কিচ্ছুই তো মুখে তুল্ছেন না?" পাতলা ঠোঁটের কোণে একবার মৃদু হাসির রেখা টানিল মালতি।

"না, না, এই তো খাচ্ছি, মানে—রান্না যা হ'য়েছে, তা একটু সময় নিয়ে খাওয়াই প্রয়োজন। নইলে নিজেই যে ঠ'ক্বো! এদিকেও আশঙ্কা আছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার; ওদিকেও ভয় আছে পাকস্থলী ভ'রে যাবার। দু'টোর

সমতা রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে গিয়েই যা একটু—" আধো লজ্জায় অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই মাথা নিচু করিয়া নিল শ্রীমন্ত।

"এ কিন্তু আপনি ঠাট্টা ক'রছেন।" মালতি কহিল, "দাদার মুখে একটি বেলাও যদি আমার রান্না ভাল লেগে থাকে! আমিও জানি, র'াধতে আমি সত্যিই পারি না।"

একবার তির্য্যক ভঙ্গিতে চাহিতে গিয়া এবারে শ্রীমন্তের দৃষ্টি পড়িল ঘরের আর-একটি কোণে। প্রৌঢ়া এক বিধবা নীরবে বসিয়া মৃদু হাসিতেছেন। ইনিই এ বাড়ীর মা: বিমলা দেবী। নিতান্ত সেকালের না হইলেও একালের ন'ন। মাঝামাঝি একটা আধা-রক্ষণশীলতার ছাপ আছে চেহারায়।

সেইদিকে দৃষ্টি তুলিয়াই নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "শুন্‌লে তো মা, তোমার মেয়ের কথা? র'াধাটা বেশ একটু শিখেছে ব'লে মুখে আর বিনয়ের অহঙ্কার ধরে না। শ্বশুরবাড়ীতে গেলে তোর যদি তেমন কোনো দেওর-কুটুমই জোটে, তবে যে কথায় কথায় তুই কি ক'রবি, তাই ভাবছি।" বলিয়া অপাঙ্গে একবার মালতির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

এবারে সত্যিই যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল মালতি, মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দাদার কিন্তু ভাল হবে না মা, ব'লে রাখছি।"

এতক্ষণে কথা বলিলেন বিমলা দেবী: "র'াধা নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি ভাই-বোনে ঝগড়া ক'রতে চাস তোরা? কি মনে ক'রবে ওরা, বল্‌তো?"

সত্যি সত্যিই একটা জটিলতর কিছু ব্যাপার যেন। হো-হো করিয়া সমস্বরে এবারে হাসিয়া উঠিল সকলে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছিল ব্রজবিহারীর। ম্যানেজারের পাশে বসিয়া তাঁহার পারিবারিক এই রসিকতায় ঠিক সহজভাবে যোগ দিতে পারিতেছিল না সে। শ্রীমন্ত ব্যাঙ্কের শুভার্থী, বহু ডিপজিটার দিয়া মানের বৃত্তটা অনেকদূর বাড়াইয়া নিয়াছে। ম্যানেজারের আড়ালে অগোচরে ব্রজবিহারী যে দুই একটান বিড়ি-সিগারেট না টানিয়াছে শ্রীমন্তের সাম্নে, এমন নয়; কিন্তু এখানে সে যেন অনেকটা খাপছাড়া, অন্ততঃ নিজের কাছে নিজেকে তাহার কেমন একটা অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হইল। বার কতক এদিক-ওদিক চাহিয়া নীরবে আবার চোখ নামাইয়া থালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

শ্রীমন্ত কহিল, "আপনিও যেমন মা, এতে আবার কিছু একটা মনে ক'রবার আছে নাকি ?"

সুন্দর আবহাওয়া। আরও যেন অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য-সৌন্দর্য্যে সহসা মনের কোন্ এক গোপন স্থান ভরিয়া উঠিল বিমলা দেবীর। অচেনা নতুন ছেলের মুখে 'মা' ডাক যেন মধু বর্ষণ করিল তাঁহার কানে। মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেক্ষণ তিনি শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

হাসিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ওঁর তো পরিচয় এখনও তোমাকে দিই নি মা, আজ আমার ব্যাঙ্ক যতটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার মূলে এই শ্রীমন্ত বাবু। আর এইটুকুতেই

শেষ নয়। বিপ্লবী রক্ত র'য়েছে ওঁর শিরায় শিরায়। ওঁর কাছে সত্যিই আমাদের লজ্জায় ধিক্কার আসে। আমরা যে কত দুর্ব্বল আর সমাজের কত নিচে প'ড়ে আছি—শ্রীমন্ত বাবুর দিকে চাইলে তা' স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি।"

কথাটা কেমন যেন খট্ করিয়া একটু লাগিল এবারে বিমলা দেবীর মনে! বলিলেন, "তা বাবা বিপ্লব-টিপ্লব ভালো নয়। যেমন সব শুনতে পাই, শেষে পুলিশি হাঙ্গামায় প'ড়বে!"

নিজেকে অনেকখানি চাপিয়া যাইয়া শ্রীমন্ত উত্তর করিল, "জীবনে তো হাঙ্গামার অন্ত নেই, চিরকাল তো সারাটা জাত আমরা বিশাল অগ্নিকুণ্ড আগ্‌লেই আছি, তাতে ক'রে সত্যি-কারের দেশের মুক্তির জন্যে আর-একটু বেশী হাঙ্গামায় যদি প'ড়তেই হয়, পড়ি না কেন, ক্ষতি কি? তিলে তিলে দগ্ধ হবার চাইতে একদিনে একটা কিছু নিষ্পত্তি হ'য়ে যাওয়াই ভালো নয় কি, মা?"

সাধারণ ধর্ম্মভীরু মানুষ বিমলা দেবী। কথাটার সহসা যথাযথ উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অনেকখানি আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা মালতি। শিক্ষাব্রতের পিছনে খণ্ড-খণ্ড যুক্তিবাদ উঁকি দেয় মনের পর্দ্দায়। স্বর তুলিল এবারে মালতি: "সে নিষ্পত্তিই বা হ'চ্ছে কোথায়? ধরুন, খুব দৌড়-ঝাঁপ ক'রলেন, পুলিশে বাধা দিল, তাও যদি না মান্‌তে চাইলেন, তবে ধরা প'ড়লেন হাজতে, আটক

প'ড়লেন জেলখানার লোহার শিকলে, তিলে তিলে ডেকে আন্‌লেন মৃত্যু ; কি লাভটা হ'লো ?"

মৃদু হাসিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "ছোট বোন তুমি, তোমাকে আপনি না ব'লে তুমিই ব'ল্‌ছি ; রাগ কোরো না। কিন্তু জানো তো, লক্ষপতি ব্যবসায়ীও অতিরিক্ত লাভের মুখে প'ড়তে গিয়ে অনেক সময় লোকসানের ঘাড়ে গিয়েই পড়ে। অতিবড় লাভটাই সব সময় বড় কথা নয়, মন্দা বাজারে লোকসানটা পুষিয়ে যাওয়াও বড় ব্যবসায়ীর কৃতিত্বেরই লক্ষণ। যে-লোকসানের মুখে প'ড়ে আজ আমরা মন, প্রাণ, জাতীয় সম্পদ আর স্বাধীন চিন্তাধারাকে দিনের পর দিন পরের হাতে বিকিয়ে দিয়ে চ'লেছি, তাকে যদি নিজেদের গৌরবে আবার ফিরিয়েই আন্‌তে না পারলুম, তবে তার থেকে নিষ্ক্রিয় জীবনে মৃত্যুই ভাল নয় কি ?"

মালতি কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ঋষির কথা হ'চ্ছে—আহারে অতি-কথন নিষিদ্ধ। খেয়ে দেয়ে উঠুন, তারপর আর পা না বাড়িয়ে সারা রাত বরং জেগে ব'সে আলোচনা ক'রবেন।"

পাতের ভাত সত্যিই বড় বেশী মুখে উঠিতেছিল না। কিন্তু তথাপি বড় একটা কান দিল না শ্রীমন্ত নিখিল ব্রহ্মের কথায়। মালতিকে লক্ষ্য করিয়াই পুনরায় কহিল, "তুমি কেন ও-কথা ব'ল্‌বে মালতি ? আজ দেশের যে চেতনা এসেছে, তাতে তোমার দাদা হয়ত সংসার প্রতিপালনের দায়িত্বে এগিয়ে আস্‌তে

না পারেন, কিন্তু তুমি কেন অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে থাক্‌বে? তোমাদের হাতে কতখানি শক্তি—তা যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে তোমরা দেখতে পাও না। বিজয়লক্ষ্মী আর সরোজিনী নাইডু সারা জীবন কেমন দেশের জন্যে নিঃস্বার্থ চিত্তে নিজেকে বিলিয়ে যাচ্ছেন, মাতা কস্তুরবা কেমন ক'রে কারারুদ্ধ জীবনে মৃত্যু বরণ ক'রলেন, আর কাগজে পাচ্ছ' আজ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর ইতিহাস, চোখের 'পরে আজ দেখতে পাচ্ছ' সব। এম্‌নি ক'রেই গ্রামে গ্রামে আজ মেয়েদের গ'ড়ে তুল্‌বার দরকার ঝাঁসীর রাণী-বাহিনী।" একবার থামিল শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের চিরদিনের স্বাভাবই এই, একবার কথার সূত্র পাইলে অনর্গল অবিশ্রান্ত বলিয়া যায়, কোথাও বিচ্ছেদ নাই, তাল বা ধ্বনির অসঙ্গতি নাই।

অভিভূতের মতো জানুর উপরে হাতের তেলোয় গাল পাতিয়া একদৃষ্টে শুনিয়া চলিয়াছেন বিমলা দেবী। এপাশে ওপাশে ব্রজবিহারী আর নিখিল ব্রহ্ম। কথা তুলিবার অবকাশ নাই কাহারও মুখে। সিন্ধুরাম ইতিপূর্ব্বেই পুনরায় ব্যাঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিল। নতুবা হয়ত বাহিরের দুয়ারে বসিয়া বসিয়া বিড়ির পর বিড়ি টানিয়া টানিয়া অলক্ষ্যে জায়গাটাকে একেবারে নোংরা করিয়া তুলিত, আর মাঝে মাঝে হাই তুলিয়া তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তুড়ি বাজাইয়া মুখে হয়ত চিরাচরিত ধ্বনি তুলিত: 'জয় সীয়ারাম'।

মালতি কিছু একটা বলিল না।

শ্রীমন্ত কহিল, "জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ মালতি। ডায়ার গুলি চালালো, শুধু বিপ্লবী ছেলেরাই ম'রলো না, প্রাণ দিল কত বিপ্লবী মেয়েরাও। পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচার আর ডায়ারের গুলি মেয়েদের ব্রতভঙ্গ ক'র্‌তে পারে নি সেদিন। আজকালকার মেয়ে তুমি, সেই রক্ত যে তোমারও মধ্যে র'য়েছে বোন, চেষ্টা করো না একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে!"

এবারে রীতিমত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল নিখিল ব্রহ্ম, কহিল, "তবেই হ'য়েছে। আমিই যথেষ্ট দেশ উদ্ধার ক'রেছি, এবারে বাকী আছে মালতি। তার চাইতে বলুন, যাতে আর একটু মন দিয়ে প'ড়ে আগামী বছরে এপিয়ার হ'তে পারে একজামিনে।"

বিমলা দেবীও ছেলের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তাই একবারটি বরং বলো। সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ে আমরা, দিনরাত উনুনের আগুনের পাশেই কাটাতে শিখেছি, অমন সব মস্ত ভারিক্কি আগুনে-কথা শুনে কি আমাদের দিন চ'ল্‌তে পারে! তু'দিন বাদে চোখ বুঁজ্‌বো, তার আগে কোনো ঘরে যদি মেয়েটাকে গতি ক'রে দিয়ে যেতে পারি, তবেই মনে ক'রবো—শান্তিমনে গেলাম।" বলিয়া একটা ভারী নিঃশ্বাস চাপিলেন বিমলা দেবী।

বস্তুতঃ, আপাতঃ-দর্শনে শ্রীমন্তের প্রতি অনেকখানি মমতা আসিলেও কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজেদের সংসার সম্বন্ধে অনেক-

খানিই যেন প্রমাদ গণিলেন বিমলা দেবী। এমন সব কথা চৌকিদার পুলিশের কানে গেলে এক্ষুণি আসিয়া যে বাড়ী ঘেরাও করিবে! আর তেমন একটা কিছু করিলে তখন উপায় ?

মায়ের কথার শেষের দিকে মালতি যেন নিজের সম্বন্ধে বিশেষ একটা ইঙ্গিত পাইয়াই লজ্জায় সেখানে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। ত্রস্তে উঠিয়া সে আড়ালে একদিকে সরিয়া পড়িল। শ্রীমন্ত যেন এতক্ষণে কথা দিয়া রীতিমত যাদু করিয়াছে মালতিকে। ধীরে ধীরে মাটির সমতল ক্ষেত্র হইতে কঠিন কোনো গিরিগাত্রে উঠিবার মতই সহনশীল অথচ দুস্তর সমস্যা-কঠিন কথাগুলি। সারা মনের উপর দিয়া যেন কেমন একটা প্রলেপ আঁকিয়া গেল। একান্তে দাঁড়াইয়া যতই কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল, ততই যেন মুগ্ধ হইয়া গেল মালতি ; লজ্জাও হইল বড় কম নয়! কী মূর্খের মতো এতক্ষণ নির্লজ্জভাবে সে তর্ক করিয়াছে! আত্মবিকাশের অনবদমিত ইচ্ছা বড় গভীরভাবে মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মনে একবার সাড়া দিয়া উঠিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রীমন্তের একটি মাত্র কথাই বার বার তাহার কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল : 'আজ-কালকার মেয়ে তুমি,- সেই রক্ত যে তোমারও মধ্যে র'য়েছে বোন, চেষ্টা করো না একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে।'—যতটুকু জ্ঞান পাইয়াছে আজ পর্য্যন্ত মালতি, তাহা দ্বারা নিজের সম্বন্ধে কিছু একটা বুঝিয়া লইবার মতো যথেষ্ট আলোকসম্পাত

হইয়াছে মনে। যেটুকু বুঝিতে পারে নাই বলিয়া বোকার মতো কথা কাটিয়াছে সে, সেইটুকুও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে শ্রীমন্তের কথায়। দেশের জন্য জীবন না দিলে বাস্তবিকই এ-জীবনের মূল্য কি, লাভের কারবার কোথায়!

বিমলা দেবীর কথার উত্তরে শ্রীমন্ত বলিল, "বিয়েটাই কি জীবনে সব চাইতে বড় কাজ? আপনি কি পারেন না মালতিকে দেশের জন্যে উৎসর্গ ক'রতে? ইতিহাসে অন্ততঃ একটা দাগ রেখে যাক্। তারপর যদি বিয়েই দিতে হয়, তবে সে ভার আমার উপরে দিন; দেশে আজ সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর অভাব নেই, তাদের কাউকে যদি আপনি জামাই পান, তবে কি সুখী হ'ন না?"

"তা বাবা এ কিন্তু সুখী অসুখীর কথা নয়।" মনে মনে যথেষ্ট আতঙ্ক থাকিলেও মুখে মৃদু হাসি টানিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এ নিতান্তই দৈব; মালতির ভাগ্যে কি-রকম বর জুটবে, সে কি বাবা তুমিই কিছু একটা ভবিষ্যৎ ব'ল্‌তে পারো? আর দেশের কাজের কথা ব'ল্‌ছ, দেশের কাজ কি সবাই-ই ক'রতে পারে? আসলে মালতি কোনো দিন সে-ভাবেই গ'ড়ে ওঠে নি; হাড় শক্ত চাই বাবা, নইলে কি দেশের কাজে কেউ নাম্‌তে পারে?"

খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

আর একবার মালতি আসিয়া ছোট্ট একটি রেকাবীতে পান এবং মস্‌লা সাজাইয়া দিয়া গেল।

ব্রজবিহারী এতক্ষণে যেন রীতিমত ঘামিয়া উঠিল নিজের মধ্যে। ম্যানেজারের কথা ঠেলিতে পারে নাই, অথচ আসিয়া একেবারে বোবা বনিয়া গিয়াছে সে। শ্রীমন্তের কানের কাছে মুখ আনিয়া একবার ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "উঠবেন নাকি ?"

কিন্তু শ্রীমন্ত সে-কথায় বিশেষ মন না দিয়া বিমলা দেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "হাড় কেউ শক্ত নিয়ে পৃথিবীতে আসে না মা। পুড়িয়ে পিটিয়ে তবেই সোনাকে আরও পাকা শক্ত ক'রতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে তেম্‌নি ক'রেই সবাই শক্ত হ'য়েছে। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কি কম নালিশ মা! শুধু মালতির বয়সী মেয়েরাই কেন, আপনার মতো মা মাসীমারও যে যথেষ্ট কাজ আছে। জন-মতের দাবীতে আপনারাই কি কম কিছু? চুড়ামণি, অর্দ্ধোদয় আর গ্রহণে দেখেছি লক্ষ লক্ষ মা মাসীমারা শত বিপদ মাথায় নিয়েও ট্রেণ, ষ্টীমার আর নৌকো-বোঝাই হ'য়ে শীত গ্রীষ্ম ভুলে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছেন। পুণ্যের সেতু আরও সাত জন্ম এগিয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নালিশ আমার সেইখানেই, যেখানে দেখি—দেশের স্বাধীনতার পুণ্যে আপনারা একেবারে নীরব।" থামিয়া একবার ঢোক গিলিল শ্রীমন্ত, তারপর হাসিয়া পুনরায় কহিল, "একথা ব'ল্‌লে শুধু আপনি কেন, কোনো সংসারের মা মাসীরাই যে আমাকে ক্ষমা ক'রবেন না, তা জানি। তবু এ আমার একটা বাতিক, না ব'লে থাক্‌তে পারি না। যে ভাবে ঐ যোগ, গ্রহণ আর তিথিগুলিতে

গঙ্গা-স্নানের মহড়া দেখেছি, ঠিক সেই ঐক্যবদ্ধ পথে যদি আপনাদের একবার সম্মিলিত ধ্বনি উঠ্‌তো—'মা হ'য়ে সন্তানকে যদি রক্ষা ক'রতে পারি, তবে দেশকেও পারবো; বিদেশীর স্থান এখানে নেই, হিন্দুস্থান—স্বাধীন হিন্দুস্থান, বিদেশী দূর হ'য়ে যাও।' তবে সেই ধ্বনি দিল্লীর লালকেল্লা থেকে বাকিংহাম প্যালেস পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ইঁট আর পাথর-খণ্ডকে কাঁপিয়ে তুল্‌তো।—শুধু ইংরেজ নয়, সমস্ত পৃথিবী তবে স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে দেখতো—হ্যাঁ, এ একটা জাত বটে, এ-দেশের ছেলেরা আস্ত এক একটি গোখরো আর মায়েরা তাজা বাঘিনী, বেশী ঘাঁটাতে গিয়ে কামড় খেতে হবে, অতএব—।"

বিমলা দেবী এবারে যেন কেমন হইয়া গেলেন। কথা বলিবার উৎসাহ নাই, হাসির আভাসও দেখা গেল না এতটুকু মুখে। একবার চক্‌চক্ করিয়া উঠিল চোখ দুইটি, তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার শান্ত হইয়া আসিল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন কত অনুতাপের, কত অপরাধের আর অনুরাগের। মনের আতঙ্ক হইতে এতটুকুও যে তিনি মুক্ত হইতে পারিলেন, তাহা নয়; কিন্তু সেই আতঙ্ক ছাপাইয়াও এবারে যে ভাবটা জাগিয়া উঠিল, তাহা যেন তিনিও কিছু একটা বুঝিলেন না। স্বীকার করিয়া নিতে পারিলেন যে তিনি শ্রীমন্তকে, এমনও নয়; অপমান বাচক বলিয়াও কথাটা একবার মনে হইল বটে। অপমান নয় তো কী, বাড়ী বহিয়া আসিয়া তিথি-পুণ্যের ওজর তুলিয়া ইহার চাইতে আর বেশী কে কি আঘাত দিয়া যাইতে পারে?

কিন্তু বড় স্পষ্ট আর উচিৎ-বক্তা বটে ছেলেটি। স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; মিথ্যা তর্ক তুলিয়া কথা কাটিতে যাইয়া যেন নিজের জালেই নিজে জড়াইয়া পড়িতে হয়। ভাষাহীন মুখে অপলক দৃষ্টিতে তিনি শুধু শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

একটা উত্তেজনার মুখে আসিয়া শ্রীমন্ত এমন ভাবে থামিয়া পড়িয়াছিল যে, সহসা কেহ আবার কথা তুলিয়া তাহাকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সুযোগ দিল না। ব্রজবিহারী একই ভাবে স্থাণুর মত বসিয়া ছিল। মালতিও ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া ঘরের একপাশে খুঁটি ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একান্ত মনে শ্রীমন্তের কথাই শুনিতেছিল। প্রথম যৌবনের রক্তে যেন তাহার আগুন ধরিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। বিস্মৃতির পথ বাহিয়া সহসা একবার মনে পড়িল তার প্রিয়তোষের কথা।—মালতিরা ছিল তখন মাদারীপুর সদরে। পাশের বাড়ীর ছেলে ছিল প্রিয়তোষ। একদিন অতর্কিতে আসিয়াই পাশে বসিয়া বলিল, "মালতি তো ফুলের নাম, ফুল তুমি নিশ্চয়ই ভালবাসো, এসো খোঁপায় পরিয়ে দিই।" বলিয়া আর কথার অপেক্ষা না রাখিয়াই হাতে-আনা কী একটা সুন্দর সুগন্ধি ফুল একরকম জোর করিয়াই তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিল; তারপর কেমন একরকম অদ্ভুত হাসিয়া কহিল, "বেড়াতে যাবে মালতি নদীর ধারে? মাঝিরা দলে দলে সারিন্দা বাজিয়ে কি চমৎকার ভাটিয়ালী গায়, শুন্‌লে

আর আসতে চাইবে না।”—এম্‌নি করিয়া সত্যিই একসময় তাহার গভীর ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল প্রিয়তোষের সাথে। নামে আর চেহারায় মিলাইয়া কেমন যেন এক অদ্ভুত রকমের ভাল লাগিয়াছিল প্রিয়তোষকে। তারপর মালতিরা চলিয়া আসে এইখানে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল—জাতীয় চেতনা আর সমাজবোধের দিক দিয়া সত্যিই কত ছোট ছিল প্রিয়তোষ। প্রতিদিন সে প্রায় ঐ একই আবেদন লইয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইত, এতটুকুও নতুন রস-মাধুর্য্যের অবকাশ ছিল না, যেটুকু ছিল—তা তার ঐ কথা বলার ভঙ্গীটুকুর মধ্যেই। আজ শ্রীমন্তের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে—পৌরুষের মানদণ্ডে কত নীচ আর হীন প্রিয়তোষ। সে কি আবার পুরুষ!

স্ত্রী-পুত্র নিয়া থাকে ব্রজবিহারী। কথায় আলোচনায় অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া নিখিল ব্রহ্মই এবারে ফাঁক বুঝিয়া উপযাচক হইয়া কহিল, “আপনার অসুবিধে হ’চ্ছে, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে, আপনি বরং আসুন।”

খাঁচা হইতে মুক্তি পাইয়া পাখী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কৃতার্থ হইয়া গেল ব্রজবিহারী। শ্রীমন্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আপনি বসুন, আমি তবে উঠি, বাসায় ওরা আবার একা র’য়েছে।”

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীমন্ত কহিল, “আমিই বা আর কতক্ষণ

ব'স্‌বো! রাত অনেক হ'লো। মাকে তো একরকম চটিয়েই দিয়েছি, এরপর আর বায়ু চ'ড়ে গেলে বাকী রাতটুকু ঘুমোতে পারবেন না।"

এতক্ষণে কথা বলিতে পারিলেন বিমলা দেবী।—"ঘুম আমার এম্‌নিই বেশী হয় না বাবা। অসুবিধে না হ'লে তুমি বরং আর দু'দণ্ড ব'সে যাও।"

ব্রজবিহারী চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত কহিল, "তা হ'লে আর দু'এক খিলি বরং পান খাওয়াও মালতি।"

আরও একটু কাছে আগাইয়া বসিল এবারে নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, "আজ একটা স্মরণীয় দিন গেল আমাদের এই ১১ই নভেম্বর। আন্‌এক্স্‌পেক্টেড্‌লি ইট্‌ হ্যাজ কাম্‌ আউট ইন্‌ আওয়ার ফরচুন। ভাগ্যিস্‌ বেরিয়েছিল গণপতি পাণ্ডের সংবাদটা কাগজে, নইলে এমন ক'রে কি পেতে পারতুম আপনাকে শ্রীমন্ত বাবু?"

ঈষৎ মুখ তুলিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "কি রকম?"

"এভ্‌রি এফেক্ট্‌ হ্যাজ্‌ সাম্‌ কজ্‌।" নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "অন্ততঃ লজিকে তাই বলে। আপনাকে এত সহজ ক'রে পাবার পেছনে যে ঘটনার ক্রিয়া ঘ'টেছে, তাকে অস্বীকার করি কি ক'রে?"

উত্তরে কথা না বলিয়া মৃদু হাসিল একবার শ্রীমন্ত।

বিমলা দেবী দ্বিপ্রাহরিক ঘটনার আদ্যোপান্ত কিছুই

জানিতেন না, কাগজপত্রের সঙ্গেও বিশেষ কোনোদিন সম্পর্ক নাই। কহিলেন, "গণপতি না কার নাম ক'রলি বাবা, সে কে ?"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা মা'কে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "স্বদেশপ্রাণ লোক ব'লেই শ্রীমন্ত বাবুকে তাঁর মৃত্যু এমন ক'রে আঘাত দিয়েছে।"

শ্রীমন্ত বলিল, "কিন্তু জানেন না মিঃ ব্রহ্ম, জাতীয় মুক্তি-শহীদদের এম্‌নিতর মৃত্যুই তিলে তিলে অমরতা দান ক'রছে দেশকে। নভেম্বর বিপ্লবে রাশিয়াতেও এম্‌নিই হ'য়েছিল। কত কৃষক, মজুর আর শ্রমিকের তাজা রক্তে লাল হ'য়ে গেল সেদিন সারা পথ, কিন্তু ব্যর্থ গেল না, ভেঙে গেল জার-শাসন-তন্ত্র !"

"আপনি কি বিশ্বাস করেন—তেমন আন্দোলন এ-দেশেও সম্ভব ?" নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "গণ-আন্দোলন আর জনযুদ্ধ নিয়ে আজ যারা দিনের পর দিন শ্লোগান দিচ্ছে, তারা তো কংগ্রেসী ব'লে মনে হয় না ! কৃষক আর শ্রমিক-জাগরণের স্কীম আছে বটে কংগ্রেসের, কিন্তু আপোষ আর সৌহার্দ্দ্য তার অনেকখানি কৃষক-শ্রমিকের মালিকের সঙ্গেই নয় কি ? অবশ্য আমার কোনো নিজস্ব মত নেই। লোকে বলে, শুনি ; তবে বিষয়টা ভাববার বটে,—ছ'দিক রক্ষা ক'রে কখনো আন্দোলন হয় না, আর যা হয়—তা অন্ততঃ স্বাধীনতা লাভের পথ যে নয়, এ তো মানবেনই। আর এই কারণেই সম্ভবতঃ মার্ক্সবাদের উপরে

আজ পার্টি গ'ড়ে উঠেছে এই দেশে! একেবারে যে ভূঁইফোড় অবাস্তব তারা, তাই বা বলি কি ক'রে?"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর কহিল, "এ কথার জবাবে আমাকে যদি সত্যিই কিছু ব'লতে হয়, তবে তা পুনরাবৃত্তিই হবে মাত্র। ব্যাঙ্কে বসে এ-কথার ইঙ্গিত আপনাকে দিয়েছি! তা ছাড়া কৃষক-মজুর আন্দোলন এদেশে সম্ভব নয়, তাই বা বলেন কি ক'রে? কী দারুণ বিক্ষোভে আজ দেশ জুড়ে তাদের ধর্ম্মঘট সুরু হ'য়েছে, দেখেছেন? চরমতম নির্য্যাতনের মুখে একদিন তারা বিসুবিয়াসের মতো লক্ষ লাভায় জ্ব'লে উঠবে! পরাজয় কোনোদিন তাদের ললাটে কলঙ্কের দাগ এঁকে দেবে না, এ কথা ধ্রুব জানবেন।" তারপর থামিয়া পুনরায় কহিল, "আর—কংগ্রেসের কথা ব'লছেন? কংগ্রেসের মধ্যে যে আজ কত গলদ র'য়েছে, সে কথা কি আমিই অস্বীকার ক'রবো? কিন্তু সেটাকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে খণ্ডাংশে বিচার ক'রবার দরকার! দু' একজন নেতাকেই মাত্র সমগ্র কংগ্রেস ব'লে আমি বিশ্বাস করি না, তাই নিন্দাও ক'রতে পারি না তাকে! ত্রুটী বিচ্যুতি—তা একান্তই নেতৃত্ব বা সংখ্যাবাচক, কংগ্রেস সমগ্র জাতীর; সমগ্র জাতি যদি তাকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলে, তবে যে কোনো গলদই থাকে না! যদি বুঝতুম, কংগ্রেস কোনো একটা বিশেষ দল, তবে স্বতন্ত্র কথা ছিল; কিন্তু এ তো দল নয়, এ যে এক রক্তে এক জাত—অখণ্ড ভারতবর্ষ! এখানে

নায়কত্বের প্রশ্নই বড় নয়, প্রধান নয় কোনো ক্রুটী বিচ্ছেদ। এক-জাতিত্বই তো ন্যাশনাল কংগ্রেস; প্রত্যেকের এখানে জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকার এক এবং অচ্ছেদ্য। আপনি আমি যদি সেই অধিকার নিয়ে তার সংস্কার না করি, তবে সে ক্রুটী যে আমাদেরই, মিঃ ব্রহ্ম।"

বক্তৃতার মতো ঝর-ঝর করিয়া বলিয়া গেল শ্রীমন্ত। নিখিল ব্রহ্ম সবটাই যে পরিষ্কার বুঝিল, এমন মনে হইল না। কথা শেষ হইয়া গেলেও বহুক্ষণ ধরিয়া নীরব দৃষ্টিতে সে শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিমলা দেবী আদৌ গোড়া হইতে এই তিক্ত আলোচনার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেছিলেন না। এবারে আবহাওয়াটাকে অনেকখানি খাদে নামাইয়া আনিবার প্রয়াসেই কহিলেন, "আমার কিন্তু একটা ক্রুটী হ'য়ে গেছে বাবা; কিছু মনে ক'রো না যেন!"

"সে আবার কি?" শ্রীমন্ত বলিল, "এমন আবার কি ক্রুটী ক'রে ব'স্লেন, মা?"

"তোমার বাড়ী-ঘরের কারুর কুশলই জিজ্ঞেস্ ক'রতে পারি নি।" মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "এতখানিটা বয়স হ'লো, সংসারী হ'য়েছ নিশ্চয়ই। বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া শুধু শ্রীমন্ত নয়, নিখিল ব্রহ্ম এমন কি মালতি পর্য্যন্ত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত কহিল, "এবারে সত্যিই কিন্তু ভাবিয়ে তুল্‌লেন মা। তা—প্রথম প্রশ্নের জবাব হ'চ্ছে, সংসারী হবার খুব বিশেষ একটা অনুকূল সুযোগই পাইনি এ-পর্য্যন্ত। এখন ভাবছি, আপনার মতো মা পেলে এতদিনে লক্ষ্মীমন্ত সব ছেলেপুলে নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চ'লতে পারতুম। কিন্তু অদৃষ্ট! যিনি গর্ভে ধ'রেছিলেন, তিনি নিশ্চিন্তে চ'লে গেছেন আমার জ্ঞান হবার আগেই। আপনার মতো মা পেলাম, তাও এত দেরীতে—যখন বিয়ের আদৌ বয়স রইল না। আর—আত্মীয় পরিজনের কথা জিজ্ঞেস ক'রছেন? সবার স্মৃতি ধারণ ক'রে ঘরে আছেন এক বুড়ী ঠাকুরমা, বাবার সৎমা। স্ত্রী ব'লতেও তিনি, অভিভাবিকা ব'লতেও তিনি। ঠাকুরদাদা সম্ভবতঃ 'তালাক' দিয়ে আমার ঘাড়েই পাঠিয়েছিলেন বুড়ীকে! দেখলাম—বেচারা, আর সত্যি কথা ব'লতে কি মা, এখন যেন বুড়ীর ওপর রীতিমত মায়াসক্তই হ'য়ে প'ড়েছি। এই যে কাছে নেই, দিনরাত কত না যেন চোখের জল ফেলছে।"

এত রসিক যে শ্রীমন্ত—তাহা বিমলা দেবী কিম্বা মালতি তো দূরের কথা, কিছুকালের পরিচয়-সূত্রে নিখিল ব্রহ্ম পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারে নাই। কথা শুনিয়া প্রত্যেকেই তাই বেশ রস উপভোগ করিয়া হাসিতেছিল।

থামিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "কিন্তু বুড়ো মানুষ তো আর চিরকাল থাক্‌বেন না! তখন অন্ততঃ ঘর রক্ষা ক'রবার জন্যেও তো লোকের দরকার!"

শ্রীমন্ত কহিল, "চিরকাল না হোক্ অন্ততঃ কিছুকাল তো আছেনই ! তারপর ঘর যদি রক্ষা হয় হ'লো, না হ'লে পথ তো আছেই। জীবনকে চালিয়ে নিতে পারলে কোথাও ঠেকে যায় না। ঠিক যেন রোলারের মতো, ঘোরালেই ঘোরে, থামলেই আবার ঠেলতে গিয়ে নতুন শক্তিব্যয়ের দীনতা আসে।"

"বাঃ !" সোৎসাহে নিখিল ব্রহ্ম বলিয়া উঠিল, "চমৎকার 'এক্সপ্রেশন' পেলাম আজ আপনার মুখে। 'এ্যাব্‌সলিউট্‌লি নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অব লাইফ'। আপনি 'ডিভাইন জিনিয়াস' শ্রীমন্ত বাবু। এমন কাছের ক'রে পেয়ে সত্যিই আপনাকে ঠিক উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পার্চ্ছি না। আমার অনুরোধ, আপনি বই লিখুন, আমি আপনাকে পাব্‌লিকেশনে হেল্‌প ক'রবো।"

কিছু একটা উত্তর না দিয়া অদ্ভুতরকম একবার হাসিল শ্রীমন্ত।

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "হাসলেন যে বড় ?"

"হাসির কথা ব'ললেন কি না, তাই।" একটু নড়িয়া বসিল শ্রীমন্ত। কহিল, "দুঃখবাদী বাঙালী আমরা, দার্শনিক তত্ত্বে নিজেদের সত্তা যেন অনেকটা সান্ত্বনা পায় ! আপনার কথা থেকে অন্ততঃ তাই মনে হ'চ্ছে।"

নিখিল ব্রহ্ম এবারে অনেকখানি লজ্জিত হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ঠিক যেন হঠাৎই খানিকটা পরিবেশবিভ্রমে ঔচিত্য ছাড়াইয়া গিয়াছে। দ্বিরুক্তি না করিয়া অতি উচ্ছ্বাসের মুখেও তাই চুপ করিয়া গেল সে।

শ্রীমন্ত কহিল, "বই লিখ্‌বার ইচ্ছে যে আমারও নেই মিঃ ব্রহ্ম, তা নয়। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? কিছুকাল যদি দেশের লোকেরা শুধু অন্ততঃ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ্‌তে শিখ্‌তো, আর সাহিত্যিকেরা অনবরত জ্বলন্ত বারুদ ঢেলে দিতে পারতেন তাঁদের লেখায়, তবে হয়ত এই পৌনে দু'শ' বছরের শৃঙ্খলিত জাতির জীবনে বাঁধন ছেঁড়ার একটা দুর্জ্জয় গতি আস্‌তো! এ-দেশে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে যত বড় ক'রে খুঁজে পাই, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে তত বড় ক'রে পাইনা।"

ধীরে ধীরে আবার একটু সহজ হইতে চেষ্টা করিল নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, "তাও সেই জেল আর হাত-কড়ির ভয়েই। জানেন তো, আই. বি'র লোক এ-দেশের চৌদ্দ আনি বাঙালী হ'লেও চাকরী-জীবনে তারা অত্যন্ত লয়্যাল। প্রয়োজন হ'লে বাপকে পর্য্যন্ত তারা ছেড়ে দেয় না।"

"কিন্তু আমার কথা হ'চ্ছে, সেই প্রয়োজনের খাতিরেই এই বিরাট দেশকে একসাথে সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়বার দরকার ছিল এর অনেক আগেই। আজও তো সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ দুঃখ স্বীকারের তেমন প্রতিশ্রুতি নেই!" শ্রীমন্ত কহিলঃ "সাহিত্যিকেরা আজ বস্তুতান্ত্রিক হ'চ্ছেন যতখানি, সংগ্রামমুখী ততখানি ন'ন্। নিস্‌পিস্ ক'রে ওঠে তাই এক-একবার আঙ্গুলগুলি, ভাবি—এমন কিছু লিখি, যাতে ক'রে এই পরাধীনতার দুর্জ্জয় বন্ধনপাশই নয়, জ্বালিয়ে

পুড়িয়ে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলি সব কিছুকে। আর, তখনই মনে পড়ে মহাকবি হুইট্‌ম্যানকে—

O to struggle against great odds, to meet
enemies undaunted !
To be entirely alone with them, to find
how much one can stand !
To look strife, torture, prison, popular odium,
face to face !
To mount the scaffold, to advance to the
muzzles of Guns with perfect nonchalance !
To be indeed a God !..."

ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ শোনা গেল—বাহিরের পথে লাঠি ঠুকিয়া হাঁক দিয়া গেল চৌকিদারেরা : 'ঘুম না সজাগ !'

ঘড়ির কাঁটার দিকে কাহারই লক্ষ্য ছিল না। প্রতিদিন ইহার বহু পূর্ব্বেই মালতি ঘুমাইয়া পড়ে ; কিন্তু আজ তাহারও চোখে যেন বড় একটা ঘুমের জড়তা নাই। স্থাণুর মতো নীরবে বসিয়া থাকিলেও আলোচনায় মনে মনে সে যেন অনেকখানিই অনুপ্রেরণা পাইতেছিল। কিন্তু বিমলা দেবী আর বড় বেশী বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। নীরবে উঠিয়া যাইয়া নিজের বিছানায় একসময় এলাইয়া পড়িলেন।

দূরে কোথায় ঢং করিয়া একবার ঘড়ির শব্দ হইল : একটা।

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "বাব্বাঃ, এরই মধ্যে এত রাত হ'য়ে

গেল !”—ভাবটা সম্ভবতঃ এই যে, ইহার পর বিছানায় গেলে শুধু হয়ত শোওয়াই হইবে, ঘুম হইবে না, সুতরাং—।

শ্রীমন্তেরও উঠিবার তাগিদ একেবারে কম ছিল না। বাধা না পাইলে ব্রজবিহারীর সঙ্গেই বহু পূর্ব্বে সে উঠিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তর্কের খাতিরে আলোচনা তাহাকে একেবারে সময়-বিস্মৃত করিয়া ফেলিল। বুকের জ্বালা মুখে বলিয়া কি শেষ করিবার জো আছে! নিজের বক্তব্য শেষ করিয়া নিজেই যেন সে কেমন একটা ঘূর্ণিচক্রে দোলা খাইয়া উঠিল। যতখানি সে বলিয়া ফেলিল, ঠিক সেই স্তরে যাইয়া সেই-কি পৌঁছিতে পারিয়াছে? আজও তো সে রাজকীয় আইনের কবলে প্রতিমুহূর্ত্তে পলাতক আসামীর মতো ছদ্মবেশে ঘুরিয়া মরিতেছে। কেন সে বীরের মতো উন্নত শিরে সেই আইনের সামনে যাইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারে না—‘এ দেশ, এ নগর আমার, নাগরিক অধিকারে আমি ভাঙ্‌বো গ’ড়বো, যা ইচ্ছে তাই ক’রবো, তোমার অনুশাসন তাতে কেন?’—কিন্তু কাজ, অন্তরে প্রেরণা পাইয়াছে সে কাজের। সেই কাজ করিয়া যাইতে হইবে তাহাকে দিনের পর দিন। ঘরে ঘরে একবার যদি চারণ-শঙ্খ বাজাইয়া সে গৃহবাসীর নিদ্রা ভাঙাইতে পারে, তবেই যে তাহার ব্রত সার্থক! তবেই যে প্রতি-জীবনের মধ্য দিয়া তাহার ব্যক্তি-জীবনেরও সেই ‘advance to the muzzles of guns with perfect nonchalance.’ আর সেই আত্মাহুত শহীদ-যজ্ঞেই যে নব-ভারতের প্রাণ-অঙ্কুর নিহিত।

অনাবিল অথচ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে হুইট্‌ম্যানকে আবৃত্তি করিয়া একরকম অভিভূতের মতই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল শ্রীমন্ত। ঘড়ির সময় সম্পর্কে নিখিল ব্রহ্মের কথাটা যে তাহার কানে না গেল, তাহা নয়, কিন্তু বড় বেশী খেয়াল করিল না। পরে কহিল, "অত্যন্ত বেশী সময় ব্যয় ক'রলুম। ব'কে ব'কে এতক্ষণে আবার নতুন ক'রে খাবার অবস্থা হ'য়েছে। কিন্তু এত রাত্রে আবার উনুনে হাঁড়ি চড়াবার মতো কষ্ট নিশ্চয়ই মালতি স্বীকার ক'রে নেবে না।"

কথা শুনিয়া এবারে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল মালতি। —"আবার বুঝি ঠাট্টা আরম্ভ ক'রলেন, না? হঠাৎ শক্ত কথার মধ্যে এমন ক'রেও আপনি ব'ল্‌তে পারেন যে, না হেসে সত্যিই থাকতে পারি না।"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ঐটেই তো ওঁর প্রধান গুণ। দেশ তো দূরের কথা, আমরা যে আজ পর্য্যন্ত কথা ব'লতেই শিখ্‌লুম না রে মালতি। শ্রীমন্ত বাবুকে কি হিংসে হয় সাধে!"

"হয়েছে, যথেষ্ট হ'য়েছে, এবারে থামুন, আমি উঠি!" বলিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমন্ত কহিল, "বাঃ, মা তো বেশ মানুষ, আমাকে নির্ব্বিবাদে বসিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বেশ নাক ডাকাচ্ছেন!"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "কিন্তু কথায় কথায় ভুলে গিয়ে সিন্ধুরামকেও তো আট্‌কিয়ে রাখি নি, সেও হয়ত ব্যাঙ্কে গিয়ে

শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে! পথঘাট 'তো ভাল নয়! যাবেনই যদি, হ্যারিকেনটা তবে নিয়ে যান, মালতি বরং আর একটা ঘরে জ্বেলে নিচ্ছে।"

আপত্তি তুলিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "অন্ধকারের সাথে পরিচয় আছে আমার, তার জন্যে কিছু অসুবিধে নেই; আলো আর আপনাদের জ্বালাতে হবে না।"

"না, না, তা হয় না।" বাধা দিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "আর একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। যদি দয়া ক'রে এক-আধ সময় এসে মালতিকে ইংরেজি বাংলাটা অন্ততঃ একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যেতেন, তবে বড্ড উপকার হোতো ওর। বোন ব'লে যখন নিয়েছেন, জ্ঞানের দিকেই বা ওকে ফাঁকি দিয়ে যাবেন কেমন ক'রে!" কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা টানিল নিখিল ব্রহ্ম।

কিন্তু শ্রীমন্ত রীতিমত রসিকতার ছলেই উত্তর করিল: "বুঝেছি, ওকে পাশ হ'তে দেবেন না আপনি। এমন মাষ্টারের হাতে প'ড়লে ফেল অবধারিত।"

কথা শুনিয়া রীতিমত খিল-খিল করিয়াই হাসিয়া উঠিল এবারে মালতি। কহিল, "বেশ তো, ফেল যদি করিই, অপযশটা আপনি না হয় নেবেনই শ্রীমন্তদা।"

"তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।" থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "তবে হ্যাঁ, এক সর্ত্তে। এমন ক'রে চমৎকার রান্না খাওয়াতে হবে কিন্তু রোজ। কেমন, রাজী?"

"সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া হঠাৎ টিপ্ করিয়া একবার প্রণাম করিল মালতি শ্রীমন্তের পায়ে। কিন্তু শ্রীমন্ত সহসা ইহার কিছু একটা অর্থ বুঝিল না। শুধু মালতির অন্তর্দেবতা জানিল—আত্ম-পরিবৃত্তের মধ্যে এতটুকু স্বীকৃতি আর খ্যাতির জন্য কতবড় কাঙাল ছিল মালতি!

বন্দরের বুকে নিস্তব্ধ রাত্রির শান্ত আলিঙ্গন। ঘর বলিতে এখানে শ্রীমন্তের কীই বা আছে! সাহাদের গুদাম-বাড়ীর ছোট্ট একটি খোপে নিতান্ত অলস মুহূর্ত্তগুলি কাটাইয়া দেয়, কোনোদিন বা এখানে ওখানে। খাওয়া-পরা যা কিছু উহারই মধ্যে সব; চিন্তাপ্রসূতা, কর্ম্ম-সূচী—সব কিছু ঐ খোপটুকুর মধ্যেই নিহিত।

পাশে আড়িয়াল-খাঁর কালো জল মন্থর বাতাসে টলমল করিতেছে। কাছে দূরে অস্পষ্ট ভাবে তুলিতে দেখা যাইতেছে বিক্ষিপ্ত তুইএকখানি ছোটবড় নৌকার ছই। মাঝিরা কেরোসিনের কুপি নিভাইয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! পাট-গুদামের কেহ পর্য্যন্ত জাগিয়া নাই। তুই একটা নিশাচর পাখী কেবল মাঝে মাঝে অদ্ভুত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে। কলমুখর সারা বন্দরটা এমন করিয়াও ঘুমাইয়া পড়িতে পারে! এমন করিয়া আর যেন কোনোদিন চরমুগরিয়ার এই নিষ্ক্রিয় কালো দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পায় নাই শ্রীমন্ত।

আর একবার ঘড়ির শব্দ কানে আসিল: এবারেও একটা। হয়ত দেড়টার বেল পড়িল তবে। মুহূর্ত্তে পা তুইটায় যেন একটু

ক্ষীপ্র গতি আসিল শ্রীমন্তের। মনে পড়িল আর একটি রাত্রির কথা। সেদিনও এমন্ই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত রাত্রির দেড়টা। সৌদামিনীও হয়ত ভাল করিয়া বুঝিল না—কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! দাউ দাউ করিয়া অগুন উঠিল জমিদারী সেরেস্তা আর সরকারী দপ্তরের বুক ঠেলিয়া। গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িল মথুর দত্ত। কিন্তু আরও তুইটি প্রাণীর জন্য বড় মায়া হয় আজ শ্রীমন্তের। ঘটনার কয়েক দিন পরেই একদিন কাগজে বাহির হইল: "বারোখাদা অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিশ হরেন চাকী ও হারান ঘটক নামক তুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"—অনুশোচনা হইল একবার শ্রীমন্তের। হরেন চাকী ও হারান ঘটক সম্পূর্ণ নির্দোষ। আগুন দিয়াছিল শ্রীমন্ত নিজের হাতে। হয়ত একটা প্রাণান্ত-কর কাতর শব্দও উঠিয়াছিল ষ্টেশন ঘরের মধ্যে। চৌকিদার ছট্টু মান্না সারারাত্রি ঘুমাইয়া পাহারা দিত' ষ্টেশন ঘরে। সে কি তবে রক্ষা পাইয়াছে সেই আগুনের মুখে? সাথে সাথে কাগজে প্রকাশিত সংবাদের আরও খানিকটা অংশ মনে পড়িল শ্রীমন্তের, শুধু মনে পড়িল কেন, প্রত্যক্ষভাবে যেন কাটা কাটা অক্ষরগুলি আসিয়া তীব্রবেগে বিঁধিতে লাগিল তাহার তুই চোখে: "পুলিশের সিদ্ধান্তে মূল অভিযুক্ত আসামী মথুর দত্ত সম্প্রতি নিখোঁজ। তাহার প্রতি আই. ডি-এর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারী করা হইল।"

ভাবিতে যাইয়া একবার হাসি পাইল বড় কম নয় শ্রীমন্তের।

গ্রেপ্তারি পরওয়ানা শুধু তাহারই ভাগ্যে কেন, সারাটা দেশই যে আজ কঠিন পরওয়ানায় গ্রেপ্তার হইয়া আছে! এই বিরাট গ্রেপ্তারি যজ্ঞে একা সে আজ কতটুকু অংশভাগী?

ঠিক যেন কানের কাছেই কি একটা পাখী সেই মুহূর্তে ডাকিয়া উঠিল : কুপ—কুপ—কুপ।

ঘরে আসিয়া আধপোড়া একটা মোম পাইল শ্রীমন্ত হাতের কাছে। তাহাই জ্বালিয়া নিয়া চারিপাশ একবার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া নিল। তারপর অলস-শয্যায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিল রাত্রির মতো।

শ্রীমন্তের পলাতক মনে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আজও যে-ভয় প্রতিমুহূর্ত্তে বাসা বাঁধিয়া আছে, আসলে অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে অনুরূপ কোনো আশঙ্কিত ঘটনা বারোখাদায় ঘটে নাই। প্রতিদিন ষ্টেশন ঘরে ঘুমাইবার ব্যবস্থা বটে ছট্টু মান্নার, কিন্তু ঘটনার দিন অন্য কাজে তাহাকে সদরে যাইতে হয়, ফেরে পরদিন সকালে। পোড়া অঙ্গারখণ্ডগুলিতে তখনও অগ্নিশিখা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

ছট্টু মান্না ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আতঙ্কে শুধু মাথায় হাত দিয়া বসিল না, ভগবানের অসীম করুণায় যে-মৃত্যুর মুখ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার জন্যও তুরু-তুরু বক্ষে মনে মনে সহস্রকোটি প্রণতি জানাইল পরম বিধাতার উদ্দেশ্যে। কৈলাস চক্রবর্ত্তীকে কাছে পাইয়া কহিল, "যদি সদর থেকে ডাক না আস্‌তো, তবে যে শুধু নিজে ম'রতাম—তা নয়, সাথে সাথে প্রকাণ্ড সংসারটাও আমার না খেয়ে ম'রতে ব'সতো।"

দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন ছট্টু মান্নার। সংসারে বিধবা মা, ছোট ছোট দুই ভাই ও বিবাহযোগ্যা এক বোন ক্ষেন্তি। বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত ক্ষেন্তির বিবাহ দিয়া

উঠিতে পারে নাই ছট্টু। সংসারে উপার্জ্জনশীল একমাত্র সে নিজে, তাহার মৃত্যু যে আজ এই বিরাট সংসারেরই মৃত্যু!

কৈলাস চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "ভগবান যদি রক্ষা করেন, তবে কি কারুর সাধ্যি আছে মারবার! কিন্তু তুমিও এই জেনে রাখো ছট্টু, যে সব গুণ্ডা এম্‌নি ক'রে শুধু আমাদের এই রেল-কোম্পানীরই নয়, খাস সরকারী দপ্তরের পর্য্যন্ত ক্ষতি ক'রলো, তাদের আমরা সহজে রেহাই দেবো না। আজ বিষয়টা গ্রামে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে, এই গুণ্ডামীর প্রধান পাণ্ডা ঐ মথুর ছোঁড়া ভিন্ন আর কেউ নয়। এখন ভাবচি, মিটিং-এর জন্যে সেদিন এদের জায়গা ছেড়ে না দিয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজটাই ক'রেছিলাম!"

কিন্তু কথাটায় যেন বড় বেশী সায় দিতে পারিল না ছট্টু মান্না। কিছুক্ষণ থামিয়া স্বর কতকটা দ্রুত-লয়ে টানিয়া কহিল, "যদি ওনাদের দিয়েই সত্যি সন্দেহ ক'রে থাকেন, তবে আমার মনে হয় কি বাবু, মিটিং-এর সম্মতি সেদিন দেওয়াই উচিত ছিল আপনার। জাত-গোক্ষুর যারা, তাদের কি বেশী ঘাটাতে গিয়ে কোনো লাভ আছে?"

কথাটা আদৌ মনঃপুত হইল না কৈলাস চক্রবর্ত্তীর। কহিলেন, "আঃ—ঘাব্‌ড়াও কেন ছট্টু, লাভটা এবারে কতদূর গিয়ে দাঁড়ায় দেখ না? সদরে খবর গেছে কাল রাত্রেই, এতক্ষণে কি কিছু আর একটা 'ফোন' না গেছে ক'লকাতায়! সেখানেও শুন্‌ছি তুমুল গোলযোগ; ট্রাম পুড়িয়ে ছাই-ছাই

ক'রে দিচ্ছে, টেলিগ্রামের তার কেটে দিচ্ছে, হাওড়ায় নাকি দু'দিন ধ'রে গাড়ী এসেই ভিড়ছে না! তা' হোক্, কিন্তু এ বৃটিশ রাজত্ব, সূর্য্য অস্ত যায় না; গুণ্ডারা কি পালিয়ে রেহাই পাবে, ভেবেছ?"

ছট্টু মান্না সহসা কিছু একটা আর উত্তর করিল না।

হঠাৎ দূর হইতে ট্রেণের হুইসেলের শব্দ শোনা গেল। ফোরম্যান যথানিয়মে যাইয়া তাহার কাজ সমাধা করিল। মুহূর্ত্তে একটা শব্দ হইল—হিস্-স্-স্…ঘট্ ঘটাং। সিগ্‌ন্যাল ডাউন পড়িল। কিন্তু ট্রেণ আসিয়া প্রতিদিনের মতো আজ আর ষ্টেশনে থামিল না। সকালের ট্রেণ। দুই একজন আপিস-বাবু ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া সদরের আদালতে যাইয়া কাজ করেন। ষ্টেশনে আসিয়া কঠিন আশঙ্কায় কালো মুখে তাঁহারা আবার ঘরে ফিরিলেন।—সম্ভবতঃ অতি প্রত্যূষেই তবে সদর হইতে কলিকাতায় 'ফোন' গিয়াছিল।—দ্রুতগতিতে ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। ড্রাইভার শুধু একবার হাতের ইসারা করিয়া গেল মাত্র।

কৈলাস চক্রবর্ত্তীর মনে হইল, ইস্পাতের লাইনের উপর দিয়া নয়, ট্রেণ যেন আজ তাঁহার বুকের পাঁজরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কহিলেন, "শুন্‌লে হয়ত গুণ্ডারা আক্রমণ ক'রবে ছট্টু, কিন্তু সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, সরকার যে কিছু একটা মিথ্যে প্রচার ক'রেছেন, তা' নয়; স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য, কিন্তু দেশশুদ্ধ এইসব গুণ্ডামী সত্যিই কি কেউ বরদাস্ত ক'রতে

পারে? ষ্টেশন পুড়ে গেল, ট্রেণ থামল' না, অসুবিধেটা তো এখানকার স্থানীয় লোকেরই; কিন্তু এতবড় ননসেন্স ফুলিস যে, এই সুবিধে অসুবিধের কথাটুকুও তারা ভেবে দেখলো না।"

ছট্টু মান্না কহিল, "সাপ যখন কামড়ায় বাবু, তখন কি সে আর ভেবে দেখে যে, তার দংশন-বিষে লোক মরে' যাবে! ব'ললাম না, ও-সব লোক হ'চ্ছেন গিয়ে ঐ সাপের জাত, একেবারে জ্যান্ত গোক্ষুর বাবু, ভাবাভাবির মধ্যে কি আর ওনারা আছেন!" তারপর থামিয়া কহিল, "তা না হয় গেল, এখন এখেনকার কি ব্যবস্থা ক'রবেন, কিছু স্থির ক'রেছেন তো মাষ্টারবাবু?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল ছট্টু মান্না কৈলাস চক্রবর্ত্তীর মুখের পানে।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তী, পরে কহিলেন, "আগে সদর থেকে এস. ডি. ও সাহেব আসুন, দেখে শুনে জেরাপত্তর ক'রে যান, তারপর যা-হয় ক'রবো। রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সর্কুলারও মনে করি এসে যাবে দেখতে দেখতে।"

এদিকে গোয়ালন্দ হইতে ট্রেণ বোঝাই হইয়া তখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট বর্ম্মা-ইভ্যাকুই কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। বিভিন্ন রিলিফ-ক্যাম্পের পানীয় জল বিতরণের ছোট ছোট কাজ চলিয়াছে ষ্টেশনে ষ্টেশনে। আগে এই ষ্টেশনেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, যাত্রীরা সংখ্যায় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া সম্প্রতি কয়েকদিন হইল মাত্র বন্ধ হইয়াছে। ধীরে ধীরে মন্থর

গতিতে ইভ্যাকুইদের একখানি স্পেশাল গাড়ী সাম্‌নে দিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্ম প্রায় জাপানীদের সম্পূর্ণ দখলে। এইসব যাত্রীরা এতদিন হয়ত আকিয়াবের জঙ্গল-পথে, চট্টগ্রামে আর ফেণীতে দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া ছিল। সর্ব্বশেষ জল পাইয়াছে হয়ত আজ তাহারা আগের ষ্টেশন শিবরামপুরে; আবার সাম্‌নে যাইয়া হেড্‌কোয়ার্টার্স রাজ-বাড়ীতে জল আর খাবার। এখান হইতে আজ যেন সত্যিই জল একেবারে সরিয়া গিয়াছে, নইলে এতক্ষণেও জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি একেবার নিঃশেষে নিভিয়া যাইবে না কেন?

ছট্টু মান্না কহিল, "আমি তা হ'লে এখন একবার বাড়ীমুখো যাই বাবু। সওদা-পত্তর কিছু না ক'রলে ওদিকে আবার উপোষে কাটবে সবার।" তারপর মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া কহিল, "এস্. ডি. ও সাহেব যখন আস্‌বেন ব'ল্‌ছেন, তখন বিধি-ব্যবস্থা যা হোক্ কিছু একটা ক'রে আদালতে গিয়ে দেন কয়েক নম্বর ঠুকে! এমন ক'রে সত্যিই বা ক'দিন আর ষ্টেশন ছাড়া বারোখাদা চ'ল্‌বে!"

কৈলাস চক্রবর্ত্তী কথা না বলিয়া নীরবে একবার মাথা ঝাঁকিলেন মাত্র।

ছট্টু মান্নাও আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরিল। নিজের হাতে বাজার করিবে, তবে বাসায় তাহার উনুনে রান্না চড়িবে।…

সৌদামিনী ততক্ষণে উনুনে ভাত চড়াইয়া দুই জানুতে খুলিয়া বসিয়াছে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'। বাবা মারা গিয়াছেন বেশী দিন নয়, এই তো সবে কিছুদিনের কথা। রাজেন্দ্র সরকার : চমৎকার আত্মভোলা লোক ছিলেন তিনি। মারা যাইবার পূর্ব্বে তিনিই যেন কোথা হইতে বইখানি আনিয়া দিয়াছিলেন সৌদামিনীকে, বলিয়াছিলেন, 'প'ড়ে যদি আমাকে অর্থ ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারিস, তবে বুঝবো—হ্যাঁ, মায়ের আমার সত্যিই জ্ঞান হ'য়েছে বটে।' কিন্তু বাবা জীবিত থাকিতে তেমন কিছু একটা সত্যিই জ্ঞানের পরিচয় দিয়া উঠিতে পারে নাই সৌদামিনী। আজ যতই পড়িতেছে, ততই যেন পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে অর্থগুলি; মন যেন বাসা খুঁজিয়া বেড়ায় কথা-গুলির মধ্যে :

…'নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয়, এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে, ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্ব্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্ত্তি। নানা বাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েছে, সাজে সজ্জায় চালে চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্ত দেশে রসলোকের অধিবাসিনী ক'রে দাঁড় করিয়েছে।… সেবা হোলো হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে-রাস্তায় চ'লবে, সেই রাস্তাটাকে স্পষ্ট ক'রে নিরীক্ষণ ক'রবার জন্যে পুরুষ তার চোখ দুটো খুলে রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে—দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা

টেনে দিয়ে ব'লেছে—চোখ দিয়ে বাইরের জিনিষ দেখা যায়, এইটেই চরম কথা নয়, চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিষ আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।...'

নিজেকে তিলে তিলে সেই পরম সত্যের সমুখে নিয়া দাঁড় করাইতে সৌদামিনীই কি কম সাধনা ব্যয় করিয়াছে! বাবার কাছে সেদিন উত্তর না দিতে পারায় এতটুকুও লজ্জা ছিল না, কিন্তু আজও যদি সে নারীত্বের সেই পরমতম শ্রীসম্পদে নিজেকে ভরিয়া লইতে না পারে, তবে তার মতো কি আর কিছু বড় ধিক্কার আছে জীবনে? কিন্তু তাহার চাইতেও বড় ধিক্কার আছে দেশের এই শাসন-ব্যবস্থায়।—গ্রাম ছাড়িবার আগে মথুর দত্ত তাহার ভবিষ্যৎ স্থিতি সম্পর্কে একটুকুও ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই তাহাকে। তবু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হইতে সৌদামিনী এই কথাটা স্পষ্টই মনে জানিয়া রাখিয়াছে, পুলিশের হাতে সহজে ধরা দিবার লোক নয় মথুর দত্ত; এমন কোনো নিভৃত অঞ্চলে সে নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে—যেখানে 'ভারত রক্ষা আইন' পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহাদের এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতেই হইবে; যে দারুণ নির্য্যাতনে প্রতি-মুহূর্ত্তে আজ সমস্তটা দেশ মৃত্যুপাণ্ডুর-বেশে রুদ্ধশ্বাসে ধুকিতেছে, সেই দারুণ শৃঙ্খলকে নাড়া দিয়া ভাঙ্গিতে হইবে। তবেই তো তাহাদের এই ব্রত সার্থক। ক্রর-ক্রর শব্দে পাতাগুলি উল্টাইয়া চলিল সৌদামিনী, তারপর আবার দ্রুত দৃষ্টিবিক্ষেপে পড়িয়া চলিল:

…'ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে, ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য। কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে-দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তারপর দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী মড়কে যার কড়ে' আঙ্গুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাস-ক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্ত্তৃপক্ষ কড়া আইন পাশ করেন, তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে, বলে, 'এই তো পাকা চালে ভারত শাসন।' —এইটেই স্বাভাবিক। কেন না, ঐ ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনাফার ওপারে বাংলাদেশ আড়াল প'ড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলা দেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড় রাস্তা আছে, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধির বড় দাবী বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশী—এ-কথা জান্‌বার ও ভাব্‌বার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনি দেখে—

দরোয়ানীর ব্যবস্থা কঠোর করা হ'চ্ছে, তখনি মুনাফাবৎসলেরা পুলকিত হ'য়ে ওঠে। Law and order-রক্ষা হ'চ্ছে দরোয়ানী-তন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; Sympathy and Respect হ'চ্ছে ধর্ম্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।—যদি শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি চাও না দেশে Law and order থাকে', আমি বলি, 'খুবই চাই, কিন্তু Life and mind তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।' মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাট-খারা চাপানো দোষের নয়, অন্য পাল্লাটাতে যে মাল চাপানো হয়, তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি, এ-পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইটপাথর, আর মালের পনেরো আনাই হোলো অন্যপক্ষের দিকে, তখন ফৌজে পুলিশে গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড ব'লেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিশের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের ঐ ওজনের বিরুদ্ধে ; নালিশ, আগুন জ্বলে ব'লে নয়, রান্না চড়ানো হয় না ব'লে। বিশেষতঃ এই আগুনের বিল যখন আমাদেরই চোকাতে হয়।...'

ভাত ফুটিয়া ওদিকে ফ্যান গড়াইয়া পড়িতেছে ডেক্‌চি বাহিয়া। সৌদামিনীর সেদিকে লক্ষ্য নাই। ভাব্‌সা গন্ধে শোবার ঘর হইতে পিসীমা গলা উচাইয়া কহিলেন, "ভাত কি পুড়ে গেল নাকি মিনি ?"

সৌদামিনীকে পিসীমা সংক্ষেপ করিয়া মিনি বলিয়া ডাকেন। সংসার হইতে মা-বাবা চক্ষু বুঁজিয়া চলিয়া যাইবার

পর এই পিসীমার হাতেই সৌদামিনীর ভার পড়ে। বিধবা বৃদ্ধা, যতক্ষণ পারেন, মালা জপ করিয়া কাটান। ঠাট্টা-তামাসা রাগ-অভিমান তাঁহার যাহা কিছু আজ সৌদামিনীকে কেন্দ্র করিয়াই। মথুর দত্ত গ্রামে থাকিতে পিসীমাকে মাঝে মাঝে এ-কথায় সে-কথায় রীতিমত নাচাইয়া তুলিত। আজ পিসীমারও যে মাঝে মাঝে মথুর দত্তের কথা মনে না পড়ে, এমন নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া তেমন কিছু একটা সন্তোষ-জনক উত্তর পান না সৌদামিনীর কাছে। ভোরে সেই অন্ধকার থাকিতে চিরদিন উঠিবার অভ্যাস পিসীমার। আজও উঠিয়া বাহিরে কোথা হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মথুরের তো খোঁজ পাওয়াই যাচ্ছে না ; মথুরের ঠাকুরমা যে-ভাবে অনবরত কেবল চোখের জল ফেলছেন, তা দেখে যে ঠিক থাকা যায় না মিনি !" উত্তরে সৌদামিনী বলিয়াছিল, "তাই বুঝি দেখে এলে ? তবু তাঁকে আজ চোখের জল ফেলতে দাও পিসীমা, দেশের সবাই আজ এম্‌নি ক'রেই চোখের জল ফেলছে ; কিন্তু এ ব্যর্থ যাবে না, স্থির জেনো। যেদিন এম্‌নি ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে সাগর ভেসে যাবে, সেদিন দেশের এই দাসত্ব-শৃঙ্খলও তারই অতলে ডুবে যাবে পিসীমা। সেদিন আবার ফিরে পাবো আমরা সবাইকে।"—সেকেলে লোক পিসীমা, কথাগুলি সোজা বলিয়া মনে হয় নাই তাঁহার কাছে, তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপ করিয়া আবার একদিকে হাঁটিয়া গিয়াছেন।

এবারে উত্তর না পাইয়া পুনরায় স্বর তুলিলেন পিসীমা ঃ “বলি অ মিনি, একবার হাতা নেড়ে দেখ না, এরপর যে ভাত আর মুখে নিতে পারবি নে ?”

বইয়ের পাতা হইতে সহসা এবারে চোখ তুলিল সৌদামিনী ঃ “কেন, কি হ'লো গো, এই তো দিব্যি ভাত ফুটছে।” বলিয়া ডেক্‌চির ঢাক্‌নিটা তুলিয়া নামাইয়া নিল সৌদামিনী।

বেলা তখন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।

পাশ দিয়া পথ-যাত্রীদের যাতায়াতের ছোট্ট রাস্তা। হঠাৎ কানে আসিল—বাজার ফির্‌তি কাহারা যেন লঘু-গুরু স্বরে কী সব বলিতে বলিতে যাইতেছে।—

প্রথম ব্যক্তি কহিল, “হেস্তনেস্ত যা-হোক একটা কিছু আজকেই তবে হ'য়ে যাবে, না কি বলো ?”

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, “হয়ে যাওয়াই ভালো, এস. ডি. ও সাহেব এসে প'ড়লেই রক্ষা। রেল কোম্পানীর কি কম ক্ষতিটা হ'লো ! এক টিকিটই পুড়েছে নাকি দেড় হাজার টাকার। তা ছাড়া খাস সরকারের ক্ষতি—”

পোড়া কাঠে জল ঢালার মতই সহসা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল যেন সৌদামিনীর বুকখানি। যদি তেমন কিছু হয়, তবে তো শেষ পর্য্যন্ত খানাতল্লাসী করিয়া ও-বাড়ীর ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়া আবার হাজতে হাজির করিবে না পুলিশ ?

আশঙ্কা মিথ্যা নয়। ধীরে ধীরে সকাল গড়াইয়া গেল। দুপুরে আসিয়া গ্রামে পৌঁছিলেন এস্. ডি. ও সাহেব। সঙ্গে আট দশ জন লাঠি-হাতে লাল-পাগড়িওয়ালা পুলিশ।

ভালোমন্দে মিশানো গ্রামের লোক। নানাজনের মুখে নানা কথা। সত্যি সত্যিই একসময় খানাতল্লাস হইল মথুর দত্তের বাড়ীতে। কিন্তু খড়-কুটোগাছটি ভিন্ন আর কিছু একটাও হাতে পাইল না পুলিশ। সাহেবি পোষাকে বাঙালী সাহেব এস্. ডি. ও ঃ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিলেন ঠাকুরমাকে। কিন্তু ঠাকুরমা কোনো প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর না দিয়া শুধু মাত্র বলিলেন, "আমাকে না ব'লে যে মথুর কোনোদিন একতিলও কোথাও পা বাড়ায় নি। দিতে পারো সাহেব আমার মথুরকে আবার আমার কাছে এনে?"

পুলিশের সন্দেহ হইল—বৃদ্ধার হয়ত মাথায় দোষ আছে! ঠাকুরমার কথায় কোনোরূপ কর্ণপাত না করিয়া এস্. ডি. ও সাহেব সাহেবি ভঙ্গীতেই একসময় গাত্রোত্থান ক'রলেন।

কিন্তু বাদ গেল যে সৌদামিনী, এমন নয়।

পুলিশের চোখ শকুনের চোখের চাইতেও শ্যেনতর। এক-সময় এস. ডি. ও সাহেব সদলবলে আসিয়া হানা দিলেন সৌদামিনীদের বাহিরের ঘরে। পিসীমা আড়ালে একবার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু নির্ভিক দৃঢ়-সঙ্কল্প সৌদামিনী। সাম্নে চৌকাঠে পা দিয়া কহিল, "কি দরকারে এসেছেন, বলুন?"

চকিতে সৌদামিনীর দিকে চাহিতে গিয়া এস্. ডি. ও সাহেব

প্রথমটা চোখ নামাইতে পারিলেন না, কাজের কথা বলিতে যাইয়া কেমন যেন কথা জড়াইয়া গেল। পরে পুলিশগুলির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন, "আপনি—মানে এ বাড়ীর—"

কথা শেষ হইল না। বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইয়া সৌদামিনী কহিল, "হ্যাঁ, এ বাড়ীর মালিক একরকম আমিই, যদি কিছু দরকার থাকে, নিঃশঙ্কোচে ব'লতে পারেন।"

"হ্যাট্‌স্ গুড্, নমস্কার।" হাত আর অন্ততঃ সৌজন্যের খাতিরেও কপাল পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকিল না। এস্. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "গ্রামের ওপরে কাল যে ব্যাপার ঘটে' গেল, সে সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে ?"

"আছে বৈ কি ?" তড়িৎকণ্ঠে সৌদামিনী জবাব দিল : "দেখলাম, রেল কোম্পানী আর সরকারী মহলের একটা মস্ত-বড় ক্ষতি হ'ল। যারা এ কাজ ক'রেছে, তাদের বুদ্ধিমান ব'লতে হবে, যাই বলুন। চিরকাল নিজেরা ক্ষয় হ'তে হ'তে কিছুটা যে অন্ততঃ ক্ষয়কারীদের ক্ষতি ক'রতে পেরেছে, এতে তাদের প্রশংসাই ক'রতে হয় বটে।" পাতলা ঠোঁটের কোণে একবার হাসি টানিল সৌদামিনী। হাসির মধ্যে যেন সে-ই চিরাচরিত বিদ্যুতাভা !

এস. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "কথা তা নয়। তবে সে যাই হোক, পার্‌ড্‌ন মি, দেখছি—আপনিও কিছু চরমপন্থী কম ন'ন। তা যাক। এ সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ ক'রেছি

এখানকার মথুর বাবুকে। সঙ্গে আরও দু'জন যাঁরা বিশেষভাবে জড়িত আছেন, তাঁদেরও খোঁজ আমরা পেয়েছি। এ সম্পর্কেই দু'একটি প্রশ্ন আপনাকে ক'রতে চাই।"

"করুন।" দৃঢ় দৃষ্টিতে দাঁড়াইল সৌদামিনী।

এস. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "মথুর বাবুর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের পরিচয় ?"

"ধরুন এই কিছুকালের।"

"তাঁর এই-জাতীয় মনোবৃত্তির প্রকাশ কোনোদিন কি আপনারা লক্ষ্য ক'রেছেন ?"

"ক'রেছি বৈ কি, তবে মনোবৃত্তি নয়, মনোসমৃদ্ধি। তিনি এত বেশী সরল স্বাভাবিক আর আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন যে, তাঁকে শুধু লক্ষ্য ক'রলে কম করা হ'তো ; ব'লতে হয়—তাঁকে আমরা উপলব্ধি ক'রতাম।"

"আই সি—" একটা ভারী নিঃশ্বাস টানিলেন এস. ডি. ও সাহেব। বলিলেন, "গ্রাম ছেড়েছেন তিনি অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই, এ তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনার আগে কাল কি একবারও এসেছেন তিনি আপনাদের এখানে ?"

সৌদামিনী কহিল, "শুধু কাল নয়, কিছুকাল ধ'রেই তিনি গ্রামে নেই, এই আমরা জানি। সুতরাং, কালকের ঘটনার মূলে তাঁকেই বা দায়ী ক'রতে পারেন কি ক'রে ?"

"সেটুকু না হয় আমাদের হাতেই রইল।" বাঁকা চোখে হাসিলেন একবার এস. ডি. ও সাহেব, তারপর পুনরায় একবার

নমস্কার করিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, "প্লিজ ডোণ্ট্ টেক্ মি আদার-ওয়াইজ, এবারে উঠি। অন্যায় ভাবে আপনাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলুম, ক্ষমা ক'রবেন।"

"সে কি? বাড়ীতে এলেন, চা না খেয়েই উঠবেন!" অদ্ভুতকণ্ঠে সহসা যেন সময়োপযোগী মতই কথাটা বলিয়া ফেলিল সৌদামিনী।

কিন্তু বোকা ন'ন্ এস্. ডি. ও সাহেব, আইন কষিয়া খান; কথাটার ব্যঙ্গাত্মক আঘাতটা এবারে তাঁহাকে বিঁধিল. কহিলেন, "থ্যাঙ্ক্স্।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "আপনার জেণ্ট্লিটি এ্যাড্মায়ারেব্ল্ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের আপনারা ভাবেন কি ব'ল্তে পারেন?"

সৌদামিনীর মধ্যে এতটুকুও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, কহিল, "ভাবি দু'টো জিনিষ; অতি-মানুষ অথবা ত্রাণকর্ত্তা, আল্টিমেটে গিয়ে দাঁড়ায় এক-বচনেই। অর্থাৎ সমাজের অস্পৃশ্য।"

মাথা অনেকটা যেন নিজে হইতেই নিচু দিকে ঝুঁকিয়া আসিল এস্. ডি. ও সাহেবের। আদালত-কক্ষে অফিসারত্বের সেই উদ্ধত শির যেন অনেকখানি ভারী মনে হইল। আইনজ্ঞ বিচারক প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না গ্রামের এই সাধারণ মেয়েটির কাছে।

থামিয়া সৌদামিনী কহিল, "দেশের লোক তো আপনারাও। আপনারাই কি চান না দেশ স্বাধীন হোক্! কতকাল এই

অচল সমাজ-ব্যবস্থাকে আরও ঘুণে কাটিয়ে শাসকদের আইন-দণ্ডটাকে কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে আরও পাকা ক'রে রাখবেন ? বাঙ্গালী হ'য়ে আজ এসেছেন আপনি বাঙ্গালীকেই এ্যারেষ্ট্ ক'রতে ? দেশের হৃদয় থেকে আপনারা আজ কত দূরে প'ড়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছেন ? সমাজের অস্পৃশ্য ভিন্ন আর কিছু কি সত্যিই ভাবতে পারি আপনাদের ?"

কিন্তু কথাগুলি যেন সৌদামিনী একরকম নিজের মনেই বলিয়া গেল। এস্. ডি. ও সাহেবের কাছে ইহা নিতান্ত প্রলাপ ভিন্ন কী ? ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি সামনের পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এতক্ষণে মুক্তভাবে একবার হাসিতে পারিল সৌদামিনী।

পিসীমা এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া সবই কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, আর নিজের মনেই মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। এবারে কাছে আসিয়া কহিলেন, "মথুরকেই ওরা তবে সন্দেহ ক'রলো ? আর তুইই বা কেমন লা ? অমন মরদ পুলিশ ব্যাটাদের সাম্‌নে তোরই বা অতো বাজে ব'ক্‌বার দরকার ছিল কি ?"

মৃদুকণ্ঠে সৌদামিনী কহিল, "দরকারটা যে কি, তা তোমাকে বোঝাবো কেমন ক'রে পিসীমা ? ইচ্ছে করে, নিজের গায়ের মাংস নিজেই ছিঁড়ে খাই। ওই ওরাই তো দেশটাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে রেখেছে ! ওরা যদি কাজে জবাব দিয়ে অন্ততঃ একটা দিনও দেশের প্রাণের মাটিতে এসে দাঁড়ায়, তবে কি

বিলেত থেকে রাতারাতি সাহেবেরা এসে আইন চালাতে পারে! একদিনে এ-দেশ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে চ'লে আসে।"

পিসীমা এবারে যেন রীতিমত হিম্‌সিম্ খাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তবে তুই ব'সে ব'সে এই সবই কর বাপু, আমি আর তোকে নিয়ে পারি না।"

পরদিন খবর বাহির হইল, ধরা পড়িয়াছে হারান ঘটক আর হরেন চাকী। ফেরারী আসামী হিসাবে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স জারী হইয়াছে মথুর দত্তের নামে।

বৃদ্ধা ঠাকুরমা মথুর দত্তের; অতো কিছু বোঝেনও না, চোখেও ভাল দেখিতে পান না। সৌদামিনীকে কাছে পাইয়া একসময় কহিলেন, "হ্যাঁ রে, ওরা সব বলে কি?"

মথুর দত্তের সম্পর্কে তাঁহার ঠাকুরমাকে সৌদামিনীও ঠাকুরমা বলিয়াই ডাকে। কহিল, "ও কিছু নয়, পুলিশে সন্দেহ ক'রেছে, তাই। সাধ্য কি তাদের তোমার নাতিকে ধ'রবে ঠাকুরমা?"

"তাই বল্ ভাই, তাই বল্।" ঠাকুরমা কহিলেন, "খালি বাড়ীতে মথুর ছাড়া আমিই বা থাকবো কেমন ক'রে? একটি দিনও কি ওকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পেরেছি?"

"পারবে ঠাকুরমা, খুব পারবে।" ঠাট্টা করিয়া সৌদামিনী কহিল, "কত্তাটিকে একবেলা না দেখেই এই অবস্থা তোমার, এরপর ভাবচি, তেমন কেউ যদি সতীন জোটে, তবে তুমি কি ক'রবে!" তারপর কিছুটা থামিয়া চোখে-মুখে অস্বাভাবিক

একরকমের দৃশ্য টানিয়া কহিল, "তোমার কত্তাকে কিন্তু আমি একটা নাম দিয়েছি ঠাকুরমা, চ'টবে না তো তুমি ?"

অতি-দুঃখেও এবারে ঈষৎ হাসির আভা দেখা গেল ঠাকুরমার দন্তহীন লোলচর্ম্মাবৃত ঠোঁটে। কহিলেন, "কি নাম দিয়েছিস্ রে ?"

কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে সৌদামিনী কহিল, "শ্রীমন্ত।" তারপর আর একমুহূর্ত্তও সেখানে দেরী না করিয়া কোথায় একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।…

* * *

ভাগ্যের কথা, দীর্ঘ রাত্রি অবধি আলোচনা করিয়া বিমলা দেবীর এতটুকুও বায়ু চড়িতে দেখা গেল না ; শুইয়া পড়িয়াই তিনি নাক ডাকাইতে সুরু করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্তের কেন যেন বড় তাড়াতাড়ি ঘুম আসিল না। মাথার তেলোটা তাহারই হয়ত তবে কিছুটা তাতিয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে বিশ্রী একটা অস্বস্তিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুধু এপাশ-ওপাশ করিল। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি চারিপাশের বেড়াগুলির মতো এই দীর্ঘ বৎসরগুলির নানা কথা নানা ঘটনা অনবরত আসিয়া যেন তাহার স্মৃতির দুয়ারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল একবার সদানন্দ বৈরাগীকে : তালমাহাটের সেই সদানন্দ বৈরাগী। দীর্ঘ, ঋজু, প্রশান্ত—

ছয় ফুট লম্বা চেহারা, বুনোট্ চাটাই আর দরমায় ঘেরা আখড়াখানিকে রীতিমত তৎগত শ্রীরূপের আশ্রম করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর-পূব মাথায় ট্যাক্সি আর পায়ে হাঁটা পথে সদরের পথ-বরাবর প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী পরিবারদের খাস তালুক। প্রতি আষাঢ়ে রথের মেলায় এখানে উৎসবের অন্ত থাকে না। জোড়াতালি দেওয়া জীর্ণ কাঠের রথ-খানিকে ঘষিয়া মাজিয়া নতুন করিয়া প্রতিবৎসর জগন্নাথ ঠাকুরের পুষ্পাঞ্জলিতে সুরকির পথে টানিয়া আনেন চৌধুরীরা। এম্‌নিতরই এক রথোৎসবের দিনে একসময় পল্লীকবির কণ্ঠে বস্তুকাব্যের স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম—

চৌধুরীদের রথ।
ডান দিকে তার ধূলায় ধূসর তালমাহাটের পথ।

সেই তালমাহাট। নিয়মিত সপ্তাহে হাট বসে প্রকাণ্ড; গৃহস্থ, আধা-গৃহস্থ, বারুজীবী, তন্তুবায় আর জেলেদের লইয়া গ্রাম; আর আছে খামারের চাষীরা। সন্ধ্যায় সদানন্দের আখড়া সরগরম হইয়া ওঠে। জাতি বিচারের বালাই নাই। জব্বর সেখ হুকার মুখে ঠোঁট ভিজাইয়া দিলেও নির্ব্বিবাদে কল্কিতে ফুঁ দিয়া আবার ঠোঁট লাগায় চন্দর বিশ্বাস। তারপর কিছুক্ষণ চলে কথকতা, তারপর অধিক রাত্রি অবধি নাম-কীর্ত্তন। সারাদিন মাঠের বুকে কাস্তে চালাইয়া চাষীরা খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আসিয়া

এইখানে। বলে, “মক্কায় তো আর জীবনে যেতি পারলাম না, পুণ্যটা তোমার এখানেই ক’রে নিলাম বৈরাগী ভাই।”

শুনিয়া নিজের মধ্যেই সদানন্দ গদগদ হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর তর্জ্জনী-স্পর্শে একতারায় সুর তুলিয়া মুদিত চক্ষে গান ধরে—

পাপ পুণ্য সব ঝুটা—যদি গুরুর স্বরূপ জান্‌তে পাই,
ঘরে তাঁরে রেখে উপোষ বৃথাই মক্কা কাশী যাই।...

হুঁকার ধোঁয়ায় আনন্দোচ্ছল গতিতে নড়িয়া ওঠে চাষীরা। বলে, “ব্বঃ ভাই ব্বঃ, ক্ষিধা-তেষ্টা আর মনে রাখ্‌তি দেবা না, দেখছি।”

মৃদু হাসিয়া পুনরায় সুর করিয়া তাহার উত্তর দেয় সদানন্দ :

এ যে ক্ষুধা বিষম ক্ষুধা, মহাজ্ঞানীর আর কি পেশা!
পরমাত্মার ক্ষুধার কাছে কি ছার বলো ভাতের নেশা?
(আমি) সকল ক্ষুধা ভুলে এবার পরম খাদ্য তাঁরেই চাই।

তারপর লয়-তানের সঙ্গে পুনরায় গানের প্রথম চরণ আনিয়া যোগ দিয়া বলে—

পাপ পুণ্য সব ঝুটা—যদি গুরুর স্বরূপ জানতে পাই।

আপাতঃদৃষ্টিতে প্রথম প্রথম অনেকটা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল শ্রীমন্ত সদানন্দের সংস্পর্শ-লাভে। বেশ আছে লোকটি; শ্রীহরির নামে বেশ একটা সাম্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে আখ্‌ড়া-খানিতে। পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া শ্রীমন্তের নিজেরও একটা

গা ঢাকিবার আড্ডা বটে! কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হইতেই কেমন যেন আর ভাল লাগিল না। মনে হইল—সদানন্দ নিষ্ক্রিয়, আদর্শহীন তাহার ভিক্ষাবৃত্তির উপরে নির্ভরশীল এই আখ্‌ড়া। চাষী, তন্তুবায় আর জেলেদের হাত করিয়া অনায়াসে সে এখানে গড়িয়া তুলিতে পারে একটা নতুন গড়। আত্মরক্ষা আর স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে এ-কি কিছু একটা কম!

নাম-কীর্ত্তনের ফাঁকে নিরালায় একদিন শ্রীমন্ত কহিল, "আমার মনে হয়, এ নিতান্ত ভুল পথ তোমার বৈরাগী ভাই।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বহুক্ষণ সদানন্দ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শ্রীমন্তের মুখের পানে, তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, "দেখ্‌ছি, তোমার নতুন কথা ব'লবার ক্ষমতা আছে ভাই। আজ পূরো বারো বছর ধ'রে আমার এই সাধন-আখ্‌ড়ায় ব'সে নাম-কীর্ত্তন ক'রে চ'লেছি, কেউ এমন কথা কোনোদিন মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারে নি।"

"ব'লবার মতো এখানে কেউ লোক নেই, তাই।" শ্রীমন্ত কহিল, "ভগবানের এই সৃষ্টি-জগৎ, পরমব্রহ্ম—পরম শ্রী-সত্তা তিনিই; তাঁর নামে তোমাকে বাধা দেবে কে? কিন্তু কথা তা' নয় বৈরাগী ভাই। যখন দেখি, ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি-শালায় কুৎসিতের আর নর-খাদকের অভিনয় চ'লেছে, তখন হাতে আর একতারা নয়, দৃঢ় মুষ্টিতে কঠিন কুঠার উঁচিয়ে ধ'রবার দরকার। ভগবানের নামে তুমি কি আজ এমন শপথ

গ্রহণ ক'রতে পারো না—যাতে সেই কুৎসিতের অন্যায় অবি-চারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো ? এত তোমার ভক্ত র'য়েছে গ্রামে, তাদের মধ্যে তুমি এমন মন্ত্র রেখে যাও—যে মন্ত্রে মন শুধু সেই শ্রী-সত্তার পায়েই অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হবে না—তার সাথে সাথে দেশের এই ক্ষমাহীন অবিচারের বিরুদ্ধেও দৃঢ় শক্তিতে দাঁড়াবে !"

"কিসের ইঙ্গিত ক'রছো, বলো ?" বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিল সদানন্দ।

শ্রীমন্ত কহিল, "ইঙ্গিত আর কিছুর নয়, এই নির্বীর্য্য নির্য্যাতিত ভারতের গণ-জাগরণ আর সংগ্রামের !"

সদানন্দ কহিল, "তার রূপ কি বর্ণনা করো।"

ঈষৎ উষ্মার কণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "এ জেরার কথা নয়, বৈরাগী ভাই : নির্ব্বিবাদে গ্রামের একান্তে শ্রী-রূপের আধ্যাত্ম ভাবে ম'জে আছ, দেশের অবস্থা তো বড় একটা দেখ্‌তে পাও না ! পুড়ে পুড়ে দেশ যে শ্মশান হ'য়ে গেল !—"

মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিয়া সদানন্দ বলিল, "তাই তো নাম-কীর্ত্তনের দরকার। শ্রী-রূপের 'অমৃত' প্রচার না ক'রলে দেশ মৃত্যুঞ্জয় হবে কেমন ক'রে ?"

"আমিও তো তাই বলি বৈরাগী ভাই।" শ্রীমন্ত কহিল, "কিন্তু পন্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। দেশকে মৃত্যুঞ্জয় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে তোমার এই আত্মকেন্দ্রিক নীরব-পন্থায় সত্যিই

কিছু কাজ হ'তে পারে কি? একটু ব্যাপকতর হ'য়ে সার্ব্ব-কেন্দ্রিক রূপে খানিকটা স-রব হ'য়ে ওঠ দিকি!"

সদানন্দের মুখে কথা ফুটিল না। নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া একই অবস্থায় সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "শুনেছ তো মুকুন্দ দাসের নাম? লোকে হয়ত ব'ল্‌তো যাত্রাওয়ালা, কিন্তু কী দারুণ সিংহবিক্রমে যে তিনি ঐ যাত্রার ছদ্মবেশে দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে গিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ক'রে গেছেন জন-গণকে, তা ভাবতে গেলে আপনিই শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নত হ'য়ে আসে। কারা-বরণ ক'রেছেন তিনি দেশেরই জন্যে, কারণ দেশকে তিনি স্থান দিতে পেরেছিলেন সবার উপরে। এস না বৈরাগী ভাই, তোমার ঐ একতারা নিয়েই দলসুদ্ধ সবাই মিলে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এমন ক'রে বাজিয়ে যাই যে, মরা হাতে আবার যুব-হস্তী এসে ভর করে। কুড়ুল ধ'রতে না পারো, তোমার ঐ একতারাকেই আজ ক্ষুরধার কুড়ুল ক'রে নাও। ভগবানকে তাতে অস্বীকার করা হবে না, ভগবানের আদেশই বরং তাতে প্রতিপালিত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোই না হ'চ্ছে ভগবানের আদেশ! তাই যদি না পারলে, তবে যে তোমার নাম-কীর্ত্তনে কলঙ্ক থেকে যাবে, পুণ্য সঞ্চয় তো তাতে এক তিলও হবে না, বৈরাগী ভাই!"

এবারেও বহুক্ষণের মধ্যে কিছু একটা বলিতে পারিল না

সদানন্দ। মনে হইল, তাহার এই নির্ব্বিরোধ সুদীর্ঘ বারো বৎসরের জীবনে কোথায় যেন মুহূর্ত্তে একটা ঝড়ের আভাস দেখা দিয়াছে। জীবন-বৃক্ষের পাতাগুলি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। প্রতি রোমকূপে অজান্তে কেমন যেন একটা শিহরণ খেলিয়া গেল সদানন্দের। শ্রীমন্তের কথার কোনোরূপ জবাব না দিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উপরে নিচে কি লক্ষ্য করিল সদানন্দ, তারপর আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে আবার সুর ভাঁজিল :

কখন্ যে কোন্ ভাব-সাগরে অন্ধ চোখে ডুবে মরি,
কুলহারা এই অকুল গাঙে ভিড়াও তোমার সত্য-তরী,
ওগো দয়াল—দয়াল হরি।

রক্ষণশীল ধর্ম্মভীরু রক্তের ফেনায়িত মূর্চ্ছনা। দুই হাত যুক্ত করিয়া সহসা একবার ললাটে স্পর্শ করিল সদানন্দ। তাহার সাত পুরুষের পরম দয়ালের পায়ে যাইয়া সেই প্রণাম পৌঁছিল কিনা, বলা শক্ত। কিন্তু গান শুনিয়া শ্রীমন্ত এবারে মনে মনে বড় হাসিল, কহিল, "দয়ালের স্বরূপই যদি গাইবে বৈরাগী ভাই, তবে তা' এমন্ ক'রে নাড়ী-শৈথিল্য-ভাববাদিতায় নয়, গাও :

রক্তবীজ যে চুষে নিল'—দেশের দশের রক্ত দয়াল,
বাহুতে দাও শক্তি এবার—তুলে ধরি বিজয়-মশাল।
ভেঙে দিল অশিব শিবা—চিত্ত-সুরের যন্ত্রখানি,
শিখাও মন্ত্র—আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলি সকল গ্লানি।

রুদ্র তুমি সহায়—আমি ঝাঁপ দি' এবার বহ্নি-বানে,
কার দেশে হায় রাজত্ব কার—ঝালিয়ে দেখি গভীর প্রাণে।
সুর-যন্ত্রে যে আগুন জ্বলে—তাই কি আগে ছিল জানা!
মন্ত্র দে তুই—জ্বালিয়ে দি' এই ভৃত্যোচিত শাসন-মানা।"

সদানন্দ কহিল, "বড় কঠিন পথ ভাই, তৈরী হ'তে সময় লাগবে।"

প্রতিবাদের সুরে শ্রীমন্ত কহিল, "সময় নিয়ে যারা তৈরী হয়, তারা তৈরী হয় বটে, কিন্তু সময় আর থাকে না। তোমাকে তো লাঠি নিয়ে সাপ মার্তে ব'ল্ছি না; পায়ের সামনে সাপ প'ড়েছে, লোককে তা' শুধু দেখিয়ে দেওয়া। এস না, আজ-কেই খুলে দেই তেমন একটা যাত্রার দল। বেদীতে দাঁড়িয়ে গান গাইবে তুমি, আর পাঠ ব'ল্বো আমি।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া সদানন্দ কহিল, "কিন্তু আর-আর যন্ত্রপাতি, সাজ-পোষাক, টাকা—তারও তো জোগাড় দেখতে হবে!"...

তাহার পরের কথাগুলি যেন ভাসা-ভাসা হইয়া আসিল শ্রীমন্তের মনে। ঘড়ির কাঁটায় কয়টা বাজিল, ঠিক বোঝা গেল না। দূর হইতে এখনও সেই নিশাচর পাখীটার অতৃপ্ত নিনাদ ভাসিয়া আসিতেছে: কুপ—কুপ—কুপ। ধীরে ধীরে এক-সময় চোখের পাতা বুঁজিয়া আসিল শ্রীমন্তের।

সকালে আসিয়া বাহিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল মক্‌বুল আলী। তখনও ঘুমের জড়তা কাটে নাই। বেলা যে একেবারে কম হইয়াছিল, তাহা নয়। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলে প্রতিদিন ইহার বহুপূর্ব্বেই শ্রীমন্ত উঠিয়া চাষীপাড়ার দিকে চলিয়া যায়। বাহিরে সূর্য্যতাপের দিকে চাহিয়া আজ নিজের মধ্যেই কিছুটা সঙ্কোচ বোধ হইল শ্রীমন্তের। কহিল, "কি খবর মক্‌বুল ভাই, হঠাৎ—"

কথা শেষ করিতে হইল না। মক্‌বুল আলী কহিল, "এক্ষুনি একবার আপনার না গেলি নয়, রায়বাবু। মজীদ মিঞার অবস্থা বড় সাজ্যাতিক।"

"সে কি?" অবাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ একই দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আহতকণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "দক্ষিণ পারের মজীদ তো, কেন, কী হ'য়েছে তার?"

"এ-কথার আর কেন নেই রায়বাবু।" মক্‌বুল আলী কহিল, "আমাদের মতো মান্‌ষির যে কেমন ক'রে দিন চলে, আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে তা তো অজানা নেই! হাটকেষ্টপুরের ন'বাবুর জমিতে কাজ ক'রতো মজীদ। কর্ত্তা চক্ষু বুঁজে গেলেন চল্লিশ সনের ডিসিম্বর মাসে। গদিতে ব'স্‌লেন

তাঁর ছেলে এককড়ি বাবু। ব'ল্‌তি গেলে পাপ হয়, কিন্তু যেমন কড়া লোক তিনি, তেমনি অত্যাচারী। পোষাতে পারলো না তাঁর সাথে মজীদ। কাজ ছেড়ে দিয়ে বিঘে দু'এক জমি পত্তনি নিয়ে লাঙল ঠেল্‌লো। কিন্তু খোদার হিসেবে লেখা নেই, ঐ ক'রে পেট চ'ল্‌লো না। ঘরে একগুষ্টি ছেলে-মেয়ে : বউটা ক'দিন ধ'রে তেনা-কাপড় গিঁঠিয়ে গিঁঠিয়ে কোনো রকমে গায়ে চেপে আছে! এও কি ছাই জান্‌তি পারতাম্! কাল সন্ধ্যায় যেয়ে দেখি, মজীদ শ্বাস্ টান্‌তি আছে। শুধুলাম —'হ'য়েছে কি?'—কিন্তু রা ক'রলো না। ব'ললাম, 'ব্যাপার সব খুলে বলো, নইলে বুঝবো কেমন ক'রে?' ব'ললো, 'চাল নেই, দু'দিন ধ'রে কয়েক মুঠ্ পচা চিঁড়া চিবিয়ে আছি, কিন্তু পেটের অবস্থা যা—আর বাঁচ্‌বো না।' ব'ললাম, 'বউটারই বা এ-অবস্থা কেন?' শুনে অতি কষ্টেও একবার হেসে উঠ্‌লো মজীদ, ব'ল্‌লো, 'আজকাল তো আর দুনিয়ায় খোদার বিধান কিছু নেই ভাই, বিধান দিতিছেন সরকার। শাড়ী-কাপড় ঘরে থাক্‌লি তো প'রবে বউ! ঐ ন্যাক্‌ড়াটুকুই সম্বল।' শুনে আর কথা ব'ল্‌তি পার্‌লাম না। এলাম আপনার কাছে, এসে দেখি —ঘর বন্ধ। কিন্তু এখন না গেলি যে পরে যেয়ে আর মজীদকে দেখ্‌তি পাবেন না রায়বাবু! রাত থেকে বমি আর পাইখানা আরম্ভ হ'য়েছে। চীৎকার ক'রছে অনবরত পেটের যন্তরনায়!"

বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়া মুখে এবারে আর কথা ফুটিল না শ্রীমন্তের। বহুক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের মতো অপলক দৃষ্টিতে

মক্‌বুল আলীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটা অননুভূত বিক্ষুব্ধ বেদনায় সমস্ত হৃদয়খানি তাহার ভরিয়া গেল। প্রতিদিন সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে—পথে-প্রান্তরে, ঘরে-বাহিরে এখনও অশরীরী বেশে করাল ছুর্ভিক্ষ মহা বুভুক্ষার মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে। অন্নের দেশে অন্নপূর্ণা উপবাসে ক্লিষ্টা, আর তাঁর সন্তানেরা নিষ্পিষ্ট কঙ্কালসার। এই আজ এই সোনার বাংলার রূপ!

মক্‌বুল কহিল, "আর দেরী ক'রবেন না রায়বাবু।"

নিজের মধ্যে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া লইল শ্রীমন্ত; তারপর একরকম উঠিতে উঠিতেই কহিল, "না আর দেরী নয়, চলো।"

আসিয়া দেখিল, ইতিমধ্যেই একেবারে অসাড় নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে মজীদ মিঞা। বুকে মরা চামড়া ঠেলিয়া হাড় উঠিয়াছে, তাহারই নিচে মৃদু ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে হৃৎপিণ্ডটা। বাহিরের জগতের পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবার জন্য অনবরত যেন সংগ্রাম করিতেছে হাড়ের সঙ্গে। একবার শেষবারের মতো ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া তাকাইল মজীদ মিঞা; সেই অন্তিম দৃষ্টিতে কাহাকেও ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল কি না—বোঝা গেল না। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু একবার কহিল, "ছুনিয়ায় অন্যায়কারীদের কসুর তুমি কোনোদিন মাপ কোরো না খোদা।"—তারপরই চিরদিনের মতো কথা তাহার বন্ধ হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বেহেস্তে যাইবার আগে যেন

মুহূর্ত্তকালের জন্যেই একটু উপশম পাইয়াছিল মজীদ। এ-ই হয়ত মানব-জীবনের প্রাকৃতিক ধারা!

উচ্ছ্বসিত কান্নার চীৎকারে অছ্‌ড়াইয়া পড়িল মজীদের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েগুলি। বেদনায় দুঃখে শ্রীমন্ত আর মক্‌বুল আলীও স্থির থাকিতে পারিল না। সহসা অশ্রুভারে একবার চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল তাহার চোখ দুইটি। শ্রীমন্ত ভাবিল—নিঃসহায়, পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বাঙ্গালী এম্‌নি করিয়াই অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে দিনের পর দিন মরিতেছে। কর্তৃপক্ষের পাকা চালে ভারত-শাসন অব্যাহত গতিতে চলিতে পারিলেই হইল, ব্যস্‌; দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণার বালাই লইয়া মাথা ঘামাইবার বড় একটা প্রয়োজন কি!

খড়ের ছোট্ট ছাউনি। কান্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে ঘরখানি। মজীদের মৃত দেহটির দিকে কতক্ষণ যে নীরবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শ্রীমন্ত আর মক্‌বুল আলী, বলা শক্ত! এই নগ্ন শাসনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া ওই মৃতদেহটির মধ্য হইতেই আর একবার যেন মজীদ কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'দুনিয়ায় অন্যায়কারীদের কসুর তুমি কোনোদিন মাপ কোরো না খোদা।'—স্পষ্ট যেন এখনও মজীদের সেই কাতর স্বর শুনিতে পাইতেছে শ্রীমন্ত, অনবরত কেবল কানে বাজিতেছে কথাগুলি। মুক্তিপ্রয়াসী স্বাধীনচেতা ছিল মজীদ। একদিন তাই গোলামীর পরিবর্ত্তে নিজে স্বাধীনভাবে জমি পত্তনি নিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ ধরিয়াছিল সে। কিন্তু ভাগ্যকে

জয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বলিয়া দারিদ্র্য কি কিছু একটা অপরাধের? মাঝখানে দীর্ঘদিন মজীদকে কাছে পায় নাই শ্রীমন্ত। কেন পায় নাই, সে-কথা অবান্তর। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হইতেছে, তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে অন্ততঃ আর একটিবারও যদি শ্রীমন্ত তাহাকে কাছে পাইত, তবে তাহাকে বুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিত, "তোমার মধ্যে মুক্তির আগুন আছে মজীদ ভাই, তোমার মতো হাজার হাজার শহীদ পেলে আমি রাতারাতি এ-দেশকে স্বাধীন ক'রে ফেল্‌তে পারি। তুমি আমার অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ করো!"

সেই মুহূর্তে মনের এই প্রক্ষীপ্ত অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া আর একটি মৃত্যুনীল সময়ের কথাও বড় গভীর ভাবে মনে পড়িয়া গেল শ্রীমন্তের। এই মজীদেরই মতো আর একটি জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল সেদিন শ্রীমন্ত। ১৯৪৫-এর ১২ই নভেম্বর আজ। যে দুর্ভিক্ষ আজ পথেব ধুলি-কাদায় বীজাঙ্কুর মতো মিশিয়া আছে, সেই দুর্ভিক্ষের ভৈরব নৃত্য চলিয়াছিল সেদিন সমস্ত বাংলার বুকে। ১৯৪৩-এর সেই মন্বন্তর। পথে পথে এক ফোঁটা ফ্যান…এক মুঠো ভাতের জন্য মানুষের কাছে মানুষের কি বুকফাটা আবেদন। শ্মশানে শ্মশানে চিতার পর চিতা। বিপুলা এই বাংলার প্রাণসত্তা যেন সেই চিতাগর্ভে মিশিয়া যাইতে বসিল।

শ্রীমন্ত তখন অযোধ্যার চরে। নামে চর হইলেও আসলে

গ্রাম। একসময় প্রকাণ্ড লাঠিয়াল ছিল এখানে অযোধ্যা সর্দ্দার। লাঠির মুখে দুই-একশো লোকের দুর্ব্বৃত্ত জনতাকে সে অনায়াসে ফিরাইয়া দিতে পারিত। সেই সর্দ্দারের স্মৃতি-তীর্থ গ্রাম আজ এই অযোধ্যার চর। পাশাপাশি অনেকগুলি গৃহস্থবাড়ী। মাদার, বন-ঝাউ আর ডুমুর গাছে ঘেরা গ্রাম-খানি। মাঝখানে কালভার্টের মতো কাঠ আর সিমেণ্টে মিলাইয়া ছোট্ট পুল। এদিকটায় কিছু বনেদী পরিবার, ওদিকটায় কামার, কুমোর, তাঁতী, শীল আর কয়েকঘর রজক পরিবার। অযোধ্যা সর্দ্দার আজ আর না থাকিলেও তাহার নাতির ঘরের ছেলেপিলেরা এখনও পুলের ঐদিকটার সমাজে পাকা মোড়লী করে। সারা গ্রামে এক লক্ষ্মণ সিকদারের খোলা ঝাঁপের নিচে কেরোসিনের দোকান, আর সত্য দাসের মুদীখানা। এই মুদীখানায়ই প্রথম আসিয়া বিশ্রাম নেয় শ্রীমন্ত। কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়াছিল সত্যদাস। কী একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ আসিত দোকানে। সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "দেখি, দেখি!"

নতুন লোক, মার্জ্জিত দৃষ্টি। শ্রীমন্তের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া নীরবে তাহার দিকে কাগজখানি আগাইয়া দিল সত্য দাস।

নানা বিচিত্র ঘটনায় দুঃসহ…কণ্টকিত সংবাদগুলি।—দক্ষিণ পূর্ব্বের রণাঙ্গনে নতুন রণসজ্জা, সর্টল্যাণ্ড দ্বীপে মার্কিন জঙ্গী

বিমানের হানা, ভূমধ্য সাগরস্থিত ইতালীয় দ্বীপ দখল,—রুশ সীমান্তে জার্ম্মানীর প্রধান ঘাঁটি ব্রিয়েনস্কের দিকে রুশসৈন্যের ক্রম অগ্রগতি, রেনডোভাতে জাপ জঙ্গী বিমান অধিকার, চীনের সালাউইন নদীর তীরে জাপ সৈন্যের অভিযান, ব্রহ্মের স্থল ও জল পথে বোমাবর্ষণ।—কিন্তু আরও বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে সেই বোমা: আসাম, আকিয়াব, চট্টগ্রাম, মণিপুর—সর্ব্বত্র ভীতত্রস্ত জনতা। কলিকাতার প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠগুলির প্রতিটি ইঁট এখনও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কালো দাগ রাখিয়া গিয়াছে সেখানে জাপানীরা।

সত্য দাস কহিল, "মালপত্র ক'লকাতা থেকে শীগ্‌গির কিছু আস্‌বে তো এদিকে বাবু? দোকান যে বন্ধ ক'ববার অবস্থা হ'লো!"

শ্রীমন্ত কহিল, "ট্রেণ কমিয়ে দিয়েছে, মালগাড়ী বন্ধ; ছিল যা নৌকো সম্বল, তাও তো তোমরা রাখ্‌তে পারো নি, জাপানীদের ভয়ে সরকার লুটেপুটে নিল' নৌকোগুলো। মাল আস্‌বে কিসে বলো?"

মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল সত্য দাসের। কহিল, "তবে চালাবো কি ক'রে? না খেয়ে যে ম'রতে হবে।"

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ সিকদার মাটির খেড়ো হাতে কি একটা সওদা করিতে আসিয়া সত্য দাসের কথার পৃষ্ঠে কহিল, "তুমি তো ম'রবে, আর আমি তো ম'রেই গেছি ভাই। এক কৌটাও তেল নেই টিনে, সারা গাঁয়ের শিশি-বোতলগুলি এসে জ'মে

আছে ঘরে। আমি তো ম'রেইছি, দুর্ভোগ পোয়াবে এবার গাঁয়ের লোকও। দিতে পারো দু'-এক বোতল রেড়ি, পিদীম রাখ্‌তে পারি তবে ঘরে।"

শুনিয়া একবার কষ্টের হাসি হাসিল সত্য দাস, বলিল, "কুঁজো শোনে খোঁড়ার কথা। রেড়িই বা রাখতে পারলাম কই? দোকানে চাল নেই দু'মাস আগে থেকে, তারপর ফুরালো চিনি, আটা; এখন তো একেবারে নির্ব্বংশ হবার অবস্থা।"

ধীরে ধীরে ভাঁজ করিয়া রাখিল পত্রিকাখানি শ্রীমন্ত। সহসা একবার চোখে ভাসিয়া উঠিল তার নিজের গ্রামখানি—বারোখাদা। সেদিন বারোখাদায় সবেমাত্র দর বৃদ্ধির সূচনা দেখা গিয়াছিল চাউলের। আজ সেখানেও হয়ত চাউল একেবারেই উধাও।

অনুমানটা মিথ্যা নয়। সে-কথা পরে বলিব।

লক্ষ্মণ সিকদার কহিল, "ভঞ্জ বাবুদের বাড়ীতে সকালে কে একজন লোক এসেছেন ক'লকাতা থেকে। শুন্‌লাম—পথে আর ভিখেরী ধরে না সেখানে।"

শুনিয়া সত্য দাস একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল নিজের মধ্যে।

শ্রীমন্ত বলিল, "আজ আমরা সবাই ভিখিরী ভাই। শুধু ক'লকাতার খবরটাই ওই। তাড়াতাড়ি চোখে পড়ে ক'ল্‌কাতাকে, ভাই—। নইলে, যদি ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে

পারতে, তবে দেখ্‌তে—সারা বাংলাদেশের কোনো গ্রাম কোনো মহকুমা এই দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পায় নি। তাই বলি, খুব হুঁসিয়ার।"

কিন্তু হুঁসিয়ার হইয়াই বা কাহার কি করিবার ক্ষমতা আছে আজ? অলক্ষ্য হইতে রিপুশক্তি গলা টিপিয়া ধরিয়াছে সমস্ত দেশটার; শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু কি শক্তি আছে আজ! রৌদ্রতাপে কঠিন চরের মতো খাঁ খাঁ করিতেছে মাঠগুলি। ধানের বীজে গাছ গজায় না। এখানে ওখানে চুরি, ডাকাতি, ঘরে ঘরে রোগ।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। এতদিনে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিল মন্বন্তর এই গ্রামেও। অনবরত এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিল শ্রীমন্ত।

হঠাৎ একদিন ভরা দুপুরে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল বিশীর্ণ একটি কঙ্কালসার লোক। সাথে তার ততোধিক বিশীর্ণ একটি আধবুড়া গরু। কহিল, "বাবুগো, তোমাকে তো তেমন চিনি না, তবু আমাকে রক্ষা করো। গরুটা কিনে নিয়ে যা হয় ক'টা টাকা দাও। পেটের আর যে জ্বালা চেপে রাখ্‌তে পারি না।"

রীতিমত এবারে কান্না পাইল শ্রীমন্তের। কিছুক্ষণ মুদিত চক্ষে বসিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "টাকা নিয়েই বা তুমি ক'রবে কি? জিনিষ কোথায়? গাঁ থেকে সব যে উধাও!"

লোকটি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। শূন্য দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া দূর আকাশে একবার যেন কি লক্ষ্য করিল। তারপর কতকটা

অট্টহাসির মতই হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তবে—তবে পারো বাবু একটু বিষ দিতে, বিষ?"

"ছিঃ, জীবনটাকে এতও ছোট ভাবতে পারো?" শ্রীমন্ত আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিল না; কহিল, "এখানকার জমিদার ঐ ভঞ্জবাবুরাই তো?"

রুদ্ধশ্বাসে লোকটি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, গোলা ভর্ত্তি ওঁদের ধান। পাকা বাড়ীর ঐ পাকা দরজায় কেউ ঢুকতে পারে না।"

শ্রীমন্ত মুহূর্ত্তে যেন কেমন কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন একটিও লোক নেই, যে ঐ দরজায় যেয়ে একবারও লাথি মারতে পারে?"

হঠাৎ যেন দীপ্তালোকে চক্‌চক্ করিয়া উঠিল লোকটির চোখ দুইটি। বলিল, "আছে, আছে বাবু,—মহেন্দ্র সর্দ্দার। চিন্‌তে পারলে না? অযোধ্যা সর্দ্দারের বংশধর। তিন ভাই ওরা, ওরা ছাড়া গাঁয়ে আর তেজী লোক একটিও নেই।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর কহিল, "চলো তার ওখানেই যাবো।"

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। পথেই মহেন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল। কোনো রকম ভূমিকার অবতারণা না করিয়াই শ্রীমন্ত কহিল, "সারা গ্রামের লোক আজ একসাথে ম'রতে ব'সেছে, তোমরা কাউকে বাঁচাতে পারো না?"

মহেন্দ্র কহিল, "যে অবস্থা, তাতে কারুর মাথায় লাঠি মেরে

মাটির নিচে পুঁতে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু বাঁচাবো কেমন ক'রে সারা গ্রামটাকে ? সে ক্ষমতা তো দেব্‌তা দেন নি !"

"এতে কোনো খুন-খারাপির কথা আস্‌চে না, মহেন্দ্র।" শ্রীমন্ত বলিল, "যেখানে দেখতে পাচ্ছ, লোকের মুখে ভাত জুটছে না, শ্মশান হ'তে চ'লেছে গ্রামটা, সেখানে কেউ যদি একমাত্র নিজেদের সুবিধের জন্যেই মণের পর মণ ধান-চাল আটকে রাখে, প্রয়োজন সেখানে—বুঝিয়ে হোক্‌, জোর ক'রে হোক্‌ সেই ধান-চাল জনসমাজের মধ্যে এনে বেঁটে দেওয়া। যাব নামে এই গ্রামের পত্তন, সেই সর্দ্দারজীব শক্তি র'য়েছে তোমাদের মধ্যে, সেই শক্তিকে ভুল পথে না খাটিয়ে বুদ্ধির পথে খাটাও। প্রয়োজন হ'লে জমিদার বাড়ী—"

কথা শেষ না করিতে দিয়াই মহেন্দ্র বলিল, "বলুন জ্বালিয়ে দিই।"

বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "এ-রকম উত্তেজিত হ'লে চ'ল্‌বে না। আগে তাঁদের কাছে আবেদন জানাও গ্রামের পক্ষ থেকে। যদি ফল কিছু না ফলে, তখন যা হয় ভেবে দেখ্‌বে—কি ক'রবে।"

"বেশ, তাই তবে দেখছি।" বলিয়া আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া পিছনের পথ ধরিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া কোথায় আবার একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল মহেন্দ্র।

ধীরে ধীরে একসময় দুপুর গড়াইয়া বিকালের পর সারা

গ্রামের বুকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। এখানে-ওখানে ঝোপে-ঝাড়ে শৃগালের উচ্চ ডাক্, পথচারী কুকুরগুলির বিচিত্র স্বরে বিলাপ-কান্না। সারা গ্রামের বুকে জমাট কালো অন্ধকার। এক ফোঁটা তেল নাই গ্রামে। পথে দাঁড়াইয়া নিজেকেই ভাল করিয়া চেনা যায় না। দোকানের ঝাঁপে তালা আঁটিয়া সত্য দাস বিমর্ষ মুখে সাম্‌নের মাটিতে বসিয়া আছে; লক্ষ্মণ সিকদার ঝাঁপ খুলিয়াই ভাঙা একটা লম্বা কাঠের বাক্সের উপরে মাদুর বিছাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। দূর হইতে ভঞ্জ বাবুদের দ্বিতলের ঘরে তখন আলো দেখা যায়: কেরোসিনের নয়, গ্যাসের। সহরের সাথে লেন-দেন তাঁহাদের সব সময়ের। নতুন অতিথিকে লইয়া তাঁহারা তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। অলক্ষ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল শ্রীমন্ত। অন্ধকারের বুক ঠেলিয়া অনবরত সে সারা গ্রামটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট বাংলার সত্যকার রূপটি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ব্যথাকাতর দুই চোখে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

হঠাৎ একসময় সাম্‌নের পথে কোথায় আসিয়া দিক হারাইয়া ফেলিল শ্রীমন্ত। কাছেই জলার মতো কি একটা বোধ হইল। গ্রামের একেবারে নিবিড়তর শেষপ্রান্ত এটা। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই সহসা কোন্ একটি নারী-কণ্ঠের শব্দ শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতোই শিহরিয়া উঠিল শ্রীমন্ত।

আরও কতকটা কাছে আসিয়া শব্দ হইল: "শুনতে পাচ্ছেন ?"

"কে ?" থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল শ্রীমন্ত।

এবারে একেবারেই যেন কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল মহিলাটি। শ্রীমন্ত স্পষ্ট যেন তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস বোধ করিয়াই একরকম কিছুটা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মহিলাটিও আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল, কহিল, "শেয়াল-কুকুর বা ভূত-প্রেত নই যে, এই অন্ধকারেও হঠাৎ স্বরূপ দেখে ভয় পেয়ে যাবেন। অন্ধকারই তো আজ আমাদের জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ। দিনের বেলা সমাজ আছে, রাত্রে সে বালাই নেই। দেখতে পাচ্ছেন না, ভদ্র ঘরের একটু ছাপ আছে চেহারায়, কিন্তু সে পরিচয় দেবো না। শুধু একটু দয়া করুন, দারুণ অভাবের তাড়নায় আজ এই পথে এসে দাঁড়িয়েছি ; কোথা থেকে যে এসেছি—তা নাই বা শুনলেন। কে যেন আমাকে এই পথে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেও আর নেই। একেবারে নিঃস্ব এখন। আপনি তো ভদ্রলোক, আপনি কি পাবেন না আমাকে বাঁচাতে ?" অনবরত জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল মহিলাটি।

শ্রীমন্তের মনে হইল—পায়ের নিচে হইতে মাটি যেন অনন্ত পাতালে মিশিয়া যাইতেছে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একবার দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিল—সত্যিই যেন মহিলাটির সর্ব্বাঙ্গে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। সুন্দর সুশ্রী চেহারা।

কহিল, "কোথায় আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি বলুন? ঘরে ঘরে এখানে আজ মড়ক, তা ছাড়া নিজেরই যে আমার যায়গা নেই কোথাও। বরং আপনার বাড়ী কোথায় বলুন, চেষ্টা করি পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে।"

কিন্তু মহিলাটি সে-কথায় আদৌ কর্ণপাত করিল না। সহসা শ্রীমন্তের একখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মাথা গুঁজ্‌বার মতো একটা আস্তানা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাবার পথ নেই। এই পথেই আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচান আমাকে; যদি পারি, অন্ততঃ এতটুকুও প্রতিদান দিতে চেষ্টা ক'রবো।" কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ যেন কাঁপিয়া উঠিল মহিলাটির।

সাধক বিপ্লবী শ্রীমন্ত; কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল, "অভাবের দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেও জানেন দেখ্‌চি। প্রতিদানই যদি দিতে পারবেন, তবে আপনার তেমন নিঃস্বতাই বা কোথায়? কি প্রতিদান আপনি দিতে পারেন?"

"কেন, বিশ্বাস হয় না?" মহিলাটি একরকম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলিল, "সব চেয়ে বড় যে-বস্তু নারী দিতে পারে পুরুষকে, জীবনের বিনিময়ে সেই প্রতিদান কি এতই তুচ্ছ? এই দেহ, এটা কি কিছুই নয়?"—একরকম অতর্কিতেই মহিলাটি সহসা শ্রীমন্তের হাতখানি সজোরে টানিয়া আনিয়া নিজের অর্দ্ধ অনাবৃত বুকখানির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়, বিদ্যুৎগতিতেই একরকম নিজের হাতখানিকে সেই মুহূর্ত্তেই মুক্ত করিয়া নিয়া রাগে, দুঃখে, অবমাননায় শ্রীমন্ত নিজের মধ্যে রীতিমত জ্বলিয়া পুড়িতে লাগিল। কহিল, "ছিঃ, এই আপনার প্রতিদানের নমুনা, এই আপনার আভিজাত্যের ছাপ ? এত নীচ আপনি ?"—সমস্ত শরীরটা যেন অনবরত কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল শ্রীমন্তের।

কিন্তু মহিলাটি একটুকুও দমিল না ; কহিল, "দারিদ্র্য এম্‌নি ক'রেই মানুষকে নীচ করে। মানুষের কাছে আবেদন ক'রে যখন আশ্রয় মেলে না, তখন নারীর আর দ্বিতীয় পথ নেই এ ছাড়া। আপনার মধ্যে যে ব্রহ্মচারী ব্যক্তিটি আছেন, তাকে আমার নমস্কার।" বিচিত্র কায়দায় একবার কপালের দিকে যুক্ত হাত তুলিল মহিলাটি, তারপর পুনরায় কহিল, "কিন্তু জেনে রাখুন, এরপরও আশ্রয় আছে, সে ঐ জলার শীতল জল। সমস্ত নীচতা, পাপ ওতেই ধুয়ে নিতে পারবো।" ধীরে ধীরে কোথায় যেন অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল মহিলাটি।

বহুক্ষণের মধ্যে কিছু একটা যেন আর ভাবিয়া উঠিতে পারিলনা শ্রীমন্ত। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, মনে হইল—এই দুঃস্থ নিপীড়িত সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াইয়া আছে ? দিনে দিনে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সমাজের, আর সেই গুচ্ছ গুচ্ছ প্রাণপরিত্যক্ত হাড়ে চাষের সার প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া আর বৃটেনের খণ্ড খণ্ড কৃষি-প্রতিষ্ঠানে ;

…কিন্তু মহিলাটি? অন্ধকারের নিভৃতে তবে কি সত্যিই সে আত্মহত্যা করিবে? তার কি আর কোনো পথ ছিল না? আর কোনো পথ সত্যিই কি তবে নাই? এমন সব নারীকে উদ্দেশ করিয়াই তো মহাত্মাজী বলিয়াছেন: 'সংসারে সমাজে যাদের স্থান নেই, দুর্ব্বৃত্ত স্বামী আর অত্যাচারী মানুষের দ্বারা যে সব নারী লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত, তারা এস, হাতে তুলে নাও চরকা, নির্ভয়ে যোগ দাও সত্যাগ্রহে। কার সাধ্য তোমাদের নারীত্বকে ক'রতে পারে অবমাননা, ক'রতে পারে ক্ষুণ্ণ আর অমর্য্যাদা?'—এম্‌নিতর ভাগ্যের স্রোতেই যদি ভাসিয়া গিয়াছিল মহিলাটি, তবে—তবে সেও কি পারিত না এই গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে? আরও কিছুটা আগাইয়া গেল শ্রীমন্ত। কিন্তু মহিলাটির আর সন্ধান মিলিল না। জলার জলে তখনও প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। অন্ধকারে আদৌ কিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না। আকস্মিক কোনো কিছু একটা শব্দ শুনিবার আশঙ্কায় একবার সচেতন হইয়া দাঁড়াইল শ্রীমন্ত, তারপর একসময় আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে সেও কোথায় একদিকে মিশিয়া গেল।

ভোর হইতেই খবর আসিল—ভঞ্জ বাবুদের সাথে মহেন্দ্র সর্দ্দারের খুব একখণ্ড কুরুক্ষেত্র হইয়া গিয়াছে; ভঞ্জবাবুরা স্পষ্ট

নাকি বলিয়াছেন : "ভগবান মানুষকে মারবেন, তা—আমরা কি ক'রতে পারি? যে যার নিজের পথ দেখুক। কেউ কারুর জন্যে দুনিয়ায় অন্নসত্র খুলে ব'সে থাকে না।"

প্রত্যুত্তরে মহেন্দ্র সর্দ্দার জোর-গলায় বলিয়া আসিয়াছে, "ভগবানের দোহাই দিয়ে আপনারা পাপ ঢাক্‌বেন, আজ আর তা' হ'তে দেবো না। ঘর থেকে ধান বের করুন। সবাই মিলে একসাথে খেয়ে যে-ক'দিন বাঁচতে পারি বাঁচবো, আর নিদেন যদি প্রতিবাদ করেন, যদি গ্রামের লোক আজ আপনাদের ভুরিভোজনের সাম্‌নে না খেতে পেয়ে ম'রে যায়, তবে জান্‌বেন—ম'রতে আর আপনাদেরও বেশী বাকী নেই। এক বেলা মাত্র সময় দিচ্ছি, ভেবে কাজ ক'রবেন।"

শুনিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "সাবাস সর্দ্দার ভাই, সাবাস্! তুমিই ভাই পারবে তোমার এই গ্রামকে বাঁচাতে।" তারপর থামিয়া কহিল, "কিন্তু এ সময়ে আরও কাজ আছে। কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে আজই জনকয়েক লোক নিয়ে একবার সহর ঘুরে এস; ধানের পরিবর্ত্তে সরকার বরাদ্দ ক'রেছেন 'জোয়ার' আর 'বজ্‌রা'। যা পারো আর যে ক'রে হোক্ সংগ্রহ ক'রে ফিরবে।"

হাতের পেশীতে অনবদমিত শক্তি যেমন অপরিমেয়, মহেন্দ্র সর্দ্দারের হৃদয়-বৃত্তিও তেমনি অন্তঃসলিল···দুর্ব্বার। বিন্দুমাত্র আর দেরী না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে লোকজন সহ সহরের দিকে ছুটিল।

কিন্তু ফল যে খুব বেশী একটা কিছু ফলিল, এমন নয়। সহরেও হাহাকার উঠিয়াছে, দোকানে দোকানে সার-বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে জনতা ; কাহারও ভাগ্যে কিছু বা জুটিতেছে, কাহারও ভাগ্যে বা নয়।

রক্ষা পাইল না অযোধ্যার চর! ভঞ্জবাবুদের ধানের গোলা নিঃশেষ হইয়া গেল। কতক লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল, কতক তিলে তিলে ধুঁকিয়া মরিল। তারপর আসিল সংক্রামক ব্যাধি—ওলাউঠা। ঘরে ঘরে কান্না। ঘরে ঘরে মৃত্যু। শূন্য গৃহে কত স্বামীর মৃতদেহ বুকে জড়াইয়া পাথর হইয়া গেল কত আশ্রয়হীনা স্ত্রী, সন্তানকে হারাইয়া একা ঘরে বুক ভাঙ্গিল কত মা, কত স্বামী স্ত্রী-পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লুটিয়া অট্টহাসি হাসিল, তারপর কণ্ঠনালীতে নির্ব্বিবাদে পুরিয়া দিল তরল—উগ্র বিষ। এই মহামৃত্যু-যজ্ঞে সেদিনের সেই মহিলাটি কোথায় যে কবে কোন্ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, শ্রীমন্তও তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না। কিন্তু শক্তিব্যয়ে এতটুকুও কার্পণ্য করে নাই মহেন্দ্র সর্দ্দার। চিরদিনের মতো শ্রীমন্তের মনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল মহেন্দ্র সর্দ্দার। এদেরই উর্দ্ধতন পুরুষ হইবার উপযুক্ত বটে অযোধ্যা। তাহারই নামকরণে গ্রাম, সার্থক এই সর্দ্দার-বংশ।

মজীদ মিঞার মৃতদেহের সামনে অশ্রুকাতর দৃষ্টিতে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে যাইয়া এই মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের আজ আর একবার মনে পড়িল মহেন্দ্র সর্দ্দারকে। দুইজনের মধ্যেই শ্রীমন্ত খুঁজিয়া পাইয়াছে এক বিচিত্র বিদ্রোহীর সুর। বিপ্লবী-জীবনে দুই জনেই অনন্তকালের জন্য গাঁথা হইয়া রহিল শ্রীমন্তের মনে।

১৯৪৫-এর এই চলাপথ। এখনও মাটির প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি ধূলিকণা আর দুর্ব্বাদলে সেই মৃত জীবনগুলির শেষ নিঃশ্বাস মিশিয়া আছে। এখনও দারিদ্র্যে, বুভুক্ষায়, অনাহারে এম্‌নিতরই কত মজীদ নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। আর একটা ভাবী দুর্ভিক্ষেরই পূর্ব্বাভাস নয় কি? এখনও কি মানুষ বৈষম্যমূলক এই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা আর ভেদনীতিমূলক এই সরকারী দণ্ডনীতিকে একমাত্র ভগবানের বিধান মনে করিয়াই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে? প্রতিবাদের সুরে এখনও কি মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না?

পথে আসিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "এই দৃশ্য দেখাতেই কি তুমি আমাকে ডেকে এনেছিলে, মক্‌বুল ভাই?

"মুখ্যু লোক আমরা, রায়বাবু।" মক্‌বুল আলী কহিল, "গরীব চাষীদের দিকে মহাজনেরা তো কখনো ফিরে চান না। আপনি স্নেহ করেন, আশার কথা···বাঁচবার কথা—তা যে একমাত্র আপনার মুখেই শুনিছি। দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে আপনার কাছেই তো তাই এসে দাঁড়াই।" তারপর

থামিয়া পুনরায় বলিল, "আজ মনে হতিছে, দুর্ভিক্ষের বছর আপনাকে যদি কাছে পেতাম, তবে আমাদের আর এতটুকুও দুঃখ থাক্‌তো না। আজ মজীদ ম'রলো, এইরকম তিপান্ন জন ম'রেছে তৃতীয় সনে। সে-দিরিশ্য চোখে দেখার নয়, রায়বাবু।"

চরমুগরিয়ার বুকে সেই মৃত্যু-মহোৎসব দেখিবার মতো অবশ্য সুযোগ ও দুর্ভাগ্য হয় নাই বটে সেদিন শ্রীমন্তের, কিন্তু যে-দৃশ্য সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে সেদিন অযোধ্যার চরে, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া এখানকার অবস্থাটাও অনুমান করিয়া নিতে এতটুকুও বেগ পাইতে হইল না শ্রীমন্তের। যখন সে প্রথম এখানে আসিল, দেখিল—নতুন নিড়ানী আরম্ভ হইয়াছে, নতুন ঋতুতে মই পড়িয়াছে সবে মাঠে মাঠে। চেষ্টা করিয়া মিশিতে সুরু করিল শ্রীমন্ত চাষীদের সঙ্গে। নতুন পরিচয়ের মুখে প্রথমটা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকিল এই মক্‌বুল আলী—মজীদ মিঞার মতো সমস্ত চাষীরা, বলিল, "বেয়াদপী মাপ ক'রবেন কত্তা, এমন ক'রে যদি কাছে এলেন, কি ব'লে আপনাকে ডাকি, একবার মেহেরবাণী ক'রে ব'লে দিন। আমরা আপনার পায়ের নফর হ'য়ে থাকবো।" নামের আদি ভাগটা একরকম প্রয়োজনের খাতিরেই চাপিয়া গিয়া শ্রীমন্ত সেদিন বলিয়াছিল, "ইচ্ছে হ'লে আমাকে 'রায়বাবু' ব'লেই ডাকতে পারো। কিন্তু ডাকার প্রশ্ন পরে; আগে নিজেদের অধিকার বুঝতে শেখো, সমাজে আগে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করো।"

শুধু চাষীরা নয়, সেই হইতে পাট-গুদামের বাবুরা—এমন কি কুলীরা ইস্তক শ্রীমন্তকে বিশেষভাবে 'রায়বাবু' বলিয়াই চেনে, যত্ন করে, খাতির করে।

কথা শেষ করিয়া কিছু একটা জবাবের প্রত্যাশায় অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মক্‌বুল আলী শ্রীমন্তের মুখের পানে।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "তোমরা যে আমার কতখানি, সে কথা কি আজ আবার নতুন ক'রে ব'লতে হবে, মক্‌বুল ভাই ? আর দুর্ভিক্ষের কথা ব'লছো ? সেদিন যদি কাছে থাকতুম, তবু দুর্ভিক্ষের ফল ঠিক অম্‌নিই হ'তো। যারা ম'রেছে, তারা ম'রতোই। চেষ্টা তো ক'রেছিলাম অযোধ্যার চরেও, কিন্তু বৃথা। চোরাকারবারী, মহাজন, জমিদার আর সরকার—এঁরা সবাই মিলে একত্রে যদি ষড়যন্ত্র ক'রে সমস্ত দেশটাকে পিষে মারে, তবে তোমার আমার মতো দু'একজনের কি ক্ষমতা আছে দেশকে রক্ষা ক'রবার !" থামিয়া কহিল, "তা যাক্। তুমি বরং আর দেরী না ক'রে মজীদের ওখানেই আবার ফিরে যাও। যে অবস্থা দেখলাম, তাতে ক'রে তুমি কাছে না থাকলে মজীদের শবদেহকে মাটী দেওয়াই হয়ত হবে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-পিলেগুলিকে নিয়ে মজীদের স্ত্রীর খুব কষ্ট হবে। আমি চেষ্টা ক'রবো সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাদেরকে রক্ষা ক'রবার। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কান্না সহ্য ক'রতে পারি না, তাই চ'লে এলাম। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, এক্ষুনি সেখানে যাও।"

কি যেন একটা বলিতে যাইয়া হঠাৎ কথার সূত্র হারাইয়া ফেলিল মক্‌বুক আলী। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে আবার মজীদের ঘরের দিকেই পা বাড়াইল।

কেমন যেন একটা অবসন্নতায় সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল শ্রীমন্তের। অনেকখানি বেলা হইয়াছিল ; একবার মনে করিল—কিছুসময় ব্যাঙ্কে যাইয়া বসিয়া আসিবে। কিন্তু ভাল লাগিল না। একরকম টলিতে টলিতেই নিজের ঘরখানিতে আবার ফিরিয়া আসিল শ্রীমন্ত ঃ তারপর কোনো রকমে স্নান-খাওয়া দাওয়া সারিয়া পুনরায় বিছানায় আসিয়া বসিল। আর একবার ঘুম দিয়া উঠিলে যদি শরীরটা একটু হাল্কা···ঝরঝরে হয়! ভাতের একটা অদ্ভুত নেশা আছে! হাতেব কাছে খুঁজিয়া পাতিয়া এমন একখানিও বই পাইল না যে, সামান্য কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে পারে। বাঁধান ডায়ারী খাতাখানিই আজ একমাত্র পথ চলার সঙ্গী। নানা লেখন, অনুলেখন আর সমালোচনায় ক্রমশঃই ভরিয়া উঠিতেছে ডায়ারীর পাতাগুলি। ব্যক্তি-জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি, নিরালা জীবনের সুখদুঃখের মরমী স্মৃতিমালা এই ডায়ারী! গত কয়েকদিনের মধ্যে একবারও যেন পাতাগুলিকে খুলিয়া দেখে নাই সে। সস্নেহে পৃষ্ঠাগুলির উপর দিয়া এই মুহূর্ত্তে আজ আর একবার আঙুল বুলাইয়া নিতে যাইয়া একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া শ্রীমন্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। মনের কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সৌদামিনীকে উদ্দেশ করিয়া 'শ্রীময়ী'-সম্বোধনে লেখা সামান্য একটি

পরিচ্ছেদ। কিছুদিন আগেকার লেখা। শেষ করিয়া আর দ্বিতীয়বার পড়িবার অবকাশ পায় নাই। পরম মমতায় প্রতিটি শব্দ একরকম উচ্চারণ করিয়াই প্রাক্-নিদ্রার এই নিরালা অবসন্ন মুহূর্ত্তটাকে নিজের মধ্যে ভরিয়া তুলিল শ্রীমন্ত। সুন্দর সুপটু হাতের মনোময় চিত্র ঃ

শ্রীময়ী,

আজ তোমাকে যেন নতুন ক'রে অনুভব ক'রছি নিজের মধ্যে। মনে হ'চ্ছে, কাছে পাবার লোভটাই যেন সব চাইতে বড়ো; নইলে প্রতি মুহূর্ত্তে যেখানে পায়ে পায়ে বাধা, চলার পথে যেখানে অনবরত আতঙ্ক আর বিভীষিকা, যেখানে আত্ম-গত সমুদ্রমুখী মনের মধ্যে অফুরন্ত কল্লোল-প্রবাহ, তার মধ্যেও এমন অবসন্ন মানসপটে তোমার মূর্ত্তি কেন ভেসে উঠ্‌লো হঠাৎ! কারণ আছে। সেইটেই তোমাকে বলি।

কাল থেকেই সারা আকাশটা গুমোট মেঘে ভরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। ইংরেজের ভারত-শাসনের মতই একটা বিশ্রী রকমের গরম প'ড়েছে। ভোরে উঠেই তাই আড়িয়াল-খাঁয় গিয়ে নেমে প'ড়লাম স্নান ক'রবো বলে'। অতর্কিতে আংটিটা আঙুল গলিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে জলের নিচে তলিয়ে গেল। শুধুই যদি আংটি হ'তো, তা' হ'লে নির্ব্বিবাদে হয়ত এটা নদীগর্ভেই মিশে থাক্‌তে পারতো। কিন্তু তা' তো নয়, এ যে আংটিকে কেন্দ্র ক'রে রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। স্বর্ণকার এটাকে বানিয়ে দিয়েই খালাস হ'য়েছিল, কিন্তু তোমার

মা? তাঁকে ভুল্‌বো কেমন ক'রে? তিনি যে ঐ মিনার উপরে নাম রেখে গিয়ে চির-জীবনের প্রতি-চিন্তায় কতখানি ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, সেই কথাটা ভাব্‌তে গিয়েই মন একবার কেমন যেন আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌লো! যুক্ত করে প্রণাম ক'র্‌লাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। তারপর তুমি। হাতখানি আমার টেনে নিয়ে সেদিন তো আঙুলে শুধু তুমি আংটি পরিয়েই দাও নি, দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি। সেদিন থেকে এই আঙুলে আংটিটী এঁটে রইল রক্ষাকবচের মতো। যতবার মনে ক'রেছি, তুলে রাখি, ততবারই নিজের কাছে হার মেনেছি। মাঝে মাঝে মনে ক'রেছি, এতই বা কেন? কথা—সে কি কিছু নয়? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মনে হ'য়েছে—কথার অতীত-কথাও তো পৃথিবীতে বড় কিছু আছে, তাকেই বা অস্বীকার ক'রবো কি দিয়ে? পৃথিবীতে যত কিছু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত—সব যে ঐ কথার অতীত-কথার কলা-সৃষ্টিতেই সম্ভব। কথা যেখানে পরাজয় আনে, কথার অতীত-কথার মায়াজালে যে সেইখানেই দেখা দেয় জয়ের সূচনা। মনে হ'লো, কথা দিয়ে যেটুকু তুমি আমায় কেড়ে নিয়েছ, তার চাইতে বেশী জয় ক'রে নিয়েছ যেন কথার অতীত এই আংটিটার যাদু দিয়ে। কাছে ব'সে আজ তো তুমি আর কথা কইছ না, কিন্তু অনন্ত কথা যেন কেবল নতুন থেকে আরও নতুন হ'য়ে রূপ নিচ্ছে আংটিটীতে। রূপকথা নয়, কিন্তু নয়ই বা বলি কী ক'রে? কিছু একটা ব'ল্‌তে যাওয়াই যে ঘটনাকে রূপ দেওয়া ঃ

যে রূপের মধ্যে আমরা বিষিয়ে উঠেছি, যে বিদগ্ধ রূপ আমাদের মজ্জায় দিয়েছে আগুন জ্বেলে, যে রূপের জগতে আজ আমরা বংশ পরম্পরায় আহুতি হ'য়ে চ'লেছি, সেই কি কিছু একটা রূপকথা কম! এই রূপের বিরুদ্ধে আমরা সারা জীবন সংগ্রাম ক'রবো, সংগ্রাম ক'রবো—যতদিন না আমাদের এই নির্ম্মম বিদ্রোহী স্বরূপের কাছে আজকের এই প্রচলিত রূপ নতি স্বীকার করে। এই রূপের বিরুদ্ধে স্বরূপের বিদ্রোহই তো তোমার আমার মিলিত সাধনা, তোমার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি যে নিত্য নতুন ক'রে বার বার জ্ব'লে উঠ্‌তে দেখেছি আংটিটায়। মিনার ভিতরে তাকাতে গিয়ে মনে হ'য়েছে, অলক্ষ্যে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি। দারুণ মূর্ত্তি তোমার, ব'ল্‌ছো, 'পথের জঞ্জাল সব পুড়িয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে আজ সত্যিই পথে এসে নেমেছি। আর আমার ভয় বা লজ্জা নেই।' হাতে তোমার জ্বলন্ত মশাল, কাঁধে তোমার চাম্‌ড়ার ফিতেয় বাঁধা ধারালো কুড়ুল। ব'ল্‌লাম, 'জঞ্জাল পরিষ্কার ক'রতে নেমেছ, ভাল; কিন্তু তোমার এতবড় সহিংস সংস্কার তো মহাত্মাজী অনুমোদন ক'রবেন না! পথে পথে কাঁটা-গাছ গজালেও তার প্রাণ আছে। তার ওপরে স্বতঃ-প্রণোদিত আক্রমণ হিংসা-নীতির মধ্যে যেয়েই পড়ে।'—মিনাটা আরও খানিকটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো! তুমি ব'ল্‌লে, 'হাঁটবো কোথা দিয়ে, কাঁটায় কাঁটায় পা যে ছড়ে' গেছে। তার ওপরে মশাল আর কুড়ুল ধরা অহিংস পর্য্যায়েই পড়ে।

তাই যদি না হবে, তবে গান্ধীজীর যত কিছু আন্দোলন—সবই হিংসামূলক। 'অহিংস' কথাটা ওপরের একটা আবরণ মাত্র। পেটে ক্ষিধে নিয়ে পৃথিবীতে কোনোদিন বড় কিছু একটা ত্যাগধর্ম্ম গ'ড়ে উঠ্‌তে দেখেছ? আমরা নারী, আদ্যা শ্যামাশক্তি আমাদের মজ্জায়; কাঁটা গাছ, কুটো-খড় তো তুচ্ছ, আমরা যদি একবার চ'ল্‌তে সুরু করি, তবে স্বয়ং মহাদেব পর্য্যন্ত পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যান। সেই শক্তি আজ নিজের মধ্যে চিনেছি।' কথা ব'লতে পারলুম না, অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলুম। আংটির মধ্যে রূপ নিয়ে তুমি যেন নতুন হ'য়ে উঠেছ দিনে দিনে! এ কি শুধুই কথা, শুধু একটা আবেশ মাত্র! তা তো নয়, এই তো কথার অতীত-কথা, অচিন্ত্য···অপূর্ব্ব··· অনন্য। এমন কথা যে তুমি ব'লেই তোমার আংটি ব'ল্‌তে পারে! তাইতো অনবরত ডুবে ডুবে চোখ দুটো লাল ক'রে ফেললুম। এও একটা অসাধ্য সাধন। তর-তর বেগে স্রোত বইছে আড়িয়াল-খাঁয়। পাড়ে এসে আছ্‌ড়ে প'ড়ছে ছোট ছোট ঢেউগুলি। রত্ন উদ্ধার ক'রলুম তো নয়, নতুন ক'রে যেন উদ্ধার ক'রলুম তোমাকে! ডুবে ডুবে আবার হাতে পেলাম শ্রীময়ীকে। তারপর সোজা ঘরে এসে এই কলম ধ'রলুম। ভাব্‌লুম, আজ যদি একে ডায়ারীর পাতায় গেঁথে না রাখি, তবে, আবার যেদিন ফিরে গিয়ে তোমার সাম্‌নে দাঁড়াবো, সেদিন হয়ত উন্মাদনার মুখে সমস্ত ঘটনার চাপে আজকের

দিনের এত ছোট অথচ এত বড় ঘটনাটা ব'লতে গিয়ে একেবারেই হারিয়ে ব'সবো।

ভাবচি, কর্ত্তব্যের ডাকে আজ হয়ত তুমি আর সত্যিই ঘরে ব'সে নেই! সারা বাংলার উপর দিয়ে সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত যে দারুণ ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, তা দেখে অন্ততঃ তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারো না। জিজ্ঞেস্ ক'রবে তো আমার কথা? কিন্তু ব'লতে গেলে তা' রীতিমত একখানি উপন্যাস হ'য়ে দাঁড়াবে। সে ভারটা না হয় সাহিত্যিকদের উপরেই থাক্। শুধু একটা দারুণ দৃশ্য এখানে এঁকে রাখ্‌চি। যেদিন দেখা হবে, পাছে এটুকু ব'লতেও ভুলে যাই, তাই শুধু দিনপঞ্জীর একটা ক্ষীণতম দাগ কেটে রাখা মাত্র।

এখানে ওখানে ঘুরে যখন শেষটায় এই বন্দরে এসে পৌঁছলাম, মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু এই বন্দরের মর্ম্মের দিকটাও দেখ্‌লাম কম নয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর চাষীরা ছু' বেলা ছু'টি পেট পূরে খেতে পাচ্ছে না, অথচ তারই আশে-পাশে দেখলাম—কী কঠিন ছলনাময় বিভীষিকার উপরে চ'লেছে লগ্নি কারবার, দালালী আর ব্ল্যাক-মার্কেটিং। কালো বাজারের এই মানুষগুলোকে চেনা কঠিন, অথচ কথা বলে হেসে—সময়ক্ষেপ করে না একবিন্দু। একদিন চোখের সমনে দেখ্‌লাম, সন্ধ্যার নিভৃতে এক পাউণ্ড কুইনাইন বিকিয়ে গেল চারশো টাকায়। বাজারে কুইনাইন নেই, সরকারের দান মেপাক্রিন—তাই বা কোথায়? এমন অবস্থায় চার টাকার

জিনিষ চারশো'তে বিকিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ; নইলে উপায় নেই, লোক যে এদিকে মরে। কিন্তু ভাবলাম—এই কালো বাজারের কি দণ্ড নেই ? কিন্তু কি জানো শ্রীময়ী, সত্যিই হয়ত এর দণ্ড নেই ; নইলে কৈ, এদের তো দেখি না হাজতে যেতে, পুলিশ তো এদের বিরুদ্ধে কোনো ভারতরক্ষা আইন জারী করে না ! এইতো এই যুদ্ধের অভিশাপ। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন বটে নেতারা, কিন্তু দেশের আয়ু এতদিনে আর এককণা অক্সিজেন পেয়েও বেঁচে রইলো না। আসলে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই চান নি শাসন-কর্ত্তারা। তাঁরা হয়ত চেয়েছিলেন—ভাতে মেরে বাঙালীর মাথাকে একেবারে চিরদিনের মতো গুঁড়িয়ে দিতে। গুঁড়িয়েই গেছে বটে, তবে যারা মাথা দিয়ে কাজ করে, তারা নয়, মাথাকে যারা তৈরী করে, তা'রা। আর একটা তুর্ভিক্ষ ঘটাতে পারলেই শাসন-কর্ত্তারা একেবারে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবেন।

জানো শ্রীময়ী, কেবল কি ঐ লগ্নিকারবার, দালালী আর ব্ল্যাক-মর্কেটের চোরই শুধু, কত যে ডাকাতের দল পর্য্যন্ত গত তুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌লো—তারও যে ইয়ত্তা নেই। আমাদের এই সহরেই কি কম কিছু ? ওদিকে তখন জাপানী বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার ক'রে নিয়েছে ; বাংলার পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে আরও গভীরতর প্রত্যন্তে তাদের তখন সশস্ত্র অভিযান। রাজনৈতিক মহলে এক অপরিসীম অনিশ্চয়তার আভাস তখন, একথা তুমিও জানো। গৃহ-

বাসী প্রাণভয়ে প্রকম্পিত আর বিভ্রান্ত। এমন একটা সুন্দর সুযোগ কি মেলে লুঠতরাজের! গ্রামে গ্রামে, সহরের আনাচে কানাচে গ'ড়ে উঠলো ঐ ডাকাতের দল। এরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠকের গোষ্ঠি নয়। অভাবের তাড়না নেই এদের কোনো, ডাকাতিই ওদেব চরিত্রগত পেশা। এম্‌নিতর একটা দলই সেদিন এসে ভেঙে প'ড়েছিল শ্যামাপদদের বাড়ীতে। গভীর রাত্রি। ঘরে ঘুমুচ্ছিল নিশ্ছিদ্র প্রশান্তিতে শ্যামাপদ আর তার স্ত্রী নীরজা। ওপাশের ঘরে শ্যামাপদ'র বাবা। নতুন বউ নীরজা। গায়ে অলঙ্কারের পারিপাট্য থাকা অশোভন কিছু নয়। ডাকাতেরা এসে দরজা ভাঙ্‌লো। ঘুম ভেঙ্গে গেল নব দম্পতির। বাধা দিয়ে যে দাঁড়াবে—এমন শক্তিই বা কোথায় শ্যামাপদ'র! ডাকাতেরা দলে ভারী। চীৎকার ক'রে খুনের ভয় দেখিয়ে লুটেপুটে নিয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। অলঙ্কারাবৃত দেহশ্রী নীরজার, মুহূর্ত্তে নিরাভরণ-জ্বালায় আর আতঙ্কে মেঝেতে লুটিয়ে প'ড়ে অশ্রু ভাসালো! গ্রামবাসী কেউ সেদিন এগিয়ে আস্‌তে সাহস পায় নি। আমার কি মনে হয় শ্রীময়ী জানো, এম্‌নিতর কতকগুলি ডাকাতের দল দিনের পর দিন তাদের মাংসল অস্তিত্ব বজায় রেখে চ'ল্‌তে পারছে শুধু সরকারী দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য। পুলিশ ঘুষ নিয়ে এদের সুযোগ দেয়, থানায় এদের জায়গা নেই। মানুষের কাছে আবেদন ক'রে যখন এর কোনো প্রতিকার পাই না, তখন একবার গলা ছেড়ে মানুষের বিধাতাকে ব'লতে ইচ্ছে হয়—'যারা তোমার সৃষ্টিকে এমন ক'রে ক্ষতবিক্ষত

ক'রে দিচ্ছে, এমন ক'রে কলুষ-পঙ্কিল ক'রে তুল্‌ছে তোমার সহজ-মৌন ধ্যানী সমাজকে, চোখ বুঁজে তুমি আর কতকাল তাঁদের সহ্য ক'রবে বিধাতা? তোমার ন্যায়ের দণ্ড কি তাদের শিরে হান্‌বে না? আবার কি তোমার সৃষ্টিজগৎকে সুন্দর লাবণ্যময় ক'রে তুল্‌বে না?'

নিজের কাছে আজ যেন নিজেকে সত্যিই বড় একা ব'লে মনে হ'চ্ছে শ্রীময়ী। যে স্বপ্ন আমাদের সমস্ত মনে বাসা বেঁধে আছে, আজ ভাবচি—আরও কত দীর্ঘকালই না যেন লাগবে সেই স্বপ্নে মঞ্জরী দেখা দিতে! তোমারও কি আজ এমন্‌টাই মনে হয়? কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমাদের, দেখো— কোনো একবিন্দু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েই যেন তা' কখনো ভেঙে না যায়! ভবিষ্যতের পুঁজি, তাই বা আমাদের কম কি? আজ এইখানেই কলম বন্ধ করি।—[একটি বিষন্ন প্রভাত : ১৯৪৫]

এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করিয়া নিজের মধ্যেই কেমন যেন এক অভিভূত অবস্থায় আত্মনিমগ্ন হইয়া গেল শ্রীমন্ত। এ তো ডায়ারীর পাতায় দিনপঞ্জীর ঘটনা সংরক্ষণ নয়, এ যেন প্রাণবন্ত একখানি মহাকাব্যের সুন্দরতম একটি অধ্যায়। সত্যিই যেন কেমন একটা অদ্ভুত দুর্ব্বলতা আসিয়া গিয়াছিল সেদিন সমস্ত মজ্জায়, সমস্ত রক্তে।—ধীরে ধীরে চোখ বুঁজিয়া আসিল শ্রীমন্তের।

কিন্তু সৌদামিনীই কি এই দীর্ঘকাল শুধু উনুনের পাশেই নিশ্চেষ্ট মনে কাটাইয়া দিয়াছে? তাহা নয়। চিরকালের সংরক্ষণশীল গ্রামের বুকে নারী-জীবনে যতখানি বিপ্লবের পথে আগাইয়া যাওয়া সম্ভব, এতটুকুও শৈথিল্য আসে নাই তাহাতে সৌদামিনীর। বইয়ের সেল্‌ফটা ধীরে ধীরে আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তা ছাড়া দৈনিক কাগজের সংবাদগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনে মনে সে আরও দৃঢ়, আরও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার যে রুদ্র-চণ্ডী মূর্ত্তিটি সেদিন শ্রীমন্তের লেখনীতে ডায়ারীর পাতায় রূপ নিয়া দেখা দিয়াছিল, শ্রীমন্ত কাছে থাকিলে দেখিতে পাইত, সে-রূপে আর আসল রূপে সৌদামিনী এতটুকুও পৃথক নয়। কিন্তু একা নারী,—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো একান্তে গ্রামের বুকে বসিয়া তেমন কিছু একটা দৌড়-ঝাঁপ দিবার মতো অবস্থার সুযোগই বা সে পাইয়াছে কোথায়? তারপর অগ্নিকাণ্ডের সেই ঘটমার পর হইতে অনবরত টাউন-পুলিশের টহলদারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে গ্রামে। যেখানে ছট্টু মান্নার মতো আর দুই একজন চৌকিদার ভিন্ন বড় একটা কাহারও দেখা পাওয়া ভার হইয়া উঠিত, সেখানে দেখা গেল—দুই একদিনের মধ্যেই লাঠি, বন্দুক আর লালপাগড়ীতে

সারাটা বারোখাদা অঞ্চল রীতিমত তাতিয়া উঠিয়াছে। বারোখাদার এই তিন বৎসরের ঘটনা-পঞ্জীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখি—শ্রীমন্তের অনুমানটা সত্যিই মিথ্যা নয়।

বিদায় নিল' ১৯৪২। আগাইয়া চলিয়াছে ১৯৪৩-এর দিনগুলি। সত্যিই চাউলের দাম আরও চতুর্গুণ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল। যাহারা পারিয়াছে, সুবিধা দরে আগে হইতে দুই পাঁচমণ ঘরে আটকাইয়াছে ; কিন্তু তাহাতেই বা কয়দিন চলিতে পারে! বাজারে নতুন দাম উঠিল—সাড়ে বত্রিশ টাকা। এদিকে প্রথম বর্ষায় কিছুটা জল দেখা দিয়াছিল বটে খালে, কিন্তু বেশীদিন রহিল না। প্রকৃতির এ যেন কেমন এক অদ্ভুত-রকমের ষড়যন্ত্র! মাথায় হাত দিয়া বসিল চাষীরা। আগে আগে হাটে বাজারে লোক আর ধরিত না, এখন যেন এদিকে বড় একটা কাহারও দেখা নাই। ক্রেতা, বিক্রেতা—সকলের অবস্থাই আজ প্রায় এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সৌদামিনী কহিল, "তোমার শুধু চব্বিশঘণ্টা ভয় আর ভয়, পিসীমা। এমন ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌লে গ্রাম যে রসাতলে যাবে! সব যায়গায় আজ এই সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আর আন্দোলন চ'লেছে। এখনও যদি কাজে নেমে না পড়ি, তবে যে ম'রতে হবে তোমাকে আমাকেও।"

পিসীমা কহিলেন, "তা—ভগবান যদি সত্যিই মারেন, তবে কি আমাদেরই ক্ষমতা থাকবে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রবার! কিন্তু তাই ব'লে তোকে এমন একা-একা ঘরের বার হ'তে

দেবো না কিছুতেই। এস. ডি. ও সাহেবকে সেই একবার চটিয়ে দিলি, দিনরাত্রি একেই তাই ভয়ে আছি ; এরপর আবার যদি কিছু ক'রতে যাবি, তবে আর তোকে ফিরে পাবো না। নির্ঘাত তোকে জেলে ধ'রবে, মিনি।"

"তুমি এমন ভীতু পিসীমা যে, শুন্‌লে হাসি পায়।" সৌদামিনী কহিল, "আজ যদি মথুর গ্রামে থাক্‌তো, তবে আর দুঃখ ছিল না। সে জানে কেমন ক'রে ল'ড়তে হয়। আর, জেলের কথা ব'লছো পিসীমা, সে তো সৌভাগ্য। সত্যিকারের কাজ ক'রে যদি জেলেই যেতে হয়, তার মতো সুখ সত্যিই কি আর কিছু আছে ? হাস্‌তে হাস্‌তে আমি কারাবরণ ক'রবো ; দরকার হ'লে তোমাকেও ক'রতে হবে।"

"কি, কি ব'ল্‌লি মিনি, আমাকেও শেষে তুই এই বয়সে অম্‌নি ক'রে টান্‌বি !" সহসা যেন বুকের ভিতরটা আতঙ্কে একবার ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল পিসীমার। কথাটা বলিয়া কিছুক্ষণ থামিলেন, তারপর বিষয়টাকে একরকম সহজ গতিতে টানিয়া আনিবার ভঙ্গিতেই মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এমন অনাচ্ছৃষ্টি কথা ব'লেও তুই ভাবিয়ে তুল্‌তে পারিস মিনি যে, আর বাঁচি না। তা—হ্যাঁ রে, মথুরের সত্যিই কি তবে কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না ?"

সৌদামিনী কহিল, "বেশ যা হোক্ বল্‌লে পিসীমা। তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে ; একটুও কি বেরুতে দাও যে, কিছু একটা খোঁজ ক'রে দেখবো !"

"বেরিয়েই বা খোঁজ ক'রবি কোথায় ?" দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "কাগজপত্র পড়িস্ তুই, তাই জিজ্ঞেস ক'রছি, তেমন কিছু পেয়েছিস্ নাকি ওর সম্বন্ধে ?"

কথা শুনিয়া এবারে হাসিয়া ফেলিল সৌদামিনী, কহিল, "তুমিও দেখছি কম বোকা নও, পিসীমা। তার কিছু একটা থাকবার খবর আবার কাগজে বেরুবে নাকি ? সরকার থেকে গ্রেপ্তারের আইন জারী করা হ'য়েছিল তার ওপরে, ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। নিশ্চয়ই পুলিশ তার পেছু নিয়েছে ! কিন্তু ধ'রতে পারবে ব'লে মনে হয় না !" তারপর থামিয়া কহিল, "কিন্তু কথা দিয়ে তুমি আমাকে ভুলাতে পারবে না পিসীমা ! সাঙ্ঘাতিক অবস্থা আজ গ্রামে। এরই মধ্যে সাড়ে বত্রিশ টাকা উঠে গেছে চালের দাম। তারপর শুনছি, আতপ চাল নাকি এরই মধ্যে বাজার থেকে উধাও হ'য়েছে।"

এবারে পিসীমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বৈধব্য জীবনে ঐ দু'টিমাত্র আতপান্ন সম্বল ; তাহাও উধাও হইয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত যে উপোষে কাটাইতে হইবে !

কহিলেন, "সে কি কথা রে মিনি, খাবো কি তবে ?"

সৌদামিনী বলিল, "এতক্ষণ তবে কী বললুম, পিসীমা ? একবার এস না, পথে বেরিয়ে প'ড়ে লোক সংগ্রহ ক'রে আন্দোলন করি। আন্দোলন আর সংগ্রাম ভিন্ন তুমি কি ভেবেছ এর এতটুকুও কিছু প্রতিকার হবে ? সে আশায় ছাই।"

এতক্ষণে যেন একটু সত্যিকারের চেতনা আসিল পিসীমার।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর কহিলেন, "তবে তো আর পথ নেই মিনি। তুই বরং আজই তবে সুধীরকে চিঠি লিখে দে এখানে আসতে; কাজকর্ম্ম তো তেমন কিছু নেই তার, অনায়াসে চ'লে আসতে পারবে। ব্যাটাছেলে কেউ ঘরে না থাক্‌লে কি সত্যিই চলে!" থামিয়া বলিলেন, "কতবার পই পই ক'রে বলি যে, বয়সটা তো আর ব'সে নেই, এবারে রাজি হ' মা, দেখে শুনে একটি বাবাজীবন এনে চক্ষু জুড়াই। তা—কথা কানে গেলে তো! আমাদের কালে এমন হ'লে আর উপায় ছিল না।"

এবারেও তেম্‌নি করিয়াই হাসিল সৌদামিনী, কহিল, "এ কালটা যখন আর তোমাদের নয়, তখন আর মিথ্যে আক্ষেপ ক'রছো কেন পিসীমা? তোমাদের কালে মেয়েদের বলা হ'তো অবলা, সমাজ-ব্যবস্থাটাই এমন ছিল যে, বাইরের জগতের সূর্য্যতাপে তাদের নামবার সুযোগ ছিল না। এখনও যে সমাজের রূপ খুব বেশী একটা ব'দ্‌লেছে তা নয়, কিন্তু এ যুগের মেয়েরা তাদের নিজেদের শক্তি আর অধিকারেই ঐ বাইরের জগতেও নিজেদের ঠাঁই ক'রে নিয়েছে। আজ আর সে শুধু পুরুষের আজ্ঞাধীনা নয়, পুরুষের কাজের সে সহচরী। সেই সাহচর্য্য কি গৃহস্থালী কি রাষ্ট্রবিপ্লব—সর্ব্বত্রই আপন অধিকারে আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তা যাক্‌। অত ব'ল্‌তে গেলে কিছুই আবার তোমার মাথায় ঢুক্‌বে না, সুতরাং কথায় দাঁড়ি টানি।"

কিছুক্ষণ নির্ব্বাকদৃষ্টিতে পিসীমা চাহিয়া রহিলেন সৌদা-মিনীর মুখের পানে, তারপর কহিলেন, "এতও জানিস্ তুই, মিনি! তা—আর যেন দেরী করিস্নে মা, আজই সুধীরকে দু'কলম লিখে দে এখানে আস্তে। সে এলেই চাল যোগাড়ের কিছু একটা সুরাহা করা যাবে।"

আপত্তি বা দ্বিধা করিল না সৌদামিনী। পিসীমার নামে চিঠি দিল সুধীরকে। কিন্তু সুধীরকে কোনোদিন যে চোখে দেখিয়াছে সে, তাহা নয়। পিসীমার কাছেই তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছে সৌদামিনী।—সম্পর্কে পিসীমার দেবর হয় সুধীর; জামসেদপুরে থাকে। দেশের কাজে নাকি তাহারও ছোট বেলা হইতেই ঝোঁক, বেশ সহজ সরল চঞ্চল। মনে মনে সৌদামিনী একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া নিল' সুধীরের, তারপর অলক্ষ্যেই আবার কখন্ যাইয়া কী একটা বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

খবর পাইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিল সুধীর। বাস্তবিকই কল্পনা মিথ্যা নয় সৌদামিনীর। বেশ একটা বলিষ্ঠ পৌরুষ আছে সুধীরের চেহারায়—যে পৌরুষ শুধু চোখের আয়ত দৃষ্টি আর প্রতিভায়ই উজ্জ্বল নয়, বাহিরকে আকর্ষণ করিবার শক্তিতেও দীপ্তিমান। ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ কান্তি, উন্নত নাসিকা, বিস্তৃত ভ্রূ। প্রথমটা কিছুটা আড়াল হইতেই একবার বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া নিল সৌদামিনী।

কথায় কথায় পিসীমা একসময় বলিলেন, "নানারকম বিপদ আজ দেশে ; সংসারটাকে তোমার তো কিছুকাল দেখতে হবেই ভাই, তা ছাড়া আমার পাগ্‌লী মা এই মিনি—একেও আগ্‌লাতে হবে তোমাকে। চ'লে কিন্তু শীগ্‌গির যেতে পারবে না, ঠাকুরপো ভাই।"

উত্তর দিতে গিয়া সুধীর কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপর অপাঙ্গে একবার সৌদামিনীকে দেখিয়া লইয়া কহিল, "তোমার সংসারের অসুবিধেগুলো না হয় দেখলাম বৌদি, কিন্তু তোমার ঐ মা'টিকে আগ্‌লানো কি সত্যিই সম্ভব হবে আমার দ্বারা ? আর—তা ছাড়া উনিই বা তা' মানবেন কেন ?"

পিসীমা কিছু একটা বলিবার আগে এবারে স্বর তুলিল সৌদামিনী। বলিল, "ঠিকই ব'লেছেন সুধীর বাবু। আমি কি কচি খুকী যে, আমাকে কেউ না আগ্‌লালে আর চ'ল্‌ছে না, আসলে পিসীমার ঐ একটা রোগ ; যা নয়, তাই নিয়ে কিছু একটা না ব'ল্‌তে পারলে যেন নিজের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠেন।"

প্রত্যুত্তরে কিছু একটা বলিতে চেষ্টা করিল সুধীর, কিন্তু কি বলিবে বা কি বলা যাইতে পারে, তাহা যেন সহসা ঠিক বুঝিয়া উঠিল না সে। নির্ব্বাকদৃষ্টিতে শুধু কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে সৌদামিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সৌদামিনী পুনরায় কহিল, "এই যে আপনি চিঠি পেয়ে এখানে এলেন, এ কষ্টটুকু ক'রবারও আপনার প্রয়োজন হ'তো না! সব কিছুতেই পিসীমার ভয়। কেবল—এই বুঝি কি

হ’লো কি হ’লো! নইলে ধরুন, কী না ক’রতে পারি আমি? হেঁসেলের রান্না থেকে সুরু ক’রে জনতার মধ্যে গিয়ে কাজ করা —কিছুতেই আটকায় না। আটকিয়ে আছি শুধু পিসীমা দুঃখ পান ব’লে।”

সুধীরের সম্বন্ধে পিসীমার নিকট হইতে সৌদামিনী অনেক-কিছু শুনিয়া থাকিলেও সৌদামিনী সম্বন্ধে সুধীর আদৌ কিছু জানিত না। এবারে সৌদামিনীর কথায় কতকটা যেন অবাক হইয়া গিয়াই সুধীর কহিল, “সে কি? জনতা সম্পর্কেও তা হ’লে আপনি সচেতন?”

দ্বিধা করিল না সৌদামিনী, বলিল, “কেন, মেয়ে ব’লে কি তাও থাক্‌তে নেই নাকি? ঘরের কাজ আজ আর কতটুকু বলুন! বাইরে চেয়ে দেখুন, জনতা আজ কাজের পথে কী দারুণ ভাবে নেমেছে! তাদের মধ্যে থেকে কাজ না ক’রলে যে ঘরের কাজও অসমাপ্ত থেকে যাবে, সুধীর বাবু। অথচ দেখুন, এই সোজা কথাটা একটি বারও পিসীমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলুম না।”

কথা শুনিয়া মনের কোথায় যেন এবারে খানিকটা জ্বলিয়া উঠিল পিসীমার। কহিলেন, “নে, খুব হ’য়েছে, অনেক বিদ্যে শিখেছিস্, আর বিদ্যেধরীর মতো তোকে ব’ক্‌তে হবে না মিনি।” তারপর থামিয়া কহিলেন, “সুধীর ঠাকুরপো এসেছে, এবারে আমি রক্ষে’ পেয়েছি, দু’টোদিন ও একটু দেখে শুনে ঠিকঠাক ক’রে নিলে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত! এমন ক’রে

আর দিনরাত তোর সাথে কথা-কাটাকাটি ক'রতে পারি না।"

হাসিয়া সুধীর কহিল, "এসেই যা দু'পক্ষের মধুর সম্পর্ক দেখচি, তাতে ক'রে মনে হ'চ্ছে—আমিও হয়ত বড় বেশী টিকে উঠতে পারবো না। আর রূপটাও সংসারের কম বিচিত্র নয়। নবতনী আর পুরাতনী—এর মধ্যে কথা-কাটাকাটিটা একেবারেই সামান্য ব্যাপার, রীতিমত কিছু একটা বিদ্রোহ হ'লেই স্বাভাবিক মনে ক'রতাম।" থামিয়া বলিল, "এর মধ্যে কোন্ পক্ষ নিলে জিতবো, তাই ভাবছি।"

পিসীমা কহিলেন, "ঠাট্টা রাখো ঠাকুরপো ভাই। কম বিপদে প'ড়ে কি তোমাকে আস্তে লিখেছিলাম! তুমি না এলে দু'দিন বাদে হয়ত আমাদের অবস্থা চরমে উঠতো।—যার কাজ যা ভাই, ওদিকে হাট-বাজার একেবারে পরিষ্কার,—চাল, চিনি, কেরোসিন ব'ল্‌তে কিছু নেই; চারদিকে যেমন শুনি, সব মড়ক লেগেছে, ঘরে কি কেউ পুরুষ মানুষ না থাক্‌লে সত্যিই চলে! কি থেকে কি হ'য়ে যায়, কিছুই তো বলা যায় না!"

স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া সুধীর বলিল, "তা—আস্‌তে লিখে কিছু তো আর খারাপ করো নি বৌদি, তবে ভাবচি—খরচ আবার কিছু বাড়লো তোমার।"

ইঙ্গিতটা বড় আঘাত দিল এবারে পিসীমাকে; বলিলেন, "অমন কথা মুখেও এনো না, ঠাকুরপো ভাই। আমাদের মুখে দু'গ্রাস দিতে পারলে তোমারও তা থেকেই চ'লে যাবে। এতে খরচ বৃদ্ধির কথা কি এলো?"

এবারে আর সুধীর কিছু একটা বলিতে পারিল না। পাশে চাহিয়া দেখিল—সৌদামিনী কখন্ একসময় সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ একই অবস্থায় নীরবে বসিয়া রহিল সুধীর, তারপর ধীরে ধীরে সেও কোনো একদিকে উঠিয়া গেল।

* * *

গ্রামের কোনো কোনো চাষীকে সৌদামিনী চিনিত। ইতি-মধ্যে একদিন করিম সেখকে পাশের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া নিভৃতে কাছে ডাকিল সৌদামিনী। কহিল, "বাজারের অবস্থা কেমন বোঝো করিম ?"

একরকম হতাশ কণ্ঠেই প্রত্যুত্তরে করিম বলিল, "এখন আর অবস্থা কিছু নেই দিদিমণি, খোদার আরজি পেলেই এখন সব চুকে যায়।"

সৌদামিনীর পক্ষে বিষয়টা অনুমান করিয়া নেওয়া আদৌ কঠিন হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "জমির অবস্থা কী এখন ?"

এবারে যেন চোখ দুইটি রীতিমত ছল্ছল্ করিয়া উঠিল করিমের, কহিল, "জমিও আর জমি নেই দিদিমণি, জমি এখন রাক্ষুসী হ'য়েছে। এতদিন জমিকে নিঙ্ড়ে খেয়েছি আমরা, এবারে জমিই চুষে খাচ্ছে আমাদের। নতুন 'ফলনে' কিছু চারা ধান যে দেখা না গিয়েছিল তা নয়, কিন্তু ঐ চারাতেই শেষ হ'য়ে গেল। গেলাম জমীদার-কাছারিতে, কত 'নেয়ারা'

ক'রলাম, ব'ললাম, 'জল নেই, বিষ্টি নেই এক ফোঁটা, কিছু জলের ব্যবস্থা করুন', কিন্তু কার কথা কে শোনে? চাষী-মুটে-মজুরের কথা কি বাবুদের কানে যায়? জল জুটলো না, শুকিয়ে ম'রে গেল চারাগুলি। এখন ভাবি, নিজেরাও এই দুঃখ থেকে চক্ষু বুঁজে চ'লে যেতে পারলে বাঁচতাম।"—নিজের মধ্যেই একটা ভারী নিঃশ্বাস চাপিয়া নিল' করিম।

সৌদামিনীরও বড় কম দুঃখ বাজিল না বুকে। কহিল, "ছিঃ, ও-কথা ব'ল্‌তে নেই করিম। এমন্ ক'রে ম'রতে কেউ পৃথিবীতে আসে নি। নিজের মধ্যে শক্তি নিয়ে না দাঁড়ালে চ'ল্‌বে কেন?" তারপর স্বল্পক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল, "যাই বলো, একটা বিষয় কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না করিম। আজ না হয় জমিতে ধান নেই; কিন্তু একদিন যে-ধান হ'য়েছে—তাতে তিন চার বছরের খোরাকী চ'লে যেতে পারে গ্রামের। সে ধান গেল কোথায়?"

অস্ফুট কণ্ঠে করিম বলিল, "গ্রামের ধান তো আর সবই গ্রামে থাকে না, কিছু যায় বিক্রি হ'য়ে, আর বাকীটা যায় মহাজনের ঘরে। তা—বিক্রি না হয় হ'লোই, তাতেও দুঃখ ছিল না। ইচ্ছা ক'রলে ঐ জমিদার-মহাজনেরা রক্ষা ক'রতে পারতেন গ্রামকে।"

"কিন্তু রক্ষা যখন তারা ক'রছেন না, তখন প্রতিকার ক'রতে হবে তো তোমাদেরই। জমিদার মহাজন ব'ল্‌তে বুঝোয় দু'-একজনকে, আর তোমরা হ'লে সহস্র। মনে নেই, সেবার

যখন চালের দাম সবে চ'ড়তে সুরু হ'লো, তোমরাই তো আন্দোলন ক'রে তখন তা' কমিয়ে দিলে। আজ কি তোমাদের মথুর দাদাবাবু গ্রামে নেই ব'লে এ-কথা বিশ্বাস ক'রতে হবে যে, তোমরা নিজেরা উদ্যোগ ক'রে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু ক'রতে পারো না !"

করিমের মুখে এবারে ভাষা প্রকাশ পাইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে সে যেন কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল, "কিছুই ভুলি নি দিদিমণি, মথুর দাদাবাবুকে কি সত্যিই ভুলতে পারি, আমাদের দেব্‌তা লোক তিনি। তিনিই তো সেবার আমাদের নিয়ে সভা ক'রে রেলের ঐ মাষ্টারবাবুর সাথে বিবাদ ক'রলেন ! কিন্তু ভেবে দেখলাম, কীই বা ক'রতে পারি আজ আমরা ? তারপর শুনেছেন আর এক ঘটনা ? ক'লকাতার কোন্ এক কোম্পানীর লোক এসে এরই মধ্যে দু'দিন ঘুরে গেছে গ্রামে। বেপারীদের কাছ থেকে চাল হাত ক'রে নিচ্ছে লাভ দিয়ে। জমিদার মহাজনের সাথে নাকি তাদের ভাব আছে।"

কথা শুনিয়া রীতিমত যেন এবারে একেবারে আকাশ ভাঙিয়া পড়িল সৌদামিনীর মাথায় ! কহিল, "সে কি করিম, এ সব জেনে শুনে এখনও তোমরা মুখ বুঁজে সব সহ্য ক'রে আছ ? পারলে না তোমরা তাদের গ্রাম থেকে লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিতে ? গ্রামের ধান চাল বাইরের শকুন এসে লুটে নিয়ে যাবে, আর তোমরা চুপ ক'রে থাক্‌বে ?"

ললাটে করাঘাত করিয়া করিম বলিল, "নিজেদের মাথায় তো কিছু বুদ্ধি খেলে না, নইলে লাঠি নিয়ে দাঁড়াতে আমাদের কতক্ষণ ?"

"এখন আর কোনো বুদ্ধির প্রশ্ন ওঠে না করিম!" সৌদামিনী কহিল, "বুদ্ধির সময় যথেষ্ট প'ড়ে আছে, এখন শুধু কাজ চাই। একদিন যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, আজ আবার তেম্‌নি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াও। তোমাদের হাতের কাস্তে, কোদাল আর সাবল—সে কি বোমা-বারুদের চাইতে কোনো অংশে কম? ভয় কি তোমাদের করিম? জমি চাষ করো তোমরা, জমির মালিক তো নামে মাত্র। তোমাদেরই জমি, তোমরাই তার মালিক; সে-জমির এক কণা ধান কাউকে ছাড়বে না। এর জন্যে কখনো যদি কাছারী-আদালতেই সত্যি দাঁড়াতে হয়, তখন দেখবো। এবারে যাও, খোদাতালার নাম নিয়ে কাজে নামো।"

বারোখাদার চাষীপাড়ার একরকম মোড়লই বলা যায় বটে করিম সেখকে। বড় মাথার কাছে তাহার বড় বেশী মাথা না গলিলেও চাষীদের যুক্তিতর্কে তাহারই ডাক পড়ে। সৌদামিনীর কথার পরে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সোজা সে আসিয়া একেবারে মাঠে উপস্থিত হইল। কাজের অবকাশে জনকয়েক চাষী তখন হুঁকায় নতুন কলিকা সাজিয়া বসিয়াছে। করিম আসিয়া কথায় কথায় সমস্ত কিছু বিবৃত করিয়া কহিল, "এখন আর ব'সে থাকার কাজ না, আজই এস, সারা

গাঁয়ের চাল উদ্ধার ক'রে আমরা তা' নিজেরাই রক্ষা ক'রবো।"

প্রাণ ধারণের কথা, জীবন রক্ষার কথা ; প্রশ্ন উঠিল না কোনো দিক হইতেই। প্রত্যেকেই করিম সেখকে সমর্থন করিল এবং দেখিতে দেখিতে আবার একটা বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল সকলে।—

* * *

একসময় সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া সৌদামিনী বলিল, "এসে অবধি তো দেখচি, বৌদির সাথে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন! শুনেছিলাম, দেশের কাজ করেন, চেহারাও অনেকটা তা-ই বলে বটে ; কিন্তু কই, তেমন কিছু বুঝতে পারছি না তো ?"

কথা শুনিয়া প্রথমটা অনেকখানিই অবাক হইয়া গেল সুধীর, তারপর কহিল, "কেন, কি ব্যাপার ? কথার মধ্যে মনে হ'চ্ছে আপনার রহস্য আছে। কি ব'লতে চান আপনি, খুলে বলুন ?"

"এর মধ্যে খুলে বলাবলির কি আছে ?" সৌদামিনী কহিল, "আপনার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে পিসীমার মুখে যতটুকু শুনেছিলাম, তাতে অন্ততঃ এইটুকু অনুমান ক'রেছিলাম— জামসেদপুরটা যেরকম কুলি-কারখানার যায়গা, তাতে বোধ হয় আন্দোলন···ধর্ম্মঘট ক'রে আর কিছু রাখেন নি সেখানে।

কিন্তু এখন দেখছি,—পিসীমার মতই অত্যন্ত সাধারণ জীবন আপনার ; ঘরে ব'সে আছেন, কখনো-সখনো বাজারটা ঘুরে আস্‌চেন। অথচ বাজার যাদের নিয়ে মিলবে, তাদের কি একবারও দেখতে চেষ্টা ক'রেছেন ?”

এতক্ষণে সুধীর সৌদামিনীর আসল বক্তব্য বুঝিল। একবার হাসিলও সে মনে মনে। 'জনতা' সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে সৌদামিনীকে সে যে-ইঙ্গিত করিয়াছিল, পাকেচক্রে তাহা লইয়াই এবারে উল্টা প্রশ্ন করিল সৌদামিনী তাহাকে। কহিল, “শুধু দেখতে কেন চেষ্টা ক'রবো মিনি দেবী, খুঁজতেও যে চেষ্টা না ক'রেছি তাদের, তা' নয় ; কিন্তু মনে হ'য়েছে—এখানে বোধ হয় লোকসংখ্যাই আসলে কম।”

“তাই তো দেখচি, একেবারে শিব হ'য়ে ব'সে আছেন।” সৌদামিনী কহিল, “আপনার মতো কয়েকটি কর্ম্মী পেলেই দেখচি রাতারাতি এ দেশের ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।” তারপর ঈষৎ থামিয়া বলিল, “বরং এক কাজ করুন না, দেশের নামে ধর্ম্মের নিকুচি না ক'রে কিছুদিন কোনো আশ্রমে গিয়ে একবার মোহন্তগিরি ক'রে আসুন ; আরামও পাবেন, কাজও হবে।”

হঠাৎ এ কথার কোনো জবাব দিতে পারিল না সুধীর। মনের কোথায় যেন সহসা এবারে কথাটা তাহাকে অনেকখানি বিঁধিল। এমন করিয়া কোনোদিন সে পৌরুষে আঘাত সহ্য করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। ভাবিল,

একটা কিছু কড়া উত্তর দেয়, কিন্তু তাহাতেও কোথায় যেন বাধিল। এখানে আসিয়া অবধি সৌদামিনীর শ্রীজগতের দিক হইতে চেষ্টা করিয়াও সে মুহূর্ত্তের জন্যও দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই। কেমন যেন সৌদামিনীর প্রতি সত্যিই তাহার কিছুটা দুর্ব্বলতা আসিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে, সৌদামিনীর মতো কোনো নারী তাহার পাশে থাকিলে জীবনের সমস্ত বাধা সে জয় করিয়া চলিতে পারে! সৌদামিনীর জন্য বহুতর দুর্লভ কিছুকেও ত্যাগ করিতে দ্বিধা আসে না মনে। অনেকক্ষণ মনে মনে কী চিন্তা করিল সুধীর, তারপর কহিল, "দেখ্‌চি ঝগড়া ক'রতে পারলে আপনি আর কিছু চান না। কিন্তু সে-আশা মিথ্যে। ঝগড়া আমি ক'রবো না; দু'দিনের জন্যে এসে কি শেষে বদনাম নিয়ে ফিরে যাবো?" ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টানিতে চেষ্টা করিল সুধীর।

সৌদামিনী বলিল, "নাম সম্পর্কে তবে আপনি বেশ সচেতন, বলুন? কিন্তু সু-নামটাই বা রাখতে পাচ্ছেন কই?"

আবহাওয়াটাকে অনেকখানি হাল্‌কা করিবার চেষ্টাতেই তেমনি হাসিমুখেই সুধীর বলিল, "আদেশের অপেক্ষায় আছি মহারাণীর, এ-বাড়ীতে আমার সুনাম রক্ষার জন্যে যে-কোনো হুকুমই আমি তামিল ক'রতে প্রস্তুত আছি।"

সুধীরের এই আকস্মিক বিচিত্র ভঙ্গী ও কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সৌদামিনীরও যে কতকটা হাসি না পাইল, তাহা নয়; কিন্তু অনায়াসে সেটুকু সম্বরণ করিয়া মুখে পুনরায় অধিকতর

গাম্ভীর্য্যের ভাব টানিয়া সে কহিল, “ছিঃ, এ ঠাট্টার কথা নয় সুধীর বাবু। আপনি পুরুষ, কথায় আর কাজে আপনাকে দেখ্‌তে চাই অমিত পৌরুষের বেশে। আজ যদি মথুর গ্রামে থাকতো, তবে দেখ্‌তে পেতেন—পৌরুষ কি জিনিষ! পুরুষ যদি কখনো কোনো ক্ষেত্রে তার সেই পৌরুষ হারায়, তবে আর তার মানুষ নামে পরিচয় দেবার কিছুই থাকে না, সুধীর বাবু। ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, যে কঠিন সময় আজ আমাদের সাম্‌নে, সেখানে প্রয়োজন হ'লে আজ আপনাকে হুকুমই ক'রবো, অপরাধ নেবেন না। ক'দিন মাত্র এখানে নতুন এসেছেন, মানুষ আপনি সত্যিই দেখতে পান নি। পারবেন আপনি আমাকে নিয়ে বেরুতে, পারবেন আপনি মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের জাগাতে? যদি পারেন, তবে চলুন; আজ আর ঘরে ব'সে পিসীমার কথায় মনের মধ্যে বাঁধন এঁটে থাকলে চ'লবে না। আসুন, এগিয়ে আসুন, মানুষ দেখাই আপনাকে।” একরকম এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলি বলিয়া গেল সৌদামিনী।

সুধীর অবাক বিস্ময়ে শুধু কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। প্রত্যুত্তরে কি বলিবে, সহসা ঠিক বুঝিয়া উঠিল না। এখানে আসিয়া অবধি যে-চোখে সে সৌদামিনীকে দেখিয়াছে, সৌদামিনী দাঁড়াইয়া আছে ঠিক তাহার বিপরীত ভাগে। সেখানে প্রবেশ করিতে যে আজ্ঞাপত্রের প্রয়োজন, সে-কথাটুকু এই মুহূর্ত্তে এই প্রথম উপলব্ধি করিল সুধীর। প্রথম দিন সমস্যা ছিল, বৌদি আর সৌদামিনী—এ বাড়ীতে এই দুইজনের

মধ্যে কোন্ পক্ষ নিলে তাহার জয় সুনিশ্চিত হইবে! কিন্তু এখন দেখিল—মরা সোঁতায় নদীতে শুধু বালুচরই পড়িবে, নতুন বন্যার মুখে হালছাড়া তরীর মতো ভাসিয়া না গেলে এখানে পরিত্রাণ নাই।—ঘরের চৌকাঠ ছাড়াইয়া সৌদামিনী আগাইয়া চলিয়াছে সাম্‌নের দিকে। সুধীরও আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে সেই পথেরই অনুসরণ করিল। অন্দর মহল হইতে পিসীমার একবার হয়ত গলা শোনা গেল, কিন্তু সৌদামিনী কিম্বা সুধীর—কাহারও সেদিকে বিন্দুমাত্র কান গেল না।

বাহিরে তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত চাষীপাড়া জুড়িয়া তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছে ওদিকে। সময়টা সৌদামিনীর পক্ষে আশাতীত অনুকূল বৈ কি? গ্রাম্যসমাজ—হাজার হউক্ আজও তেমন অগ্রগতির পথে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। সেখানে আছে শাস্ত্র-শাসন, আছে কানাকানি। সন্ধ্যাটা যেন সৌদামিনীর জন্যেই আজ এত তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়াছে, আর তীব্র আলোড়নে জমিয়া উঠিয়াছে চাষীরা। সুধীরকে লইয়া ধীর পদক্ষেপে একসময় তাহাদেরই মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল সৌদামিনী।

ত্রস্তপদে করিম আসিয়া প্রণাম ঠুকিয়া কহিল, "এ কি দিদিমণি, আপনি এই ভর সন্ধ্যেয় এখেনে?"

"প্রয়োজন, তাই। তোমাদের মথুর দাদাবাবু আজ গাঁয়ে থাক্‌লে তিনিই আস্‌তেন।" বলিয়া সুধীরকে দেখাইয়া পুনরায়

সৌদামিনী কহিল, "প্রয়োজনের দিনে লোকের অভাবে কখনো পেছিয়ে প'ড়তে হয় না; লোক আপনিই এসে দুয়োরে দাঁড়ায়। নতুন কর্ম্মী পেয়েছি সুধীর বাবুকে। তোমরা শুধু কাজে এগিয়ে যাও; আমি বিশ্বাস রাখি, প্রকাশ্য বিপদ যদি কিছু আসে, তবে সুধীর বাবু নিশ্চয়ই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন।" বলিয়া অপাঙ্গে একবার সুধীরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল সৌদামিনী। জনতার মাঝখানে সুধীর হয়ত তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল না।

এবার সমস্ত চাষী প্রায় একসঙ্গেই যুক্ত কর কপালের দিকে তুলিয়া সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "পেন্নাম দা ঠাকুর।"

এতক্ষণে যেন সুধীরের মধ্যে কিছুটা ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। যে জনতাকে এখানে আসিয়া অবধি সে একটিবারও চোখে দেখিতে পায় নাই, সেই জনতা যে এত বিপুল—বিরাট আর ইহারা যে সকলে সৌদামিনীরই ইঙ্গিতময় কর্ম্মপন্থী, এই কথাটা ভাবিতে যাইয়াই সুধীরের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। একরকম মৌন অভিনন্দনই পাইল বটে সে তাহাদের কাছে। কহিল, "জয় হোক্ তোমাদের।" তারপর একসময় সৌদামিনীর সঙ্গে ধীরে ধীরে আবার সে বাসায় ফিরিল।

সারা বাড়ীময় এতক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন পিসীমা সৌদামিনীকে। কাছে পাইয়া এবারে যেন একরকম মারমুখো হইয়াই উঠিলেন : "বলি তোর আক্কেলখানা কি মিনি, বল্

দিকি? ভর সন্ধ্যেয় সারা বাড়ীতে চীৎকার ক'রে মরি, আর তুই দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিস! কোথায় গিয়েছিলি শুনি!"

উত্তরটা সুধীরই এবারে দিতে গেল, কিন্তু পারিলনা; বাধা দিয়া সৌদামিনী কহিল, "তুমি যেন দিন-দিন খুকী হ'চ্ছ পিসীমা। যাব আবার কোন্ চুলোয় ম'রতে? দিব্যি হাওয়া বইছে বাইরে, বেরোনো তো বড় হয় না,—পেয়েছি সুধীর-বাবুকে, তাই একটু ঘুরে এলাম মাঠ আর খালের ধার দিয়ে।"

এবারে যেন প্রাণে অনেকখানি বল পাইলেন পিসীমা। হাসিয়া কহিলেন, "ও—তাই বল! সুধীরের সঙ্গে তবে বেরিয়েছিলি? আমি ভেবেছিলাম, সুধীর বাজারে-টাজারে কোথাও গেছে, তুই বুঝি একাই কোথাও গেলি! সোমত্ত বয়স, ভয় কার না হয় বাপু?"

সৌদামিনী চুপ করিয়া গেল, কিন্তু বৌদির কথা শুনিয়া সুধীর এবারে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, "তোমার তো তা' হ'লে বড় কম দুর্ভাবনা নয় বৌদি! কিন্তু জানো তো, বাসুকীরও যৌবন আসে, সেই যৌবনের রূপে মোহ জাগে না, জাগে বিষাক্ত জ্বালা। তোমার এই মা-টিও তাই। ওঁকে দিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই বৌদি, ওঁর তো রূপের পাখা নেই, আছে বিষদাঁত।"

খানিকটা যেন কথার সূত্র খুঁজিয়া পাইল সৌদামিনী, ঈষৎ টিপ্পনি কাটিয়া কহিল, "সম্ভবতঃ কোনোদিন আপনার সাহিত্য

প'ড়বার অভ্যাস ছিল সুধীর বাবু; তাই দেখ্‌চি—কথায় বেশ রং দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারেন। কিন্তু পিসীমা ওতে ভুল্‌বার পাত্রী ন'ন্‌।" বলিয়া আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে সে অপেক্ষা করিল না, সম্ভবতঃ রান্না ঘরের দিকেই সরিয়া গেল।

কিন্তু পিসীমা এতক্ষণ যেন মনে মনে অনেকখানি কৌতুক বোধই করিতেছিলেন। সৌদামিনীকে লইয়া সংসারে কি তাঁহার কম চিন্তা? কারণে অকারণে দিনরাত মুখে শুধু মথুরের কথা, অথচ মথুর ফেরারী। বেশ তো, মথুরকে না হয় মনেই ধরিয়াছিল সৌদামিনীর, ভাবও হইয়াছিল না হয় যথেষ্ট, কিন্তু অতি 'বাড়' কোনো কিছুরই ভাল না। সুধীরই কি ছেলে খারাপ? পাত্র হিসাবে দেখিতে শুনিতে এবং অবস্থায় সে কম কিসে? জানাশুনা আত্মীয় পরিচিতের মধ্যে শুভ কাজ হইয়া যাওয়াই তো মঙ্গল। সুধীরকে এখানে আনিবার ইহাও একটা কারণ বটে। ভাইঝি আর দেবর—সম্পর্ক তেমন কাছাকাছি তো কিছু নয়, ভগবানের ইচ্ছায় চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। এই আশা লইয়াই সুধীর আসিবার পর হইতে পিসীমা বুক বাঁধিতেছেন। সুধীরের সঙ্গে সৌদামিনী কোথাও বাহির হইলে পিসীমা তাই বরং আশ্বস্তই হন্; তবু যদি তেমন কিছু একটা ভাব জমিয়া ওঠে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি অনেকখানিই প্রগতিবাদী বৈ কি? স্বল্পকাল থামিয়া কহিলেন, "মিনিটা বড় তর্ক শিখেছে আজকাল, ঠাকুরপো। মথুর ওর মাথাটা একেবারে খেয়ে দিয়ে গিয়েছে।" পুনরায় একবার থামিয়া

গলাটা ঈষৎ খাঁকারি দিয়া বলিলেন, "তবে কি জানো ঠাকুরপো, বুদ্ধিতে ওর সাথে তুমি এঁটে উঠ্‌তে পারবে না। এই মেয়ে আমাদের ঘরে ব'লে কদর পেলো না, তেমন ঘরে জন্মালে ও মাথার মণি হ'য়ে থাক্‌তো সকলের। নিজেই বকি মাঝে মাঝে, নিজেই আবার দুঃখে ম'রে যাই নিজের মধ্যে।"

কথার মধ্যে এ-কুল ও-কুল রক্ষা করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত দুই কুলেরই মাঝামাঝি চাপে পড়িয়া নিজের অলক্ষ্যেই একসময় থামিয়া পড়েন পিসীমা। সুধীরের কাছে তাহা অজ্ঞাত থাকে না। এমন সব মুহূর্ত্তে অনেক সময়ই সে চুপ করিয়া থাকিয়াছে, এবারেও থাকিল।

এম্‌নি করিয়াই এ বাড়ীতে তাহার কিছুদিন আগাইয়া গেল।...

চাষীরা এখন আর নিষ্ক্রিয়ভাবে কেহ বসিয়া নাই। অনেক অগ্রসর হইয়াছে তাহারা কথায় এবং কাজে। ইতিমধ্যে একদিন একটী নতুন জিনিষ ঘটিয়া গেল গ্রামে। কলিকাতা হইতে একদল নৃত্য-গীতিকুশল আসিয়া আসর জমাইল গ্রামে। নানা ভাবের নানা গান—নানা কথা, কথাও শাদা কথা নয়, ছড়ায় বাঁধা সরকারী প্রচার: 'ভ্রমণ কমাও', 'জাপানকে রোখো', 'অধিক শস্য ফলাও'। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামে প্রচার-পত্রের ছড়াছড়ি দেখা গেল। গান শুনিল, নাচ দেখিল

চাষীরা, কিন্তু ভাষা বুঝিল না। আড়ালে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইয়া দিল বিপিন মুদী, কহিল, "পাটের দিকে এখন আর সরকারের ঝোঁক নেই, ধান চাই—ধান, বেশী কোরে বীজ বোনো, বেগুন পটল আর আলু ফলাও, দেশকে রক্ষা করো। ওদিকে জাপানী বোমার ভয়, যাতায়াতের অসুবিধা রেলে, অতএব ঘরে ব'সে হেঁসো শানাও আর তল্লা বাঁশ দিয়ে কামান তৈরী ক'রে রাখো।"

কথার শেষের দিকে কিছুটা কৌতুকের আভাসই আছে বটে, কিন্তু সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া চাষীদের কেহ কেহ কহিল, "এতদিন গাঁয়ের জমিদার তালুকদার মহাজনেরাই চাষের সুযোগ দেছেন যথেষ্ট, এখন বাকী আছেন সরকার।"

কিন্তু এই পর্য্যন্তই। বিপিন মুদী ইহা লইয়া আর কথা বাড়াইতে গেল না। পাঁচজনকে লইয়া তাহার কাজ-কারবার, কি বলিতে শেষ পর্য্যন্ত কি বলিয়া বসিবে, তাহার চাইতে অঙ্কুরেই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া ভালো। কহিল, "সত্য যা, তাই ব'ললাম। এখন নিজেরা বুঝে দেখ, কি ক'রবে!"

চাষীরা সরিয়া আসিল।

ঘটনাটি সৌদামিনীর কাছেও যে চাপা রহিল, তাহা নয়; সুধীরকে পাঠাইয়া বিষয়টা আরও পরিষ্কার ভাবে জানিয়া লইল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ও বড় কম জানিতে হইল না তাহাকে। ঐ নৃত্য-গীতিকুশলদের মতো আর একটি সম্প্রদায়ও কয়েকদিনের মধ্যে আসিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছে; টিনের

চোঙ্গা ফুঁকিয়া জাপানকে রুখিতে দল গড়িতেছে, আর তোড়ের মুখে কংগ্রেসের অভিযানকে 'বুর্জ্জোয়া পলিটিক্স' বলিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিতেছে গভীর শ্লেষে। অথচ কংগ্রেসের নিঃস্বার্থ আত্মাগুলি ততক্ষণে করাগারের নিভৃত প্রকোষ্ঠে পচিয়া দগ্ধ হইতেছে; আর যে-জাপানের বিরুদ্ধে এত সাজ-সরঞ্জাম তাহাদের, সেই জাপানীদের বোমা যখন ডালহৌসী, হাতীবাগান আর খিদিরপুরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন তাহাদের অস্তিত্বও দেখা যায় নাই সেখানে। এখনও আক্রমণ চলিতেছে মণিপুরে, ভিজাগাপট্টমে আর কক্স্‌বাজারে। সেখানে হয়ত তাহাদের কণ্ঠ একেবারেই নিষ্প্রভ,—চোঙ্গা বাজিতেছে এই দিকে—যেখানে ফাঁকা মাঠে বাঘ নাই।—হাসিয়া উঠিল একবার সৌদামিনী।

সুধীর বলিল, "কি ব্যাপার, খুব যে হাসচেন বড় ?"

সৌদামিনী কহিল, "নরম মাটি বাংলাদেশের, যা কিছু পোঁতা যায়, দেখতে দেখতে তর-তর ক'রে গজিয়ে ওঠে। অথচ দেশের মানুষ চেয়ে দেখে না—যা কিছু গজালো, সেগুলো আসল গাছ, না আগাছা। এই কথা ভেবেই হাস্‌চি।" তার-পর থামিয়া বলিল, "চোঙ্গার আওয়াজ পাচ্ছেন না পথে ?"

"ও—তাই বলুন।" সুধীর কহিল, "আমি কিন্তু জাম্‌সেদ-পুরে থাকতেই আগে থেকে ওদের টের পেয়েছি। ভেবেছিলাম, বোধ হয় শুধু সহরের দিকেই ওদের দৃষ্টি; গ্রামে কোনো কাজ নেই। এখন দেখচি—এখানেও তবে এসেছে।"

সৌদামিনী কতকটা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ওদের 'এই নীতিকে কি আপনি কখনো বরদাস্ত ক'রতে পারেন সুধীর বাবু ?"

উত্তর দিতে গিয়া প্রথমটা কিছুক্ষণ থামিল সুধীর, পরে কহিল, "নীতিকে বরদাস্ত ক'রবো না— এ' কথা ব'ললে অন্যায় হবে, নীতি কথাটা আদর্শবাচক ; বিচার ক'রতে হবে রীতি নিয়ে—যে রীতিটা ওদের সত্যিই হয়ত আজ দেশের দিক দিয়ে বিপরীতধর্ম্মী।"

"এর মধ্যে এখনও আপনি তা হ'লে 'হয়ত' ব'লে সন্দেহ রাখচেন ?" সৌদামিনী অনেকটা যেন জ্বলিয়া উঠিল নিজের মধ্যে !—"যে আগষ্ট-বিপ্লব শুরু হ'য়েছিল সারা দেশ জুড়ে, তাকে ব্যাহত ক'রেছে এই এরাই। সরকারের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালো এরা, ব'ললো—'বৃটেনের সাথে রুশের নয়া চুক্তি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ খুলে দিলে। সরকারের সাথে এরা তাই আপোষে চ'লেছে।' অথচ এই চলা যে আগষ্ট বিপ্লবকে কতখানি লঘু ক'রে দিলো—একবারও তারা ভেবে দেখলো না। দেশ এখনও এদের চলা-পথ খুলে রেখেছে। ধিক্ মানুষকে।"

সুধীর একথার প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর কিছু একটাও করিতে পারিল না। শুধু দির্ব্বাকদৃষ্টিতে বহুক্ষণ ধরিয়া সৌদামিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বহু নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছে সে জীবনে, কিন্তু সৌদামিনীর মতো এমন নারীকে দেখিল সে

এই প্রথম ! শুধু রূপে নয়, কথায়, জ্ঞানে এবং তথ্যে মিলাইয়া সৌদামিনী যেন মূর্ত্তিমতী ভারতী। তাহাকে দেখিয়া শুধু প্রেম জাগে না, শ্রদ্ধাও আসে মনে। জীবনকে ফলবান করিয়া তুলিতে হইলে এমন নারীর সংস্পর্শ ই যে একান্ত প্রয়োজন। এতদিন নিজে যেটুকু দেশের কাজ করিয়াছে সুধীর, তাহা যে কত তুচ্ছ ছিল, সৌদামিনীর সান্নিধ্যে আসিয়া সেই কথাটাই আজ বার বার মনে হইতেছে তাহার। বৌদির সেদিনকার কথাও একবার মনে হইল সুধীরের,—সৌদামিনীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : 'এই মেয়ে আমাদের ঘরে ব'লে কদর পেলো না, তেমন ঘরে জন্মালে ও মাথার মণি হ'য়ে থাকতো সকলের।' মিথ্যা নয় কথাটা। সৌদামিনীর জন্যে এই ঘর বা এই গ্রাম নয়, বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে ওর স্থান হইলে আর তেমন বিপ্লবী কোনো ঘরে ওর জন্ম হইলে আজই হয়ত সংবাদপত্রের কোনো বিশেষ পাতায় বিশেষ কালিতে চিত্র প্রকাশ পাইত সৌদামিনীর, সারা দেশ শ্রদ্ধা নিবেদন করিত তার বিপ্লবী এই নারী-সত্তাকে। সুধীরের জীবনে যদি সৌদামিনীর আবির্ভাব সত্যিই সম্ভব হয়, তবে সে সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়াও একবার সেই পরম দুঃখের পথে বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে সৌদামিনীকে, নিজেকে নানারূপে খুঁজিয়া পাইবে সে তাহার মধ্যে।—নিজের মধ্যে যেন সমস্ত কথা হারাইয়া ফেলিল সুধীর। তার সেই নির্ব্বাক দৃষ্টিতে একদিকে যেমন কামনার প্রলেপ,

অন্যদিকে তেম্‌নি একটা অদ্ভূত শ্রদ্ধার বিচ্ছুরণ অনুভূত হইল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখচেন অমন ক'রে ?"

আত্মসম্বৃতাবস্থায় ইতস্ততঃকণ্ঠে উত্তর করিল সুধীর, "কিছু না।"

কিন্তু সৌদামিনী নির্ব্বোধ নয়, সুধীরকে গোড়া হইতেই সে চিনিয়াছে ; কহিল, "বড় ভাবপ্রবণ আপনি সুধীর বাবু। বস্তুতান্ত্রিক জগতের আঘাত হয়ত তেমন ক'রে জীবনে আসে নি, তাই এই জড় পৃথিবীর কথার মধ্যে মাঝে মাঝেই মন দূর-প্রসারী আকাশের দিকে চ'লে যায়। ওদের মতো আপনারও কিন্তু এ রীতিটা বড় বেশী ভাল নয়, তাতে দুঃখ পাবার সম্ভাবনা আছে।"

লজ্জা দিল কথাটা সুধীরকে। আঘাতও পাইল বড় মনে মনে কম নয়। সত্যিই হয়ত তবে তার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছে সৌদামিনী ! তাহাতে অবিশ্যি আনন্দই ছিল, কিন্তু যে কথাটা নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সৌদামিনীর মুখে শুনিতে হইল, ইহার জন্য যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না সুধীর। কিছু একটা বলিতে যাইয়া সহসা যেন নিজের মধ্যেই এবারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল সে।

সৌদামিনী কহিল, "মথুর যদি কাছে থাক্‌তো, তবে দেখতে পেতেন সুধীর বাবু, অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও তার কত গভীর দৃষ্টি আর নিষ্ঠা! আপনার কাছে আমার তাই তো একান্ত

অনুরোধ, আর একটু বস্তুবাদী হ'ন। কেমন ক'রে দেশ অনাচারে ডুবে যাচ্ছে, দেখছেন না? আপনার মধ্যে আমি সত্যিকারের কাজের মানুষ খুঁজে পেতে চাই। এতদিন নিজের মধ্যে একা বিষিয়ে ছিলাম, পিসীমার কথাই ছিল সর্ব্বজয়ী: মথুর চ'লে যাবার পর থেকে বাইরে পা ফেলবার পথ পাই নি। আজ আপনি এসেছেন, আপনি সহায় হ'ন আমার কাজে, আর কাজ করুন আপনি নিজেও। এমন সময় আর সুযোগ হয়ত জীবনে আর আসবে না।"

এবারেও কিছু একটা উত্তর করিল না সুধীর, অন্ততঃ উত্তর করিতে পারিল না সে। এখানে আসিয়া অবধি ইতিমধ্যে মথুরের সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই একরকম শুনিয়াছে সুধীর, কিন্তু তবু যেন এই মুহূর্ত্তে অনেকখানিই বিষাইয়া উঠিল সে নিজের মধ্যে। কথায় কথায় সৌদামিনীর মুখে শুধু মথুরের তুলনা, মথুরকে টানিয়া না আনিতে পারিলে যেন সৌদামিনীর কোনো কথাই সম্পূর্ত্তি পায় না! তার সমস্তখানি হৃদয় জুড়িয়া আছে মথুর। সেই হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশের বৃথা চেষ্টা সুধীরের। এতদিন যে মোহে সে জড়াইয়া ছিল, তাহা নিতান্তই অলীক আলেয়ার মোহ মাত্র। জবাব একরকম তার মিলিয়াছেই বৈ কি সৌদামিনীর কাছে; কথা প্রসঙ্গে পরিষ্কারই তো সে একরকম বলিয়াছে: 'ওদের মতো আপনারও কিন্তু এ রীতিটা বড় বেশী ভাল নয়, তাতে দুঃখ পাবার সম্ভাবনা আছে।' অথচ এই কথাটা সুধীর কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না—প্রণয়-

জগতের সাথে কর্ম্ম-জগতের দ্বন্দ্ব কোথায়? দুইটাই তো আশক্তি, দুইটার মধ্যেই তো আত্মবিসর্জ্জন! বিঘ্ন বা সংগ্রাম সেখানে কোথায়?—কিন্তু এ-কথাটুকু সৌদামিনীকে বুঝাইবার মতো তাহার ভাষা নাই। ভাষা এখানে পীড়িত, দীর্ণ, মৃত্যুমন্থর।

কিছুক্ষণ নিজের মধ্যেই ভাববিহ্বল অবস্থায় বসিয়া রহিল সুধীর, তারপব অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "যে ক'দিন এখানে আছি, তার কোনো একটি মুহূর্ত্তেই আপনার কাজের সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজেকে অন্ততঃ পীড়া দেবো না মিনি দেবী,—এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিচ্ছি। তারপর ধরুন, নিজেরও তো কাজ আছে। জাম্‌সেদ্‌পুরে নতুন এক পার্টনারের সাথে ব্যবসা খুলেছি কিছুদিন হ'লো, সে কথা অবশ্য এখানে বৌদি জানেন না। কিন্তু শীগ্‌গিরই যখন আবার এখান থেকে বিদায় নিতে হবে, তখনই তাঁকে জান্‌তে হবে। আপনাকে যে মূর্ত্তিতে এখানে এসে দেখতে পেলাম, তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।"—অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চপিয়া নিল' সুধীর নিজের মধ্যে।

সৌদামিনী হাসিয়া কহিল, "কেন, এমন কি বিচিত্র মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছি যে, হঠাৎ বড় বেশী চোখে প'ড়লো আপনার?"

"সে বৈচিত্র্য মূর্ত্তিতে নয়, বিচিত্র আপনি নিজেই।" সুধীর কহিল, "মনের মূর্ত্তিটাই যে সব চাইতে বড়, মিনি দেবী!"

"কি রকম?"—জিজ্ঞাসুকণ্ঠে দৃঢ়নেত্রে একবার তাকাইল সৌদামিনী সুধীরের চোখের পানে।

কিন্তু কেন যেন সুধীর কথাটা বড় বেশী খুলিয়া প্রকাশ

করিতে পারিল না। শুধু বলিল, "বৌদির মুখে শুনেছি, বুদ্ধিতে আপনি প্রজ্ঞা-ভারতী, নিজেও তো দেখলাম এ' ক'দিনে, তাই ঐ 'রকম'টা একসময় আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।" বলিয়া আর অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া কোথায় একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সৌদামিনী একই অবস্থায় স্থাণুর মতো বসিয়া রহিল!

দুর্ভিক্ষে অনেকখানি বাঁচিয়া গিয়াছে বারোখাদা। বাঁচাইয়াছে তাহাকে চাষীরাই। অনুপ্রেরণা দিয়াছে তাহাদের সৌদামিনী, আর দলকে গঠন করিয়াছে করিম শেখ। সারা বিশ্বের অভ্যুত্থানের দিনে বারোখাদার গণ-দেবতাও আর শিলা-স্তূপে সুপ্ত রহিলেন না, নিদ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলেন বিপুল বিজয়ে। করিম শেখের দল আজ আর শুধু হাল চষিয়া ফসল উৎপন্নই করে না, প্রয়োজন হইলে সম্মুখ-যুদ্ধে নিরস্ত্র করিতে পারে শত্রুকে। সমগ্র ভারতবর্ষের সকল চিন্তায়, সকল বিত্তে আর মুখের গ্রাসে সেই শত্রুর বাসুকী-শ্বাস আসিয়া লাগিতেছে প্রতি মুহূর্ত্তে। তাহার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে তিলে তিলে জন্ম নিতেছে গণ-সন্তানেরা—করিম শেখের দলের মতো হাজার হাজার মানুষ। বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে চাহিয়া থাকিতে হয় তাহাদের পানে।···

কিছুদিন হইতে আরও একটা বিষয় লইয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছিল ভিতরে ভিতরে।

এতদিন ষ্টেশন ঘরটার পুনর্সংস্কার ও ষ্টেশনে ট্রেন থামিবার অভাবে লোকের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। বিশেষ করিয়া

বিপদ হইয়াছিল তাঁহাদেরই—প্রতিদিন এখান হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া যাঁহাদের 'দশটা-পাঁচটা' আপিস করিতে হয় যাইয়া সদরে। ষ্টেশন ঘরে আগুন লাগিবার পর হইতে দেড়ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া আগের ষ্টেশন শিবরামপুরে যাইয়া গাড়ী ধরিতে হইয়াছে তাঁহাদের। কোনোদিন বা গাড়ী পাইয়াছেন, কোনোদিন বা প্লাটফর্ম্মে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। চাকুরী রক্ষার জন্য মা কালীর দুয়ারে কলা-বাতাসা মানত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন আপিস-বাবুরা। বিশেষভাবে তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ উদ্যোগী হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান আর স্বনামখ্যাত কোনো কোনো উকীল-ডাক্তারের সুপারিশ-পত্র আনিয়া কপি করিয়া পাঠাইয়াছেন এ্যাসেমব্লীতে আর রেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে। কৈলাস চক্রবর্ত্তী এ-পর্য্যন্ত লেখালেখি করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিভিন্ন সুপারিশ পত্র সহ এক-সহযোগে আর্জ্জি পেশ করিয়া লিখিলেন: "যে কারণেই হউক্ এবং যাহাদের জন্যই হউক্, দীর্ঘকাল হয় এখানকার ষ্টেশনঘর পুড়িয়া গিয়াছে। সেই হইতে এখানকার স্থানীয় লোকের দুর্ভোগের অন্ত নাই। আপ্ এ্যাণ্ড ডাউন—কোনো গাড়ীই আজ আর ষ্টেশনে থামে না। মাল সরবরাহের পথও বন্ধ। এইদিকে দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে ইহার সুচারু কার্য্যব্যবস্থা না করেন, তবে কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতার পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসী যথাযথ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।"

ইহার পরে আর পক্ষকালও কাটিল না। রেলকর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন নতুন করিয়া ষ্টেশনঘর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল—আগামী মাসের পয়লা হইতে পুনরায় যথানিয়মে ষ্টেশনে গাড়ী ভিড়িবে।—প্রাণে জল পাইল আবার গ্রামবাসী।

কিন্তু দেখা গেল—এই সুকৃতির কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তীই। চাকুরীটা তো তাঁহার এইখানে টিকিয়াই গেল, উপরন্তু অধিকতর মোড়লীপনায় যেন বড় বেশী নাচিয়া উঠিলেন তিনি। ছট্টু মান্নাকে কাছে পাইয়া কহিলেন, "জানো হে ছট্টু, কম ঝামেলা কি পোহাতে হ'লো এই নিয়ে! এখন লোক লাগিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে ফেলতে হয়। তোমাকে তো এখন এদিকটায় মন না দিলে চলে না!"

ছট্টু মান্না অমত করিল না, কহিল: "তা—মন দেবো বৈ কি মাষ্টারবাবু! তবে অধীনের একটা আর্জ্জি আছে, দয়া ক'রে এবার থেকে আর ষ্টেশন-ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা ক'রবেন না। ও-কথা ভাবতে গেলেও এখন গা কাঁপে!"

বিন্না ঘাসের মতো খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসিয়া কৈলাস চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তুমিও যেমন ছট্টু! অতি-বাড় বেড়েছিল ঐ মথুর ছোক্‌রা, গভর্ণমেণ্ট ঠুকেও রেখেছেন তেমনি ক'রে। এরপরেও কিছু ক'রতে সাহস আছে নাকি গ্রামের কারুর! তোমার কোনো ভয় নেই ছট্টু।"

প্রত্যুত্তরে ছট্টু মান্না আর কিছু একটা বলিতে গেল না।

কাজ সুরু হইল।—আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল ষ্টেশন ঘর। আবার আসিয়া গাড়ী থামিল ষ্টেশনে: আপ্ এ্যাণ্ড্ ডাউন গাড়ী। টিকিটের কাউন্টারে দাঁড়াইয়া কৈলাস চক্রবর্ত্তীর সারা মুখের উপর একটা কঠিন বিদ্রূপের দৃষ্টি বুলাইয়া নিয়া টিকিট-হাতে আসিয়া গাড়ীতে চাপিলেন আপিস-বাবুরা।—ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিল ষ্টেশনে।

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পিসীমার পাশে বসিয়া সুধীর একসময় কহিল, "বাজারের অবস্থা তো এখন একরকম শান্ত হ'য়েই এসেছে, কণ্ট্রোলে দর বেঁধে দিয়েছেন সরকার। আতপ চাল সম্পর্কে অনেকখানি সন্দেহ ছিল, তা নিয়েও এখন আর ভাবতে হবে না। এবারে আমি ছুটি চাই বৌদি।"

শুনিয়া পিসীমা যেন রীতিমত আকাশ হইতেই পড়িলেন। কহিলেন, "সে কি ঠাকুরপো, এরই মধ্যে তুমি চ'লে যাবে? দু'দণ্ড ব'সে একটাও তো ভালো ক'রে কথা বলি নি কোনো-দিন। কতকাল পরে দেখা, তাও তো খবর দিয়ে এনেছি আমাদেরই প্রয়োজনের খাতিরে। কোনো রকম লজ্জা রাখি নি, নইলে এসে অবধি যে কষ্টটা তুমি ক'রলে, তা কেউ কোনো দিন করে না।"

"অতিরিক্ত ব'লে ব'লে আমাকে শুধু লজ্জা দিচ্ছ তুমি বৌদি। আমি কি বাইরের লোক যে, কষ্টের কথা তুলে ঋণ

বাড়াতে চাচ্ছ' ?" স্বল্প থামিল সুধীর, তারপর পুনরায় কহিল, "যদি সম্ভব হ'তো, তবে সারা বছরটাই তোমার এখানে থাক্‌তে কোনো আপত্তির কারণ ছিল না! নিতান্ত তো আর বেকার ব'সে সেই, টুক্‌টাক্ কাজ-কারবার ক'রছি ; এখন যদি আবার জাম্‌সেদপুরে না ফিরি, তবে ক্ষতির একশেষ হবে।"

পিসীমা কহিলেন, "ও—কিছু একটা নিয়ে তা হ'লে আছো এখন। ভালো, শুনেও আনন্দ পাই, উন্নতি করো তুমি।" তারপর এদিক-ওদিক কিছুটা ইতস্ততঃ চাহিয়া কি যেন একবার দেখিতে চেষ্টা করিলেন তিনি, পরে কহিলেন, "তা—বয়স তো হ'লো ঠাকুরপো ভাই, সংসারী হচ্ছ' কবে ?"

এবারে কিছু একটা জবাব দিতে যাইয়া অনেকখানি বিপদেই পড়িতে হইল বটে সুধীরকে। এতদিন সংসার পাতিবার দিকে বড় বেশী মন দেয় নাই বটে সুধীর, কিন্তু মনে একসময় নিজে হইতেই যখন তেমন কিছু একটা ভাবের স্ফূরণ দেখা দিল, তখনও ঠিক্ অনুকুল আবহাওয়া পাইল না সে। কহিল, "সংসার পেতে বসা বড় ঝামেলা বৌদি, ও ঠিক পোষায় না ; আর তা ছাড়া তেমন পাত্রীই বা কোথায় ?"

পিসীমা কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না, বলিলেন, "ওমা, এ কি ব'ল্‌ছো তুমি ঠাকুরপো ভাই, বাংলা দেশে আবার পাত্রীর অভাব কবে ?"

সুধীর কোনোরকম সঙ্কোচ করিল না, অনেকটা দৃঢ়কণ্ঠেই

কহিল, "পাত্রী ব'লতে কি তুমি শুধু স্থূল একটি মেয়েকেই বোঝো? তেমন মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতে আনন্দ নেই বৌদি। যে রকম মেয়ে চাই, অন্ততঃ যে রকম মেয়ে আমাদের ঘরে না এলে শুধু সংসারটাই নয়, মূল জীবনটাই বিষময় হ'য়ে ওঠে, তেমন সর্ব্বগুণসম্পন্না আদর্শ মেয়ে সত্যিই আমাদের সমাজে খুব বেশী নেই। আর—নেই ব'লেই ওদিকটায় বড় চিন্তা করি নি আজ পর্য্যন্ত।"

পিসীমা একরকম উচ্ছ্বাসের মুখেই স্বর অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া কহিলেন, "আছে ঠাকুরপো আছে, তেমন মেয়েরও অভাব নেই। কেন, আমাদের মিনি কি কিছু একটা অযোগ্যা? ওকে কিম্বা ওর মতো আর কোনো মেয়েকে পেলেও কি তুমি ও-কথা ব'লবে?"—তিল তিল করিয়া নিজের সুপ্ত মনের মধ্যে এতদিন যে-কথার অঙ্কুরকে তিনি জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, অবস্থার চাপে পড়িয়া প্রয়োজনের খাতিরেই উচ্ছ্বাসের মুখে আজ তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইল পিসীমার। ইহাতে কোনোরূপ দ্বিধা বা লজ্জা আসে নাই তাঁহার।

কিন্তু সুধীর যেন এবারে অনেকখানি বদ্‌লাইয়া গেল। সারা মুখের উপরে কেমন যেন একটা কালো রং খেলিয়া গেল তাহার। পিসীমা সেটুকু ধরিতে পারিলেন কিনা জানি না। বহুক্ষণ নিজের মধ্যে ভাববিহ্বল অবস্থায় বসিয়া রহিল সুধীর, তারপর একসময় অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "তেমন মেয়ে পেলে সত্যি যে কি ক'র্‌তাম, তা অবিশ্যি জানি না বৌদি, তবে

তোমার ঐ মিনি মা'টির কথা টেনে এনে নিতান্তই লজ্জা দিচ্ছ' আমাকে তুমি।"

"কেন, ওকে পেলে তুমি সুখী হও না?" বার্দ্ধক্য-শিথিল চোখ দুইটার দৃষ্টিকে একবার দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন পিসীমা সুধীরের চোখের দিকে।

সুধীর বলিল, "সুখী হয় তো হই, কিন্তু সংসার পেতে ব'সতে পারি না। উনি শুধু নারায়ণী ন'ন্, বিপ্লবী; ওঁকে সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধা দু'টোই করি। এ সম্বন্ধে আর কিছু ব'লতে চেয়ো না বৌদি, তা হ'লে আমাকে অপ্রস্তুত হ'তে হবে।"

কথা শুনিয়া পিসীমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া সহসা কেমন যেন একটা শিহরণ খেলিয়া গেল! এম্‌নিতর কিছু একটা অবস্থার জন্য যে আদৌ তিনি প্রস্তুত ছিলেন না! এ যে একান্তভাবে তাঁহারই পরাজয়! এই পরাজয়ের মধ্যে লজ্জা নাই, কিন্তু দুঃখ আছে, দাহ নাই, কিন্তু আগুন আছে। সৌদামিনীর বিপ্লবী চরিত্রটাই তবে প্রস্ফুট গোলাপের মতো মুঞ্জরিয়া উঠিল, সংসারধর্ম্মে তাঁহার নারীত্বটা তবে কিছু নয়! কি যেন একবার বলিতে গেলেন পিসীমা, কিন্তু পারিলেন না। ঠোঁট দুইটাই শুধু কথার ভারে কেবল কাঁপিতে লাগিল।

সুধীর আর অপেক্ষা করিল না। চিরকালের স্বভাবই তাহার কতকটা অদ্ভুত: অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং খাম-খেয়ালী। জামসেদ্‌পুরের স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় নিশান ঘাড়ে বহিয়া শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে। কখনও কোনো

সময় ব্যক্তিত্বকে আঘাত করিয়া কোনো কথা উঠিলেই নির্ব্বিবাদে শিশু-বালকের মতো ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে সুধীর, আর বড় সেদিকে গা মাথায় নাই। এম্‌নি ধরণেরই অনেকটা শিশু-চপলতায় সে গঠিত। নিজের স্বাভাবিক গতি যেখানেই কোনো কারণে বাধা পাইয়াছে, বৃথা সৌজন্যের বালাই লইয়া সেখানে আর একমুহূর্ত্তও কাল অতিবাহিত করিতে সে নারাজ! এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ধীরে ধীরে বিছানাপত্র বাঁধিয়া একসময় রওনা হইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল সুধীর।

পিসীমা চেষ্টা করিয়াও বাধা দিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে স্থিরই বুঝিয়া নিলেন যে, বাধা দিলেও সে-বাধা টিকিবে না। যাত্রার পূর্ব্বে শতবার মঙ্গল কামনা করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে শেষবারের মতো তিনি শুধু কহিলেন, "এতদিন কাছে থেকে যে আনন্দ দিয়ে গেলে ঠাকুরপো ভাই, তার পরিমাপ করা কঠিন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও, মঙ্গল হোক তোমার। আবার যদি কখনো বিপদে পড়ি, তখনো ঠিক তোমাকে এমনি ক'রেই স্মরণ ক'রবো, সেদিনও যেন আবার এমন সহজ ভাবেই তোমাকে পাই।"

সুধীর কহিল, "প্রয়োজনের দিনে ডাকলে নিশ্চয়ই আবার কাছে এসে দাঁড়াবো বৌদি। তোমার ডাকে কোনোদিন সাড়া দেবো না, সেও কি কখনো হয়!"

সামনের চৌকাঠে পা বাড়াইতেই সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সকাল হইতে সৌদামিনী আজ ঘরে ছিল

না। ও-বাড়ীর ঠাকুরমা ইদানিং একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। মথুর বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পর হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে মনে দারুণ অশান্তি লইয়া কাটাইয়াছেন তিনি। তাহাতেই একরকম শরীরে ক্ষয় ধরিয়াছিল, তাহার উপর নানা রোগ আসিয়া আজকাল আক্রমণ করিয়াছে শরীরে। প্রায় সময়ই সৌদামিনী যাইয়া কাছে বসিয়া আসে। আজও সারাটা সকাল ঠাকুরমার শিয়রে বসিয়া কাটাইয়া এতক্ষণে তবে ফিরিতে পারিয়াছে সে। সুধীরকে তাহার এই বেশে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল সৌদামিনী। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "হঠাৎ না জানিয়ে না শুনিয়ে এমন ক'রে রওনা হবার মানে কি, ব'লতে পারেন সুধীরবাবু ?"

আজ আর সুধীর কোনোরকম দ্বিধা করিল না, বলিল, "সকাল থেকে তো আপনাকে আর কাছে পাই নি, বাধ্য হ'য়ে বৌদির কাছ থেকেই ছাড়পত্র নিয়েছি। এখন তো হাঙ্গামা একরকম অনেকটা চুকেই গেছে, মিছেমিছি ব'সে থেকে আর কি হবে! তা ছাড়া নিজেও কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দীর্ঘদিন দূরে প'ড়ে আছি, এটা নীতির দিক দিয়ে নিজের কাছেই বড় ভাল লাগছে না। দু'দিন আগে আর পরে—এই যা ; নইলে এই যাওয়া তো একদিন যেতেই হ'তো! বরং যাত্রাকালে দেখা হ'য়ে গিয়ে ভালই হ'লো, নইলে অনেকখানি পরিতাপ থেকে যেতো।"

"কিন্তু প্রতিশ্রুতি আপনার এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?"

সৌদামিনী কহিল, "একা ঠিক যে-কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারি না, আপনি তাতে সাহায্য ক'রবেন, এই না কথা দিয়েছিলেন ? এত তাড়াতাড়ি সে সাহায্য ফুরিয়ে গেল ?"

সুধীর বলিল, "এখানে মেয়াদ ছিল যতদিন, একটুও কার্পণ্য করি নি। জানি, আপনার কাজের সমুদ্র যেখান দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে—সেখানে আমার সাহায্য অতি সাধারণ একটা বুদ্বুদের মতই, আপনার সমুদ্রের কূল তাতে ভ'রবার নয়। নিজের মধ্যেই নিজে আপনি পরিপূর্ণা, সেখানে সাহায্য বস্তুটা আসলে একটা কথা মাত্র। নিজের পথে আপনি ঠিক নিজেই চ'ল্‌তে পারবেন—এই বিশ্বাস নিয়েই আজ যাচ্ছি।" তারপর থামিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, পরে কহিল, "কখনো যদি নিজের অলক্ষ্যেই কেনো অন্যায় ব্যবহার ক'রে থাকি, তবে যেন তা মনে ক'রে রাখবেন না ; অন্যায় ত্রুটি মানুষেই ক'রে থাকে।"

পিসীমা পাশেই ছিলেন, কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি কথা ব'ল্‌ছো ঠাকুরপো, মিনির কাছে তোমার আবার অন্যায় ত্রুটি কি ? আজকালকার রীতিতে বাবু দেবী ছাড়া মুখে তোমাদের কথা নেই ব'লে, নইলে তোমার আর মিনির মধ্যে এমন সম্পর্ক নয় যে, মিনির কাছে তোমার অন্যায় উল্লেখ ক'রতে হবে !"

সুধীর কিন্তু আসলে সে-কথায় বড় একটা কান দিল না।

সৌদামিনী কহিল, "সম্ভবতঃ যাবার আগে একটা কিছু

ঝগড়া ক'রে যাবেন ব'লেই ঠিক হ'য়ে বেরিয়েছেন, নইলে এমন কথা তুল্‌তেন না। কিন্তু জানি, ঝগড়া আপনি ক'রতে পারেন না, সুনাম রক্ষার ভয় আছে আপনার। আমাদেরই পক্ষ থেকে বরং ব'ল্‌তে হয় যে, যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি অবচেতন ভাবে, তবে তা' নিজগুণে ক্ষমা ক'রে নেবেন। এর পরে আর কথা বাড়িয়ে অপরাধী ক'রবেন না সুধীর বাবু। একবার যখন রওনা দিয়েছেন, তখন আর বাধা দেবো না। শুধু আর একটিবার অনুরোধ ক'রে ব'ল্‌ছি, দেশের কাজে যেন পিছিয়ে থাক্‌বেন না ; কঠিন সমস্যা আজ আমাদের পদে পদে, এখানে ভাবপ্রবণতার ঠাঁই নেই, দুর্ব্বলতার আশ্রয় নেই, আছে কঠিন জ্বলন্ত বিদ্রোহ আর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে আমাদের জীবনে। এই প্রতিশ্রুতি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকে সুধীর বাবু।"

"নিজের মধ্যে যদি কখনো ভুলেও যাই, আপনাকে স্মরণ ক'রেই সেই প্রতিশ্রুতিকে জাগিয়ে রাখবো। গাড়ীর সময় হ'য়ে এলো, এবারে আসি ; নমস্কার।" বলিয়া আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া দ্রুত পায়ে সুধীর ঘর হইতে নামিয়া গেল।

কেমন যেন সহসা একটা নিস্তব্ধ থম্‌থমে ভাব জাগিয়া উঠিল গৃহের চারিপাশে। সৌদামিনী কিম্বা পিসীমা—কাহারও কণ্ঠেই আর একটি কথারও আভাস পাওয়া গেল না। দুইজনের নীরব দৃষ্টিই সুধীরের যাত্রাপথের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ কাটিল—বলা কঠিন। তারপর একসময়

পিসীমা আসিয়া একরকম অকারণেই নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, সৌদামিনীও ঘরের নিভৃতে কোথায় একপাশে গা ঢাকা দিল।

ইহার পর সুধীরকে লইয়া যে বড় একটা কথা হইয়াছে পিসীমার সঙ্গে সৌদামিনীর, এমন নয়। যেমন আকস্মিকভাবেই এ বাড়ীতে সুধীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তেম্‌নি আকস্মিক ভাবেই এ-গৃহ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সৌদামিনী পূর্ব্বেও যেমন ইহা লইয়া কিছু একটা ভাবিতে বসে নাই, এখনও তাঁহার মনের উপর তেমন কিছু একটা রেখাপাত করিল না। আবার পূর্ব্বের মতই যথারীতি দৈনিক সংবাদপত্র, বই আর হেঁসেল লইয়াই তাহার কাটিতে লাগিল। কিন্তু পিসীমার পক্ষে সুধীরকে ভুলিয়া থাকা কেমন যেন বড় তাড়াতাড়ি সম্ভব হইল না। তাহার কতকটা সৌদামিনীকেই কেন্দ্র করিয়া বটে। কথায় কথায় একদিন কহিলেন, "দু'দিনের জন্য এসে কেমন যেন ঘরটাকে একবারে খালি ক'রে দিয়ে গেল সুধীর ঠাকুরপো, তাই না মিনি? অমন ছেলে সত্যিই হয় না।"

কথা শুনিয়া সৌদামিনী একবার হাসিল, কহিল, "হ্যাঁ— বৌদির প্রতি অসম্ভব ভক্তি আছে বটে।"

কথাটার শ্লেষ বুঝিতে পারিলেন পিসীমা, কহিলেন, "শুধু আমার দিকটাই দেখলি মিনি, যাবার আগে তোকেও যে কম শ্রদ্ধা জানিয়ে যায় নি সে। তুই আজকাল কী হ'য়েছিস, বল তো?

বড় বড় চোখ তুলিয়া সৌদামিনী তাকাইল একবার পিসীমার চোখের দিকে। এ দৃষ্টির সঙ্গে বড় বেশী পরিচিত ছিলেন না পিসীমা। সৌদামিনী কহিল, "তেমন কিছু একটা কেউকেটা হ'য়েছি কি পিসীমা ? আজকাল কিছুটা আত্ম-সচেতন হ'তে চেষ্টা ক'রছি, এই মাত্র। এতে তোমার রাগ ক'রবার কী আছে ?'

"না, কিছু নেই।" বলিয়া পিসীমা মুখ ঘুরাইয়া নিলেন ; তারপর আর কিছু একটাও বলিলেন না।

সৌদামিনীও যেন অনেকখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।...

এদিকে মথুরের ঠাকুরমার অবস্থা ক্রমেই শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। একবেলার অন্নপান্ন—তাহাও শেষ পর্য্যন্ত মুখে ওঠা বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পিপাসার মুহূর্ত্তে মুখে জল নিলে তাহা বমি হইয়া যায়। চোখে অনেককাল হইতেই ভাল দেখিতে পাইতেন না, আজকাল একরকম দেখেনই না। উঠিয়া বসিবার শক্তিটুকুও রহিত হইয়াছে ! ফাঁকা বাড়ীতে এই অবস্থায় তাঁহাকে এখন একা রাখা বিপজ্জনক মনে করিয়াই পাশাপাশি দুই এক ঘর প্রতিবেশীর সাহায্যে সৌদামিনী একসময় ঠাকুরমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া আসিল।

রোগক্লান্ত কণ্ঠে ঠাকুরমা কহিলেন , "মিছেই আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচরা ক'রছিস ভাই, আমি আর সত্যিই বাঁচবো না।"

সৌদামিনী মুখে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও

কথা যদি আবার কখনো মুখে আনবে, তবে দিয়ে আসবো পদ্মায় ভাসিয়ে।”

কিন্তু ঠাকুরমা থামিলেন না, কহিলেন, “তাও যদি যেতে পারতাম, তবে .আমার সাত জন্মের পুণ্য হ'তো। কতলোকে গঙ্গায় যায়, এ পোড়া অদেষ্টে তা তো কোনোদিন লেখা নেই, পদ্মায় যেতে পারলেও হাতে স্বর্গ পাই।”

কথা শুনিয়া এবারও সৌদামিনী প্রথমে তেম্‌নি রোষকষায়িত কণ্ঠে কহিল, “স্বর্গ যেন তোমার হাতের মোয়া আর কি, ইচ্ছে হ'লেই যেন মুখে পূরতে পারো। খুব হ'য়েছে, ব'কৃতে হবে না, এখন চুপ কর তো?” তারপর সহসা স্বর একেবারে খাদে অনিয়া মধুর করিয়া বলিল, “ছিঃ ঠাকুরমা, ও কথা কি কখনো ব'লতে হয়? অসুখ হ'য়েছে, দু'দিনেই ভাল হ'য়ে যাবে, সংসারে অসুখ বিসুখ না হয় কার? লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখন একবার ঘুমোও দিকি।”—শিয়রে বসিয়া ঠাকুরমার মুণ্ডিত কেশের উপর দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল সৌদামিনী।

ঠাকুরমার মুখে আর কথা ফুটিল না। কথা বলিবার শক্তিই একরকম লোপ পাইয়াছে তাঁহার। কিন্তু বুকে বুকে তাঁর অনন্ত কথা জমিয়া আছে। প্রকাশের উন্মাদনায় মাঝে মাঝে উত্তেজনা আসে তাঁহার কণ্ঠে; অথচ বাক্‌শক্তিটুকুও দিনে দিনে কাড়িয়া নিতেছেন ভগবান। আজ আর মরিতে তাঁহার এতটুকুও দুঃখ নাই, যদি মরিবার পূর্ব্বে একটিবারও

আবার মথুরকে কাছে পান, ক্ষণিকের তরেও একবার তাহাকে দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে পারেন।···

কয়েকটি রাত্রি কাটিয়া গেল।

গ্রামে শচীন ডাক্তারের বেশ নামযশ ছিল, তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ীই ঔষধ-পথ্য চলিতেছিল। কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিলেন, সাহস করিলেন না আর রোগীকে হাতে রাখিতে। বাধ্য হইয়া সৌদামিনী খবর দিল নিরঞ্জন কবিরাজকে। দিনরাত্রি মিলিয়া মহাকালের আরও কয়েকটি প্রহর কাটিয়া গেল। কিন্তু নাড়ীজ্ঞানে তিনিও যে বড় বেশী রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন, তেমন বোঝা গেল না।

অথচ যিনি বুঝিবার, তিনি সবই বুঝিলেন। বহুক্ষণের চেষ্টায় আর একবার কণ্ঠে স্বর তুলিতে পারিলেন ঠাকুরমা। কহিলেন, "ডাক্তার বৈদ্য ডেকে মিছেমিছি হাঙ্গামা ক'রছিস দিদি। আমার ব্যামো সারবার নয়; তিন কুড়ি বয়স হ'লো, কালে পেয়েছে, এখন যেটুকু সময় শুধু দেহে প্রাণ আছে—সেইটুকু নিয়েই ভাবনা। নইলে ভাব্‌বারই বা আর কি আছে! মথুর একা ফেলে পালিয়ে গেল, সে বেঁচে আছে কি নেই—তাও তো জানলুম না; মনে যে কি অগ্নিকুণ্ড নিয়ে কাটালাম, জানতে তো পারিস নি দিদি, নইলে দেখতিস, বুকের ভিতরটা পুড়ে একেবারে ছাই হ'য়ে গেছে।"—রোগপাণ্ডুর চোখ দুইটি বাহিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল ঠাকুরমার। এ যে কত বড় বেদনার অশ্রু, তাহা ঠাকুরমা ভিন্ন সংসারে আর কে বুঝিবে?

সৌদামিনী প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না। তাহারও দুই চোখ ছাপাইয়া অলক্ষ্যে যেন একবার জল আসিল।

ঠাকুরমা পুনরায় কহিলেন, "আর হয়ত সত্যিই এ সংসারে বেশী দিন নেই আমি। যাবার আগে শুধু তোকে ব'লে যাই দিদি, মথুর যদি সত্যিই আবার কোনোদিন ফিরে আসে, তবে তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলিস, 'তার ঘর সংসার সবই রইল', সে যেন সংসারী হ'য়ে নিজের হাতে সে-সব কিছুকে রক্ষা করে। তুই যেন তার সেই সোনার সংসারকে গুছিয়ে দিয়ে সোনার প্রতিমা হ'য়ে থাকিস দিদি। ডাক এসেছে, খুব বেশী দিন আমি আর নেই ; যাবার দিনে শুধু এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমাকে যেতে দে যে, তাকে দেখবার জন্যে তুই আছিস।"

দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়া সহসা কেমন যেন একটা অননুভূত প্রবাহ বোধ করিল সৌদামিনী। কহিল, "যাবার দিনে এই বিশ্বাস নিয়েই তুমি যেয়ো ঠাকুরমা, শপথ ক'রছি, কোনো দিন এ বিশ্বাসকে ভেঙ্গে আমাকে তোমার কষ্ট দেবো না। আজ আমাকেও তুমি আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরমা।"

ততক্ষণে পিসীমা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছেন।

ঠাকুরমার কণ্ঠে আর বিন্দুমাত্রও স্বর জাগিল না। বুকের ভিতর হইতে মনে হইল, কে যেন তাঁহার কণ্ঠনালীটাকে রীতিমত একটা শক্ত সাড়াশীর মতো সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। অতিকষ্টে তিনি শুধু দক্ষিণ হাতখানি একবার প্রসারিত করিয়া দিলেন। সৌদামিনী তাহা পরম আশীর্ব্বাদের মতই একান্ত

চিত্তে নিজের মাথার উপরে টানিয়া নিল। ঠাকুরমার শব্দহীন লোলচর্ম্মাবৃত ঠোঁট দুইটিকে বারকয়েক শুধু ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিতে দেখা গেল মাত্র ঃ তারপর সব ম্লান, সব শেষ। অনন্ত মৃত্যু-মহাকালের শীতল স্পর্শে সমস্ত কষ্টের লাঘব হইয়া গেল ঠাকুরমার।—দূরে চরমুগরিয়ার বন্দরে পলাতক জীবনের ক্ষীণতম একটি অবসর মুহূর্ত্তেও শ্রীমন্তের ব্যক্তি-সত্তার আড়ালে বসিয়া মথুর ইহা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না। পরমাত্মীয়ের বিয়োগের মতই ঠাকুরমার মৃতদেহের পাশে বসিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে অশ্রু ত্যাগ করিল সৌদামিনী। কিন্তু এত জলও কি সৌদামিনীর চোখে ছিল? মথুরের অশ্রুও যেন বিগলিত ধারায় সৌদামিনীর সেই চোখের জলের সাথে একসঙ্গে প্রবাহিত হইয়া নদী ভাসাইয়া গেল। পিসীমাও চোখের সামনে এতবড় আঘাত সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চোখে আঁচল চাপিয়া তিনিও কোথায় একদিকে সরিয়া গেলেন।

সৌদামিনীর অশ্রু-কাতর দৃষ্টিও ক্রমে ঝাপসা হইয়া উঠিল। মনে হইল—একটা ঐতিহাসিক যুগ যেন চলচ্চিত্রের মতই মুহূর্ত্তমধ্যে সহসা অতিবাহিত হইয়া গেল। মথুরের ঘরে তখনও তালা বন্ধ। ঠাকুরমাকে এখানে আনিবার সময়ে তাঁহার নির্দ্দেশেই তালা পড়িয়াছিল সেই ঘরে। পিঠের দিকে সৌদামিনীর আঁচলে বাঁধা চাবির গুচ্ছটা একবার অতর্কিতে নড়িয়া উঠিল ঃ এ চাবি যে মথুরেরই ভাবী সংসার-রচনার ইঙ্গিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গেলেন ঠাকুরমা!

কতক্ষণ যে স্তব্ধচিত্তে মৃতদেহের পাশে বসিয়া একই ভাবে কাটিয়া গেল সৌদামিনীর, তাহা যেন সেও কিছু একটা বুঝিতে পারিল না। যখন সম্বিৎ ফিরিল, দেখিল—পাড়াপ্রতিবেশীদের ভিড়ে চারিপাশ ভরিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধারা আক্ষেপ করিতেছে, আর তরুণীরা ম্লান মুখে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

এম্‌নি করিয়াই সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে একে একে দিন গেল, মাস গেল, কাটিয়া গেল একটা স্মৃতিমুখর বেদনাময় বৎসর।

রবিবারে বুধবারে এখনও নিয়মিত গ্রামে হাট বসে। কিন্তু সে-হাট আজ আর যেন তেমন জমে না। বারোখাদার হাটে গামছা, কাপড় আর লুঙ্গী নাম-করা। আগে আগে পাশাপাশি দুই একখানি গ্রামের লোক পর্য্যন্ত এই কাপড়ের হাটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। আজ আর সে-হাটে গাম্‌ছা, কাপড় নাই, আছে মেঘের অস্পষ্ট ছায়া আর শকুনের বিক্ষিপ্ত ডানা ঝাপ্‌টানি। সনাতন দর্জ্জির দোকানে আগে আগে দুইটা সেলাইয়ের কল চলিত সকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত। একটা কল এখন একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাকীটাও কখন্ অতর্কিতে বন্ধ হইয়া যায়, সেই আশঙ্কা বুকে চাপিয়াই সকালে আসিয়া দোকানে ঝাপ্ খোলে সনাতন, আবার তালা আঁটিয়া বাড়ী ফেরে রাত্রে।

নূতন করিয়া আবার দুর্ভিক্ষের বার্ত্তায় দৈনিক পত্রিকার পাতাগুলি ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্ন-দুর্ভিক্ষের অস্থি-সমাধির উপরে সংহারমূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিল বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ। একদিন ভাতে মরিয়াছে বাঙালী, আজ মৃত্যু আসিয়াছে কাপড়ের অভাবে। শুধু কি বারোখাদা, হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে আজ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে। অলক্ষ্যে থাকিয়া কাহারা যেন দুঃশাসনের

মতো বস্ত্র হরণ করিতেছে দেশের প্রাণ-লক্ষ্মী দ্রৌপদীর, আর সারা দেশ পরিত্রাণে স্তব করিতেছে লজ্জাহারী শ্রীকৃষ্ণের।

ইতিমধ্যে একদিন সংবাদে দেখা গেল: 'সাগরকাঁদি'র জনৈকা মধ্যবয়স্কা মহিলা বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। দরিদ্র স্বামী শ্রীপতি ঘটক বহু চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীর জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্ত্রীর এই মৃতদেহ দেখিতে পান। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ত্রী বিনতা দেবী স্বামীর পায়ে শেষ প্রণাম রাখিয়া একটী কাগজে লিখিয়া রাখেন—'আমার অপরাধ যেন নিও না; গলায় দড়ি ছাড়া আর পথ নাই। সংসারে গরীব হইলেও বন-মানুষ তো নই, লজ্জা ঢাকিতাম কেমন করিয়া? গরীব হইলেও আমাদের সমাজ আছে তো? তোমার কষ্টের দিকে চাহিলে চোখে জল রাখিতে পারি না। আমাকে যেন তুমি ক্ষমা করিও।'

পায়ের নীচে যেন দারুণ ভূমিকম্প চলিতেছে। সংবাদটি পড়িতে যাইয়া বুকের ভিতরটা একবার দুঃসহ বেগে কাঁপিয়া উঠিল সৌদামিনীর। অশ্রুভারে ঝাপসা হইয়া উঠিল চোখ দুইটি। সারা বাংলায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক যে নির্ব্বিবাদে নিঃশেষ হইয়া গেল, তাহাতেও কি এই দুর্ভাগা জাতির পরিত্রাণ নাই? ধরিত্রীর ক্ষুধিত আত্মা অস্থি-পঞ্জরসার এই দেশের কি আরও মৃত্যু চায়? তাহার রাক্ষুসী জঠরে কি এখনও এত হাড় পূরিয়া রাখিবার ঠাঁই আছে? হায় বিধাতা!

পিসীমা একসময় কহিলেন, "বলি ও মিনি, এ-ভাবে আর কতদিন চ'ল্‌বে, বল্‌ তো ? বাজার যে একেবারে ফর্সা ; 'পোর্টম্যানে' আছে ক'খানা ছেঁড়া নেকড়া মাত্র। শুন্‌ছি নাকি—এগারো টাকা দিলে একখানা কাপড় মিলতে পারে। গামছারও দর চ'ড়েছে ছু'টাকা আড়াই টাকা। ও-বাড়ীর সাতকড়ি ব'ললে—কার কাছ থেকে ও নাকি গোপনে খবর নিয়ে এসেছে—থান কাপড়ও একখানা দশ টাকা চোদ্দ পয়সার কম নয়। এখন বল দিকি কি উপায় ! সুধীর ঠাকুরপো কাছে থাকলেও না-হয় একবার চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে খুঁজে-পেতে দেখ্‌তে পারতো ! এখন তো দেখচি—কাপড়ের বাজার চালের বাজারকেও দামে ছাড়িয়ে গেল !"

সৌদামিনী কহিল, "উপায় আর কিছু নেই, যত পারো—ঘরে ব'সে প্রাণ ভরে' কাঁদো। এক পা পথে বেরুলেই তো অম্‌নি হা-হা ক'রে উঠবে, এখন আর উপায় কি চাও, বলো ?"

কতকটা যেন হক্‌চকাইয়া গেলেন এবারে পিসীমা। কিছুক্ষণ একই দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন, "সুধীর ঠাকুরপোকেই আর একবার লিখে দেখবি নাকি, ভেবে দেখ মিনি।"

কথা শুনিয়া সৌদামিনী এবারে রাগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল, "তাঁকে লিখতে তোমার লজ্জা করে না পিসীমা ? মেয়েছেলে ব'লে কি আমরা এতই মরে' গেছি যে, নিজেদের কাজটুকুও আমরা নিজেরা ক'রে নিতে পারি না !

সেই কোন্ সাতমুল্লুক দূরে থাকেন সুধীর বাবু, কাজ-কারবার নিয়ে আছেন; গতবার এসে তিনি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার ক'রে গেছেন। সম্পর্কে তোমার ঠাকুরপো হ'তে পারেন, কিন্তু তাই ব'লেই কি যখন-তখন তুমি তাঁকে এম্নি ক'রে বিরক্ত ক'রবে? তাঁকে আর এখানে আসতে আমি এক কলমও লিখতে পারবো না, এতে তুমি রাগ করো আর যাই করো।"

অনেকখানি উৎসাহ লইয়াই পিসীমা সুধীরের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সৌদামিনীর কথা শুনিয়া এবারে তিনি রীতিমত দমিয়া গেলেন। বলিলেন, "বেশ, তাকে না-হয় না-ই লিখলি, কিন্তু উপায় ক'রতে হবে তো একটা কিছু! ঘরে এখন আর এমন গচ্ছিত টাকা নেই যে, যে-দাম হোক্ কাপড় পেলেই হ'লো। তা ছাড়া তুইই যে এত বড়ো মুখে কথা বলিস্, তোরই বা এমন ক'রবার ক্ষমতা কি আছে! বরং ঐ সাতকড়িকে দিয়ে চেষ্টা করালে যা হোক্ কিছুও হ'তে পারে।"

সৌদামিনী বিচিত্রভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টাইয়া শুধু কহিল, "ছাই হ'তে পারে, আর হ'তে পারে তোমার মাথা।" তারপর তেম্নিতরই এক বিচিত্র ঝলকে পিসীমার সম্মুখ হইতে সে সরিয়া পড়িল।

দুয়ারের ও-পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন করিম সেখ। সারা গা দিয়া তার তখন ঘাম ঝরিতেছে।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খবর আছে করিম?"

খবর লইয়াই আসিয়াছিল করিম। গ্রামে কাপড়ের একচেটিয়া দোকান বলিতে একমাত্র সীতানাথ কুণ্ডুর গদী। ইতিমধ্যেই কয়েক গাঁইট কাপড় তাহারা গুদামজাত করিয়াছে। সরকারের নথিতে তাহার হিসাবের দাগ পড়ে নাই। এইবারে কুণ্ডু বাবুদের বাড়ীতে যদি তিন তলা ওঠে!—নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া করিম সেখ কহিল, "খবর আছে বৈ কি দিদিমণি, খবর নিয়েই তো এয়েছি? এখন আর ম'রতে ভয় নাই, শুধু একবার কুণ্ডু বাবুদের গুদামের দরজা ভেঙে গুণে দেখবো—ক'শো জোড়া কাপড় তাঁরা আটকিয়েছেন!"

উৎসুক কণ্ঠে সৌদামিনী কহিল, "খবর সত্যি তো?

"কেন, বিশ্বাস হয় না দিদিমণি?" করিম কহিল, "গাঁয়ের কে না জানে আজ এ খবর?"

"তা হলে যা' ব'ললে—তা ক'রতে পারবে?"

"আপনার যদি সমর্থন পাই।" করিম কহিল, "আজ মথুর দাদাবাবু গাঁয়ে নাই, কিন্তু আপনি তো আছেন! নিজেরা মুখ্যু মানুষ, কিন্তু আপনার মুখের শুধু একটা কথায় 'জান' কবুল ক'রতে পারি।"

সৌদামিনী কহিল, "জান কবুল ক'রতে হবে না, বরং বুঝে শুনে কাজ করো।"

করিম আর কথা তুলিল না, কিছুক্ষণ ঘরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিশ্রাম করিল। [illegible] কাল, মাঠে গিয়া ঘণ্টা কয়েক রীতিমত রক্ত জল করিয়া আসিয়াছে। সেই

রক্তসিঞ্চিত জলের ছাপ তাহার সারা গায়ের ঘামে। কিছুক্ষণ থামিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদিমণি, নতুন কিছু খোঁজখবর পেলেন মথুর দাদাবাবুর ?"

সৌদামিনী কথা বলিল না, শুধু একবার ঘাড় কাৎ করিয়া 'না' জানাইল। ·

করিম বলিল, "ক'দিন ধ'রে আমার কেবলই কি মনে হতিছে জানেন দিদিমণি, মনে হতিছে—দাদাবাবু শীগগির আবার গাঁয়ে ফিরে আসবেন। দেবতা লোক তিনি ; নিজের গাঁ, নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে ক'দিনই বা আর দূরে থাকবেন! সরকারের ধর্ম্মের আইন শিকেয় তোলা থাকুক্, দাদাবাবুকে তা' কখনো আটকাতে পারবে না।"

"ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে করিম।" সৌদামিনী কহিল, "প্রাণ ভ'রে খোদাতালাকে ডাকো, সত্যিই যেন শীগগির তিনি ফিরে আস্‌তে পারেন। তেমন খবর পেলে আমরা যেন সারা গাঁয়ের লোক সেদিন শোভাযাত্রা ক'রে তাকে ঘরে নিয়ে আসতে পারি!"

"তাইতো আনতে হবে।" করিম কহিল, "আমাদের দেবতা আসার খবর পেলে তাঁকে যে মাথায় ক'রে আনবো আমরা ইষ্টিশন থেকে।' বলিতে যাইয়া আবেগে গদগদ হইয়া উঠিল করিম সেখের কণ্ঠ। থামিয়া একবার দম নিল সে, তারপর যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছিল, তেম্‌নি অপ্রত্যাশিত ভাবেই একসময় আবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল করিম।

কিন্তু তাহাদের দলবদ্ধ ষড়যন্ত্র সম্ভবতঃ সীতানাথ কুণ্ডু বেশ পাকা হাতেই ধরিয়া ফেলিয়াছিল। অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই লাঠিয়াল এবং গ্রামের চৌকিদারদের ঘুষ দিয়া পাহারার ব্যবস্থা রাখিয়াছিল সীতানাথ। কিন্তু করিম সেখের দলও লাঠিয়াল কম নয়, সত্যিই একসময় অতর্কিতে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল গুদাম-ঘরের সাম্‌নে। লাঠিতে লাঠিতে ঠকাঠক শব্দ উঠিল। ঘায়েল করিতে পারিত করিম সেখ অনেককেই, অথচ শেষ পর্য্যন্ত হার মানিয়া তাহার দলই পিছনে হটিয়া গেল। কুণ্ডুদের লাঠিয়ালদের হাতে যে করিমেরা নতি স্বীকার করিল, তাহা নয়,—হার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল ঐ চৌকিদারদের কাছেই। খাস সহরের পুলিসি ফৌজের তাহারা বংশধর। দাঙ্গা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত হাজতে যাইতে হইবে। এতখানি সুরক্ষিত ভাব পূর্ব্ব হইতে কল্পনাই করিতে পারে নাই করিম; করিলে অবশ্য সে অন্য পথ দিয়াই আসিত।—আশা মিটিল না। জিতিল কুণ্ডুরাই।

এই ঘটনার পরে এক পক্ষকালও কাটিল না। একদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল—বস্ত্রসমস্যার আশু সমাধানকল্পে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন জন-নেতার সম্মিলিত দাবীতে সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে: 'বস্ত্রের বর্ত্তমান ঘাট্‌তি এবং দুর্নীতিপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা—এই দুইটির সুযোগ লইয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা প্রায় গোটা-ব্যবসাকেই চোরাবাজারে পরিণত

করিয়াছে।...সভা দাবী করে যে, একেবারে মিল হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়ের সমস্ত 'ষ্টক' এখনই কার্য্যকরী ভাবে কণ্ট্রোল করা হউক, রেশন প্রথায় কাপড় বিলি করা হউক্ এবং কণ্ট্রোল হইতে রেশনিং পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থার উপরে জনসাধারণের তদারক বসানো হউক্।...'স্বার্থানুসন্ধী লোক লইয়া গঠিত' প্রাদেশিক বস্ত্র-উপদেষ্টা কমিটি তুলিয়া দিয়া 'বাংলার প্রধান প্রধান দল ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া' জনপ্রিয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হউক।—যে সমস্ত প্রতিনিধিমূলক জনপ্রতিষ্ঠান বস্ত্রবণ্টনের ভার লইতে প্রস্তুত আছে, তাহাদের মারফৎ সমস্ত সঞ্চিত বা ফ্রীজ করা কাপড় এখনই বণ্টনের ব্যবস্থা হউক্—যাহাতে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।'...

কাগজখানি সাম্‌নে খুলিয়া নিয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইয়া দিল সৌদামিনী পিসীমাকে।

পিসীমা কহিলেন, "সভাসমিতি তো কতই হ'চ্ছে, তাতে কি কাজ কিছু হবে ব'লে মনে করিস্ মিনি ?"

সৌদামিনী বলিল, "জনমতের দাবীতেই সরকারের প্রতিষ্ঠা। সরকারের স্থায়িত্বই যে জনসাধারণের উপরে নির্ভর করে পিসীমা। জনমত যেমন ক'রে দাবী ক'রছে, তাতে ক'রে এর কিছু একটা আশু প্রতিকার না হ'য়ে যায় না। কাগজের পাতায় পাতায় আজ শুধু এই দাবীই। আমাদের এই গ্রাম থেকেও এম্‌নিতর দাবী আজ ঘোষণা করা দরকার। গ্রামে আজ কথা ব'লবার

মতো মানুষ নেই ; অথচ দুর্ভোগ ভুগতে হ'চ্ছে আজ সবাকেই। তুমি ব'লছিলে—ও বাড়ীর সাতকড়ি তোমাকে কাপড়ের সংবাদ দিয়েছিল। কিন্তু সে সংবাদ সাধারণ কাপড়ের বাজারের প্রকাশ্য বিক্রীর নয়, তা' হ'চ্ছে ঐ চোরাবাজারের। ঐ চোরা-বাজারকেই আজ আমাদের বন্ধ ক'রতে হবে।—করিম ঠিক পথই বেছে নিয়েছিল, শুধু তাদের অনুপ্রেরণা দেবার লোকের অভাব আজ ; নইলে সাধ্য কি কুণ্ডুরা গুদামে কাপড় আটকিয়ে রেখে সারা গ্রামকে কষ্ট দিতে পারে !”

ক্রমাগত দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে করিতে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হইয়াই ওঠে। পিসীমার মধ্যেও কেমন যেন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে আজকাল। কহিলেন, “তবে ঐ করিমকে ডেকেই একবার ব'লে দে না, বেশ এঁটেসেঁটেই যাতে লাগে এই কাজে। আর পারি না এমনি ক'রে তিলে তিলে ম'রতে। যা হয় একটা কিছু এখন হ'য়ে যাক্।”

সৌদামিনী একবার হাসিল ঃ পরম নিশ্চিন্ত হাসি। পিসী-মারও তবে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ! দেশের স্বরাজ আসিতে তবে আর সত্যিই হয়ত বেশী দেরী নাই ! এমনি করিয়াই তো দেশ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়।—

‘দুঃখ দিয়ে ব্যথা দিয়ে আঘাতে আঘাতে প্রভু এ চিত্ত জাগাও,
সংগ্রামের মহাক্ষেত্রে আমার শক্তিরে তুমি কর্ম্মে লাগাও।’
—সেই কঠিন সংগ্রাম-সাধনা যেন পিসীমার মনের মধ্যেও উঁকি দিয়াছে আজ।—প্রগতি ভিন্ন কী ?

কিন্তু করিমকে কিছু খুলিয়া বলিতে হইল না। ইতিমধ্যেই তাহারা আবার রীতিমত আঁটিয়া সাঁটিয়া উঠিয়া জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। সমস্ত চাষীপাড়ার সম্মিলিত দাবীতে শেষ পর্যন্ত হয়ত সীতানাথের গুদামঘরের ইঁটগুলি একবার থর-থর করিয়াই কাঁপিয়া উঠিল।

দুই-একদিনের মধ্যেই পত্রিকায় সরকারী ইস্তাহারে বাহির হইল—অনতিবিলম্বেই তাঁহারা বাংলার সমস্ত অঞ্চলে রেশন-ফোল্ডারের ব্যবস্থা করিবেন।

ব্যবস্থা যে না হইল, তাহাও নয়; কিন্তু গলদ থাকিয়া গেল। চাউলে ছিল কাঁকর আর মাটি, কাপড়ে আসিল ছাঁটাই। যেখানে এই যুদ্ধের প্রথম দিকেও মাথাপিছু মাত্র সাড়ে সতের গজ কাপড়েও জনসাধারণের দুঃখের অবধি থাকিত না, নতুন ব্যবস্থা হইল সেখানে বার্ষিক হিসাবে বরাদ্দ দশ গজ মাত্র।

পিসীমা কহিলেন, "এ তো জাপানী পুতুল হাতে দিয়ে ছেলেকে কান্না থামাবার মতই ব্যবস্থা রে মিনি! এতে চ'লবে কি ক'রে?"

সৌদামিনী বলিল, "চালাতে তোমাদের বলে কে? এ সবের মধ্যে না এলে সরকারও তো বেঁচে যান।"

"তা' হ'লে এ-দেশে সরকার আছে কি জন্যে?" পিসীমা কহিলেন, "দেশকে যদি রক্ষা ক'রতেই না পারবে, তবে চ'লে যাক্ না ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে।"

এবারও বড় হাসি পাইল সৌদামিনীর, বলিল, "গান্ধীজী

সেইজন্মেই তো গত বেয়াল্লিশে 'কুইট্' ব'লেছিলেন; ব'লেছিলেন, 'ভারতভূমি ত্যাগ ক'রে তুমি তোমার পিতৃরাজ্যে ফিরে যাও ইংরেজ।' কিন্তু যায়ই বা কি ক'রে? এ-দেশে তাদের যে একচ্ছত্র বাণিজ্যের পসরা; ছেড়ে গেলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের নিজেদেরই যে এই অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা। কেউ কি ইচ্ছে ক'রেই এমন দুর্লভ সম্পদ ত্যাগ ক'রতে পারে পিসীমা? যিশুকে তারা ধর্ম্মের নামে রেখেছে বটে, কিন্তু আসলে বেণে, জানো তো?"

পিসীমা বহুক্ষণ ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন সৌদামিনীর মুখের পানে, তারপর একসময় অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "যাই বলিস মিনি, ভগবান এতবড় অবিচার আর পাপ কখনো ক্ষমা ক'র্বেন না। এর কর্ম্মফল একদিন তাদের ভুগতেই হবে।"

সৌদামিনী কিন্তু এ কথায় সায় না দিয়া এবারে আরও উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ভগবানের কথা ব'ল্ছো পিসীমা, কিন্তু তিনি তো এই পৌনে দু'শো বছর দিব্যি এই অবিচার ক্ষমা ক'রে ক'রেই এখনো তোমার আমার মধ্যে বেঁচে আছেন। তাঁর নন্দন-কাননে কই কখনো তো ঝড় উঠেছে ব'লে শুনি নি! আসলে কি জানো, কর্ম্মফল সত্যিই একদিন তাদের ভুগতে হবে, এবং সে-দিনও খুব বেশী দূরে নয়; কিন্তু ততদিনে আমাদের জীবনীশক্তি সম্ভবতঃ আর একবিন্দুও থাক্‌বে না।" থামিয়া একবার দম নিল' সৌদামিনী, তারপর পুনরায়

কহিল, "ব্রহ্ম যখন এরা ছেড়ে এলো, অবশেষ কিছু রেখে এলো না, 'পোড়ামাটি'-নীতি ফলালো, পালিয়ে এলো প্রাণ নিয়ে। এরা কোথা থেকেও স্বেচ্ছায় যায় না, পালিয়ে যায়। এ-দেশ ছেড়েও হয়ত একদিন যাবে এবং ওমনি মতো 'পোড়ামাটি' ক'রেই। সেদিন সারা দেশ শ্মশানের মতো শুধু খাঁ-খাঁ ক'রে জ্ব'ল্‌বে, জ্ব'ল্‌বে এই নগণ্য গ্রাম বারোখাদাও। কী ভীষণ পরিণতি, একবারও ভাবতে পারো কি পিসীমা ?"

পিসীমার কণ্ঠে আর কথা জাগিল না। তাঁর অপলক দৃষ্টি ক্রমে নত হইয়া আসিল।

বাহিরে তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।...

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশের দ্রুত সঞ্চারমান দিনগুলি: এখনও বৃহত্তর ভারতের মতই ক্ষুদ্র বারোখাদার বুকেও সমস্যার অন্ত নাই। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা—এ তো নিতান্তই দৈনন্দিন জীবনের বিষয়। তার উপরেও বড় সমস্যা যে মনে! মানুষের মন আজ দগ্ধ কাষ্ঠের মতই কালি হইয়া গিয়াছে। বাধা আসিয়াছে সব দিকে: শিক্ষায়, মনুষ্যত্বে, শিল্পে আর আদর্শে। একটা দারুণ যুদ্ধের মুখে মানব-সমাজের যে আজ কতবড় অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। মানুষের কাছে মানুষের পরাভব, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আদর্শবাদের পরাজয়, ধনিকের কাছে নিরন্নের নিকৃষ্ট নির্য্যাতন—যুদ্ধের সুযোগে মানুষের এই পশুভাব যেন আরও বিপুল বেগে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এখানে শান্তি-আপোষ নিতান্তই একটা বাহুল্য

কথা মাত্র। চরমতম বিপ্লব চাই ইহার বিরুদ্ধে।—দক্ষিণ হাতের অর্দ্ধমুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলির মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন কর্ কর্ করিয়া শব্দ হইয়া ওঠে 'পথের দাবী'র পাতাগুলি। চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরে সৌদামিনী।—"ডাক্তার বলিলেন, 'বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়. এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হাংগেরিতে তাই হ'য়েছে, রুশিয়ায় বার বার এম্‌নি ঘ'টেছে. ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হ'য়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন সহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙা হ'য়ে উঠেছিল। এই তো সেদিনের জাপান, সে-দেশেও দিন-মজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চ'ল্‌বার পথ মানুষে কোনোদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় নি ভারতী।"

সেই ত্যাগধর্ম্মের অভাব আজ সৌদামিনীই কি কিছু একটা কম লক্ষ্য করিতেছে তার এই প্রাত্যহিক জীবনে! আরও বহুতর 'পথের দাবী' রচনার প্রয়োজন ছিল দেশে। এই মৃতকল্প দেশের নাড়ীতে আগুন না জ্বালিলে দেশের সুপ্ত আত্মা আরও কঠিনতম বিদ্রোহে জাগিয়া উঠিবে না! গ্রামের বুকে সবে মাত্র কাজ তাহাদের সুরু। মহাপৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশ এই বারোখাদা। এম্‌নিতরই নানা ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রন্থিতে গাঁথা মহা দেশ। অনন্ত কাজ বাকী এখনো

বারোখাদার মতো নিজেদের অঞ্চলেই। তারপর আরও কত জনপদ···নগর···প্রান্তর···মহকুমা আর ইউনিয়ন!—নিজের মধ্যেই আবার যেন আত্ম-নিমজ্জনের আশঙ্কা জাগে সৌদামিনীর। দুর্গম পথে একা সে আরও কি চলিতে পারিবে? নিজের মধ্যেই একবার বলিয়া উঠিল সৌদামিনী, "মথুর, তুমি কি আজও ফিরে আসবে না? তোমার জন্যে শূন্য ঘর যে হাহাকার ক'রছে; আর যে পা চ'ল্‌তে চাইছে না শ্রীমন্ত। এবারে ফিরে এস, আবার হাত ধ'রে আরও কঠিন হ'তে কঠিনতম পথে এগিয়ে নিয়ে চলো আমাকে। আজ থেমে প'ড়লে হয়ত অলক্ষ্যেই কখন্ পিছিয়ে প'ড়বো একেবারে জীবনের মতো। গ্রাম তোমাকে ডাক্‌ছে, এস, ফিরে এস শ্রীমন্ত।"

* * *

এদিকে মক্‌বুল আলীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমন্ত আরও ব্যাপকতর সংগঠন-কার্য্যে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে নিয়োজিত করিয়াছে।

বাঁশবনে ঘেরাও করা ছোট্ট কবরখানা গ্রামে; সেইখানেই মজীদের মৃতদেহকে মাটি দেওয়া হইল। মজীদের স্ত্রীর চোখের তপ্ত অশ্রু এত শীঘ্রই মুছিয়া যাইবার নয়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলি এখানে-ওখানে ধূলায় পড়িয়া লুটোপুটি খায়; তাহাদের আজ একা আগ্‌লাইবার সাধ্য কি মজীদের স্ত্রীর? মরুভূমির তপ্ত বালুকণার মতো যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে সমস্ত

সংসারটা। শ্রীমন্ত এখানে-ওখানে হাত পাতিয়া সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। ব্যক্তি-স্বার্থের বাহিরে অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে হাত কি বড় একটা কাহারও আগাইতে চায় ? সারা গ্রাম ঘুরিয়া বিশ-পঁচিশ টাকার বেশী উঠিল না। শ্রীমন্ত কহিল, "এই দিয়েই দেখ, মজীদের স্ত্রীকে যদি কোনো রকমে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারো !"

মকবুল আলী এতটুকুও প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না। অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সেও যে বাহির না হইয়াছিল, তাহা নয় ; কিন্তু ফল হয় নাই। গরীবের দুঃখে ভগবান পর্য্যন্ত টলেন না, আর তো মানুষ !

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া আবার একসময় মজীদের স্ত্রীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল মক্‌বুল আলী। মজীদের মৃত দেহকে 'গোর' দিবার পর আরও দুই একবার যে না আসিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু নিজের সমাজকে চেনে মক্‌বুল আলী। তাহার সম্বন্ধে মজীদের বিধবা স্ত্রীকে লইয়া কোনো অশ্লীল ইঙ্গিত আসিতে পারে হয়ত কখনো, এই কথা ভাবিয়াই ইচ্ছা থাকিলেও আসিয়া খুব বেশীক্ষণ কাটায় নাই মক্‌বুল আলী মজীদের বাড়ীতে। এবারেও মনে মনে সেই সঙ্কোচ লইয়া আসিয়াই কহিল, "আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই মাসুকের মা।"—মাসুক মজীদের বড় ছেলের নাম। কিছু একটা বলিয়া ডাকিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ঐ নামেই মক্‌বুল আলী কথা পাড়িল : "আমাদের রায়বাবু

থাক্‌তি তোমার কোনো কষ্ট হবি না, এ কথা সত্য ; কিন্তু এমন ক'রে একা একা তুমিই বা ক'দিন এখানে কাটাতে পারবে বলো ? মজীদ ছিল আমাদের আপ্‌না ভাইয়ের মতো, তোমার কোনো কষ্ট হ'লে আমাদেরই যে তা কষ্টের কারণ হবি মাসুকের মা ! তাই বলি কি, এই টাকা ক'টা ধরো, তারপর চলো, কোথায় তোমার বাপের বাড়ী—দিয়ে আসি।"

কিন্তু মজীদের স্ত্রীর পক্ষ হইতে এ-কথার সহসা বড় একটা সাড়া পাওয়া গেল না। অনবরত কেবল দুই চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পরে একবার অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "কোথায় যাবো ভাইজান, বাপের বাড়ীতে আজ আর যে আপনার ব'ল্‌তি কেউ নাই।" উৎসারিত অশ্রু আরও যেন কতকটা ধারায় বহিল এবারে ; চেষ্টা করিয়াও মজীদের স্ত্রী তাহা রোধ করিতে পারিল না।

কথা বলিতে গিয়া মক্‌বুল আলীও এবারে ভাষা হারাইয়া ফেলিল। দিনের পর দিন যে-অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করিয়া করিয়া মজীদ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, এ ভাবে এখানে এই অবস্থায় একা থাকিলে দুইদিন বাদে সেই মৃত্যু আসিয়া মজীদের স্ত্রীকেও মহাকালের গর্ভে টানিয়া নিবে, ছেলে-মেয়েগুলিও সেই মৃত্যুর দুঃসহ হিমস্পর্শ হইতে মুক্তি পাইবে না। অথচ পথ কোথায়, কোথায় আজ তবে এতটুকুও একটা নির্ভয় আশ্রয় মিলিতে পারে মজীদের স্ত্রীর ?

বিষয়টা লইয়া একই অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ

ধরিয়া চিন্তা করিল মক্‌বুল আলী। পরে কহিল, "অন্য কোথাও কি কোনো আত্মীয় নাই তোমার মাসুকের মা ?"

কিছুক্ষণ থামিয়া কি একটা ভাবিয়া লইল মজীদের স্ত্রী, তারপর কহিল, "চাচাতো ভাইজান থাকেন কুষ্টিয়ায়, আমার চাইতে কয়েক বছরের মাত্র বড় ! একসময় স্নেহ ক'রতেন খুব; ঐ মাসুক যখন আট মাসের পেটে, সেই শেষবার এসে গেছেন এখানে। তারপর গত এই আট ন' বছরের মধ্যি আর তিনি ইদিকে আসেন নাই। কিন্তু তাঁর কাছেই বা আজ কি মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো, ব'ল্‌তি পারেন আলী ভাইজান ?"

সান্ত্বনার সুরে মক্‌বুল আলী কহিল, "বেশ তো, বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ না আছে, তাতে কী হ'য়েছে ? দুঃখের সময়ে লজ্জা ক'রে বা নিজের মন্দ-কপালের দোহাই দিয়ে ব'সে থাক্‌লি চলে না। একসময় যখন তিনি স্নেহ ক'রতেন, আজও মুখ ফেরাবেন না। আপত্তি না ক'রে বরং সেইখানেই চলো মাসুকের মা।" থামিয়া কহিল, "তারপর সত্যিই যদি তাঁর সংসারে তোমার ঠাঁই না হয়, তখন না-হয় নতুন ক'রে পথ খুঁজে দেখ্‌বো। এখানে থাক্‌লি শুধু নিজেকে নয়, বাচ্চা-গুলিকে পর্য্যন্ত রক্ষা ক'র্‌তি পারবে না। বুদ্ধিমতী তুমি, যাতে কোনো বিপদ না আসে—সেই কাজই তোমার ভেবে-চিন্তে করা উচিৎ নয় কি মাসুকের মা ?"

প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইয়া মজীদের স্ত্রীর মুখে এবারে কথা বাঁধিয়া গেল। নিজের এই পীড়িত দীর্ণ অবস্থার

কথা ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া সে আর কখনও ভাবিতে পারে নাই। আজ চোখের সামনে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—অদৃশ্য একখানি কালো হাত অলক্ষ্যে আসিয়া তাহাকে যেন গলা টিপিয়া ধরিয়াছে! রুদ্ধশ্বাসে সে শুধু চীৎকার করিয়া বলিতেছে : 'বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো আমাকে বাঁচাও।"—সত্যিই বড় শুভানুধ্যায়ী বন্ধু মক্‌বুল আলী! বহুক্ষণ ধরিয়া নিজের মধ্যে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিল মজীদের স্ত্রী, তারপর এক-সময় মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কোনোদিন জীবনে তো কারুর কাছে হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াই নাই, আজও তাই কোথাও যেতে পা সরে না। বাপের সংসারে মানুষ হইছিলাম, তারপর স্বামীর ঘর। আদরেই কাটলো চিরকাল।" আবেগের মুখে আবার কিছুটা উদ্গত অশ্রুতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল মজীদের স্ত্রীর। থামিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু সুখ তো আর মানুষের চিরকাল থাকে না। আমাকে কুষ্টিয়াতেই নিয়ে চলুন আলী ভাইজান।"

মক্‌বুল আলী কহিল, "খোদার মেহেরবানীতে তোমার সব দুঃখ একদিন ঘুচে যাবে মাসুকের মা। মিথ্যে এমন ক'রে চোখের জল ফেলো না। রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট কার সংসারে না আছে বলো? মাসুক একদিন তোমার বড় হবে, রোজগার ক'রে তোমাকে খাওয়াবে। সেদিন আর তোমায় কারুর আশ্রয় খুঁজে ম'রতে হবি না। নিজের সংসারে নিজে আবার তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।" থামিয়া কহিল, "জিনিষ-

পত্তর যা আছে বেঁধেছেঁদে তৈরী হ'য়ে নাও, আমি বরং একটু ঘুরে আসি।"

মজীদের স্ত্রী আর একটুকুও দ্বিধা করিল না, মক্‌বুল আলীর কথামতই হাঁড়ি-মুছি বাঁধিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সে তৈরী হইয়া লইল।

শ্রীমন্তের সঙ্গে আসিয়া একবার দেখা করিয়া গেল মক্‌বুল আলী, তারপর মজীদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া একসময় রওনা হইয়া পড়িল। সকালে বিকালে মোটরলঞ্চ চলে মাদারীপুর হইতে ভাঙ্গা, ভাঙ্গা হইতে সদর ; তারপর আসিয়া ট্রেণ ধরিতে হয়।—আড়িয়াল-খাঁ'র কালো জল তেম্‌নিই টল্‌মল্‌ করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া বন্দর-জীবনের শেষ অধ্যায়ে মজীদের স্ত্রীর বেদনাকাতর চোখ তুইটিও যেন আর একবার শেষবারেরই মতো অশ্রুভারে টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। মক্‌বুল আলী তাহা দেখিতে পাইয়াও এবারে চোখ ফিরাইয়া লইল।

ইহার পরে মাঝখানে তুই একটা দিন একরকম নির্ব্বেদ অবস্থার মধ্য দিয়াই কাটিয়া গেল।—নিয়মিত যাইয়া কিছু একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে বসিয়া আড্ডা দিয়া না আসিতে পারিলে দিনটাই যেন কাটিতে চায় না শ্রীমন্তের। নিয়মিত খবরের কাগজ আসে ব্যাঙ্কে, তার সঙ্গে দরোয়ান সিন্ধুরাম আনিয়া দেয় চা আর আনুসঙ্গিক খাবার। সময়টা

ভালই কাটে। যে-সব ডিপজিটারদের একবার ব্যাঙ্কের খাতায় নাম লিখাইয়া দিয়াছে শ্রীমন্ত, এখন তাহাদের জমা অঙ্কের উপর কেবল অঙ্ক আসিয়া যোগ হয়। সামান্য কমিশন আর সুদের উপরে যাহা হউক্ একটা কিছু 'ওভার-রাইডিং' আসে শ্রীমন্তের হাতে ; তাহাতেই নির্ব্বিঘ্নে তাহার চলিয়া যায়। নতুন লোকের পিছনে সেভিংসের ফর্ম্ম্ লইয়া আর বড় একটা ঘুরিতে হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নিজেরাই তাহারা উপযাচক হইয়া আসিয়া ফর্ম্মে সই করিয়া টাকা জমা রাখিয়া যায়। ততক্ষণে নিজের ডায়ারীর পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-গুলি টুকিয়া লইয়া কর্ম্মসূচী তৈরী করিতে ব্যস্ত হইয়া ওঠে শ্রীমন্ত। কী যে না আছে এই ডায়ারীর পৃষ্ঠাগুলিতে, তাহা যেন এক-এক সময় নিজের বিচারবুদ্ধিতেও বড় একটা ভাবিয়া উঠিতে পারে না সে।—আমেরিকার ইস্পাত-কারখানায় ধর্ম্মঘট, প্যালেষ্টাইনে আরব-বিদ্রোহ, আন্দামান-সংস্কার, হাসানাবাদে প্রজা-দলন হইতে আরম্ভ করিয়া মেদিনীপুরের আগষ্ট-সংগ্রাম পর্য্যন্ত প্রতিটি ঘটনা বিস্তৃত বিবরণসহ নিখুঁৎভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ডায়ারীতে। আর শুধু কি তাই, সৌদামিনীকে কেন্দ্র করিয়াও একটা বিশেষ অংশ যেন রূপক কাব্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।—

আর একবার সযত্ন-হাতে টানিয়া নিল ডায়ারী খাতাখানি শ্রীমন্ত, তারপর একরকম অনাবশ্যক ভাবেই কিছুক্ষণ ধরিয়া অলক্ষ্য-স্বভাববশতঃ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া চলিল ঃ

"—বিয়াল্লিশের আগষ্ট-আন্দোলনে বালুরঘাট ও মোড়াডাঙ্গায় পুলিশের যে পৈশাচিক অত্যাচার সঙ্ঘটিত হয়, আমলাতান্ত্রিক শাসন-ইতিহাসে তাহার স্বীকৃতি-চিহ্ন একদিন মুছিয়া গেলেও বাংলার ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে যাহা লিখিত রহিল, তাহা নতুন করিয়া যুগে যুগে বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইবে দেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানদিগকে।—প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্টে বলা হয়ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর নিশীথ রাত্রে পুলিশবাহিনী ফুলচাঁদ মণ্ডলের বাড়ীতে হানা দেয়। শ্রীযুক্ত মণ্ডলের স্ত্রী তাঁহার সন্তানসন্ততিসহ যে ঘরে নিদ্রিতা ছিলেন, উক্ত পুলিশ-বাহিনী আসিয়া সেই ঘরের দরজা ভাঙিয়া ফেলে। তারপর তীব্রভাবে অত্যাচার আরম্ভ হয় তাহাদের উপরে এবং জিনিষপত্র লুণ্ঠিত হয়। অপরাধের মধ্যে স্থানীয় আন্দোলনে শ্রীযুক্ত মণ্ডল বিশেষ ভাবে জড়িত আছেন বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেও কি পুলিশ যথার্থই ওয়াকিবহাল?..."

সকালের আকাশটা মোটেই পরিষ্কার ছিল না। ধীরে ধীবে ভাসা-ভাসা মেঘগুলি কাটিয়া গিয়া অপরাহ্নের স্বচ্ছ মুক্তাকাশ দেখা দিল।

দ্রুত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল পৃষ্ঠাগুলি শ্রীমন্ত:

—"ব'ল্‌তে পারো শ্রীময়ী, এই নারকীয় যজ্ঞের অবসান হবে কবে? অত্যাচারীর হাতের খড়্গ কবে ধ্বসে' প'ড়বে ধূলায়? আর এমন ক'রে রক্তস্রোত বইবে না, নতুন প্রভাতে নতুন ক'রে শান্তি-পদ্ম ফুটে উঠবে উচ্ছল সাগর-তরঙ্গে ;—কবে,

কবে এই শান্তির রূপ দেখতে পাবো, ব'লতে পারো শ্রীময়া? কাছে থাক্‌লে এই প্রশ্নটা হয়ত রূপ নিত' অন্য পথে, কিন্তু আজ্‌কের এই নিবিড় নিঃসঙ্গ জীবনে তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। ইচ্ছে হয়, প্রকাণ্ড একটা প্রশ্নমালা গেঁথে তুলি এম্‌নি ক'রে, তারপর তাকে ভাসিয়ে দেই সহজ হাওয়ায় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো তোমার নিরাভরণ কণ্ঠকে লক্ষ্য ক'রে।...”

হঠাৎ বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইতেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল শ্রীমন্ত।

কাছে আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল ব্যাঙ্কের দরোয়ান সিন্ধুরাম, কহিল, “সকালের বোটে বড় সাহেব এসেছেন ক'ল্‌কেতা থেকে; ম্যানেজারবাবু আপনাকে খবর ক'রেছেন।”

বড়সাহেব অর্থে শ্রীমন্ত স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ব্যাঙ্কের হেড্‌-অফিস হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ঘোষ আসিয়া তবে পৌঁছিয়াছেন। গত কয়েকদিন হইতেই তাঁহার 'ভিজিটিং'-এ আসিবার কথা ছিল। বলিল, “আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।”

যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই আবার অদৃশ্য হইয়া গেল সিন্ধুরাম।

কলিকাতার রাজপথ গরম হইয়া উঠিয়াছে ইদানিং আজাদ-হিন্দ্‌-ফৌজের ঘটনায়। দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের দিন আগাইয়া আসিয়াছে মেজর জেনারেল শা'নওয়াজ, কাপ্টেন সায়গল আর ধীলনের। কাগজের সংবাদে চলে

সরকারী সেন্সর। কতটুকুই বা সত্য সংবাদ আসিয়া পোঁছায় দেশের লোকের কাছে! মিঃ ঘোষের নিকট হইতে খানিকটা সেই খাঁটি সংবাদ সংগ্রহের একটা সুযোগ বৈ কি শ্রীমন্তের। বৃদ্ধ আর তর্জ্জনী আঙুলের মধ্যে ডায়ারী খাতাখানি চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে একসময় সে উঠিয়া পড়িল। কোনো একটি খণ্ড মুহূর্ত্তের জন্যও ডায়ারী খাতা-খানিকে একান্তে রাখিয়া নিজেকে কিছু একটা নিরাপদ বা নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারে না শ্রীমন্ত। যে আগুন আর উদগ্র বিষ লুকাইয়া আছে উহার প্রতিটি পৃষ্ঠায়, তাহা অন্ততঃ কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হাতে পড়িলে ফল যে শুভ হইবে না—এ কথা নিশ্চিত। এবং সেই নিশ্চিত বিপদের মুখে তাহার এই পলাতক জীবনেরও সমস্ত গৌরব, সমস্ত সঞ্চয় হয়ত তবে কোনো একটা প্রবলতর বন্যার স্রোতে শ্যাওলার মতই ভাসিয়া যাইবে।...

ব্যাঙ্কের দুয়ারে আসিয়া পা দিতেই দেখিল—অনুমান মিথ্যা নয়। একাউন্টেন্ট্ ব্রজবিহারী ক্যাস রাখিয়া ফাই-ফরমাস খাটিতেছে। ম্যানেজার নিখিল ব্রহ্ম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া চলিয়াছে মিঃ ঘোষের সঙ্গে। শ্রীমন্তের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ভূমিকার অবতারণা কবিয়া রাখিয়াছে নিখিল ব্রহ্ম।

শ্রীমন্তের কাছে মিঃ ঘোষ একেবারেই নতুন ব্যক্তি। নিখিল ব্রহ্ম পরিচয় করাইয়া দিতেই দুই হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিয়া সৌজন্যের প্রথম স্তরটা কাটাইয়া লইল শ্রীমন্ত। বলিল, "কয়েকদিন আগেই আপনার আসার কথা

শুনেছিলাম। চারদিকে যে-রকম কানাঘুষো, গুজব, দেশের অবস্থা তো বড় সুবিধের নয়. ভাব্‌লাম—ক'ল্‌কাতা ছেড়ে শেষ পর্য্যন্ত আদৌ আসেন কিনা! কী যে আনন্দ হ'লো এবারে আপনাকে দেখে, কি ব'ল্‌বো স্যার।"

প্রথম পরিচয় ও সংলাপের গোড়াতেই একটা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন মিঃ ঘোষ। কহিলেন, "সুরুতেই আমাকে একেবারে বসিয়ে দিলেন কিন্তু শ্রীমন্ত বাবু। এসেই যেমনটা শুনেছি আপনার সম্বন্ধে মিঃ ব্রহ্মের কাছে, পরিচয়ের প্রাথমিক ব্যাপারেই দেখ্‌চি কিন্তু তার সম্পূর্ণ উল্টো। বাবু, মহাশয়, নিদেন ইংরেজি-প্রয়োগে মিষ্টার—এতসব শব্দ থাক্‌তেও ঐ 'স্যার' কথাটা ব্যবহার না ক'রলেই কি চ'ল্‌তো না!"—মুখে রুমাল চাপিয়া একরকম আপন খুসীতেই আবার হাসিয়া উঠিলেন মিঃ ঘোষ।

কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেও রসিকতাটা ধরিয়া ফেলিতে শ্রীমন্তের বিলম্ব হইল না। কহিল, "স্থানকাল ভেদে শব্দ-ব্যবহারেরও ভেদ হ'য়ে থাকে। তার জন্যে মনে ক'রবার কিছু নেই। 'মহাশয়' শব্দটাও ঐ 'স্যার'-এরই বাংলা প্রতিশব্দ, অপভ্রংশও ব'ল্‌তে পারেন। কিন্তু আপত্তি যখন তুলছেন, তখন শব্দটাকে বরং কতকটা সহজ ক'রেই নিচ্ছি এবারে। 'ঘোষ বাবু' ব'লেই ডাক্‌বো, কি বলেন?"

"বিলক্ষণ! ঐ তো যথেষ্ট।" মিঃ ঘোষ কহিলেন, "আপনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। দেশের সত্যিকারের চিন্তাশীল

ব্যক্তি আপনারা, নমস্য আপনারা চিরদিন। মিঃ ব্রহ্মের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই সামান্য যা পরিচয় পেয়েছি আপনার, তাতে আর নতুন ক'রে কিছু জিজ্ঞাসার নেই শ্রীমন্ত বাবু। এখানকার এই ব্র্যাঞ্চের প্রাণ-কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। আপনার কাছে কি ব'লে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

অপরের মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিলে স্বভাবতঃই কিছু একটা তৃপ্তি জাগে বটে মনে, কিন্তু শ্রীমন্ত কেন যেন বড় লজ্জা পাইল। কহিল, "কী সব বাজে কথা শুনে ছাইপাশ সব ব'ল্‌ছেন, তার ঠিক নেই। কতটুকই বা ক'রতে পেরেছি ব্যাঙ্কের জন্যে! কোনোদিন এ লাইনের অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস তো নেই, তাই আসল বা ভালো কাজ কিছুই হয় নি। ডন-কুস্তি ক'রতে দিন, লাঠি-সাপ্টা হাতে দিন—দেখবেন, অপূর্ব্ব কুশলতায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ব। কিন্তু এ-সবে হ'চ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ 'কম্পিটেন্সি'র প্রয়োজন। সেই 'কম্পিটেন্সি'র যে কতখানি অভাব আমার মধ্যে, তা নিজেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি। মিথ্যে অন্যায় ব'লে তাই লজ্জা দেবেন না ঘোষ বাবু।"

এতক্ষণ নীরবে বসিয়া মৃদু হাসিতেছিল নিখিল ব্রহ্ম, এবারে আর সে চুপ করিয়া থাকা সমীচীন মনে করিল না। কহিল, "সংসারে বড়ো আর প্রকৃত মানুষ যাঁরা, বিনয়ই তাঁদের প্রধান গুণ।—এ কথা কি আপনি অস্বীকার ক'রতে পারেন শ্রীমন্ত বাবু?"

কথাটার ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া নিতে কষ্ট হইল না শ্রীমন্তের। তাই অনাবশ্যকভাবে নিজেকে লইয়া অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বড় বেশী সাড়া পাইল না সে মনে। বলিল, "এম্‌নি ক'রে কিছু ব'ল্‌বার জন্যেই কি তবে আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন মিঃ ব্রহ্ম? তাঁর চাইতে আসুন, ঘোষ বাবুর কাছ থেকে ক'লকাতার খবর কিছু শুনি।"

অত্যন্ত ভালো লোক মিঃ ঘোষ। অফিসারত্বের গর্ব্বে কোথাও তিনি ভারাক্রান্ত বা কণ্টকিত ন'ন। দিব্যি স্ফূর্ত্তিবাজ ব্যক্তি; সর্ব্বত্র সমভাবে এক এবং অদ্বিতীয়। এই কারণেই বিশেষ জনতার মধ্যেও তাঁহাকে স্পষ্ট চোখে পড়ে। কহিলেন, "যা-ই মনে ক'রে থাকুন না কেন আপনি, কিন্তু আপনাকে পাবার পর থেকে মুহূর্ত্তগুলি কেমন যেন বেশ ভাল লাগ্‌ছে হঠাৎ, শ্রীমন্ত বাবু। একটা দিন মাত্র এখানে আছি, আপনার সঙ্গ পাওয়া থেকে অন্ততঃ আমাকে বঞ্চিত ক'রবেন না যেন!"

"সে কি, একটা দিন থাকবেন মানে?" কতকটা বিস্ময়ের কণ্ঠেই শ্রীমন্ত কহিল, "এই তো কেবল এলেন, দু'একদিন এখানে থেকে এই নিরেট বন্দরটা একটু ঘুরে-টুরে দেখুন, তারপর না-হয় যাওয়ার কথা ব'ল্‌বেন!"

ইতিমধ্যে সিন্ধুরাম আসিয়া দ্বিতীয়বার টেবিলে চা দিয়া গেল: তিন কাপ। শ্রীমন্তের কাছে এখানে আজ অবশ্য চা এই প্রথম। জলখাবারের ব্যবস্থা মিঃ ঘোষ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রথমবারের চায়ের সঙ্গেই হইয়াছিল।—নিখিল ব্রহ্ম

হাঁক দিয়া কহিল, "শ্রীমন্ত বাবুর জন্যে খাবার আন্‌লি নে সিন্ধু ?"

শ্রীমন্ত হাতের ইসারায় নিষেধ জানাইয়া কহিল, "না, না, খাবারের কোনো প্রয়োজন নেই, চা-ই যথেষ্ট।" তারপর থামিয়া পুনরায় মিঃ ঘোষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "থাকা সম্ভব হ'লে থাক্‌তুম, আনন্দই পেতাম বরং তাতে। কিন্তু কাগজে-পত্রে কিছু কিছু খবর অবশ্য নিশ্চয়ই পান ক'ল্‌কাতার; ট্রাম ধর্ম্মঘট, রেলওয়ে ষ্ট্রাইকের হিড়িক, তা ছাড়া পলিটিক্যাল গ্রুপগুলি রীতিমত শানিয়ে র'য়েছে আজাদ-হিন্দের ব্যাপারে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা হাঙ্গামা সত্যিই যদি বাঁধে, তবে এখান থেকে যাওয়াই শুধু মুস্‌কিল হবে না, যাদের সেখানে রেখে এসেছি—তাদের সম্বন্ধেও কর্ত্তব্যের বোঝাটা ভারী হ'য়ে উঠ্‌বে। অথচ তখন পথ থাক্‌বে না কোনো দিকেই।"

সংবাদ-সন্ধানে আলোচনার সূত্র পাইয়া কতকটা ঘন হইয়া বসিল এবারে শ্রীমন্ত।

কিন্তু সিন্ধুরাম তাহার পূর্ব্বের নিষেধ শোনে নাই। এক প্লেট্ নিম্‌কী ও সন্দেশ আনিয়া টেবিলে তাহার সাম্‌নে রাখিয়া গেল। নিখিল ব্রহ্মের দিকে কৃত্রিম কটাক্ষপাত করিল একবার শ্রীমন্ত: "এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায় মিঃ ব্রহ্ম। যথা সময়েই একবার ভর'পেট হ'য়ে গেছে। এগুলি না হ'লে কি চা-টা জ'ম্‌তো না!"

মুখে মৃদু হাসি টানিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "আপনি আস্‌বেন ব'লে খাবার আগে থেকেই আনানো ছিল; সুতরাং এ প্লেট্‌টাকে আপনি বাতিল ক'রতে পারেন না।" তারপর চায়ে বারকতক চুমুক দিয়া কহিল, "আপনারা বরং কিছুক্ষণ ব'সে গল্প করুন, আমি একবার বাসাটা ঘুরে আসি।"

ধীরপদে উঠিয়া গেল নিখিল ব্রহ্ম।

মিঃ ঘোষের কথার সূত্র টানিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "অসুবিধে আপনার অবিশ্যি যথেষ্ট, কিন্তু আবার কবে দেখা পাবো, তারই বা ঠিক কি! তাই ব'ল্‌ছিলাম দু'একটা দিন থেকে যেতে।"

মিঃ ঘোষ উত্তর করিলেন না, বারকয়েক মাত্র মিট্‌-মিট্‌ করিয়া চাহিয়া চোখ নামাইয়া নিলেন।

থামিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "আজাদ-হিন্দ্‌ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়, ঘোষ বাবু? আমি তো মনে করি, বিচারে তাদের জেতা উচিৎ। ক'ল্‌কাতার মতবাদ কি এ সম্বন্ধে?"

কলিকাতার জীবনে আকস্মিক হইলেও এ-সমস্ত ঘটনা লইয়া আলোচনা একরকম পুরানো হইতেই চলিয়াছে। মিঃ ঘোষ কহিলেন, "অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক, কিন্তু জানেন তো, আজ্‌কের এই আম্‌লাতন্ত্র এমন্‌ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে, অনায়াসে ছেড়ে দেবে আজাদ-হিন্দ্‌ সৈনিকদের। রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ-ই যেখানে তাদের বিরুদ্ধে বৃটিশের প্রধান চার্জ্জ্‌—সেখানে স্বভাবতঃই তাদের মুক্তির প্রশ্ন মনে আনতে পারি না।"

"অথচ আশ্চর্য্য দেখুন, যখন জাপানী-আক্রমণের মুখে তারা নিঃস্ব অসহায়ের মতো প্রাণ দিতে ব'সেছিল, তখন ইংরেজ অনায়াসে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে নিজের প্রাণ নিয়ে সরে' প'ড়লো। ভারতীয় সৈন্য ব'লে এদের প্রাণের মূল্য সেদিন নিরূপিত হয় নি।" একবার দৃঢ় দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল শ্রীমন্ত মিঃ ঘোষের দিকে।

মুখে মৃদু হাসি টানিয়া মিঃ ঘোষ কহিলেন, "পরাধীন জাতির দুঃখ অনেক শ্রীমন্ত বাবু। এ নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই। আমাদের সারা মনে বিপ্লব গাঁথা র'য়ে গেছে। 'পারফেক্ট্ নন্-কোয়াপারেশন' ভিন্ন এ পথ থেকে মুক্তি নেই।" তারপর থামিয়া কহিলেন, "আজাদ-হিন্দ্-সৈনিকেরা আজ যদি সত্যিই অপরাধী ব'লে অভিযুক্ত হয়—তবে বুঝ্তে হবে, ইংরেজের গণতন্ত্র কল্যাণব্রতের অনুগামী নয়, অনুগামী হ'চ্ছে ধারালো একগাছি ফাঁসির দড়ির। এবং সেই দড়িও একদিন তাদেরই—" হঠাৎ থামিয়া গেলেন মিঃ ঘোষ।

এতক্ষণে যেন একটা জীবন-দর্শন খুঁজিয়া পাইল শ্রীমন্ত। প্রথম দৃষ্টিতে মিঃ ঘোষকে যেমনটা মনে হইয়াছিল, ঠিক তেমনটাই সাধাসিধা তিনি ন'ন্, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি কর্ত্তব্যের হাতিয়ার নিক্ষেপ করিতেও দ্বিধা করেন না। নিজের ধাতের সঙ্গে যেন অনেকখানি মিল খুঁজিয়া পাইল শ্রীমন্ত। কহিল, "এই ভুয়ো গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে-দিয়েই তো ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদকে আরও পাকা-পোক্ত ক'রে তুলেছে, ব'ল্ছে

—'অয়মহং ভোঃ, এই যে আমি, আমাকে দর্শন করো।' অথচ যে রাশিয়া গণতন্ত্রের জন্মদাতা, বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন থেকে 'বুনো' আখ্যায় তাদের নির্ব্বিবাদে সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।—'ডিভাইড্ এ্যাণ্ড্ রুল'—এ-ই যেখানে আজ আমাদের সরকারী গণতন্ত্র—সেখানে·বাস্তবিকই আশা ক'রবার মতো কিছু নেই। কংগ্রেসের অহিংসবাদ থেকে কিছুটা ছিঁট্‌কে প'ড়লেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে-কঠিন দুর্ব্বার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা ভিন্ন সত্যিই মনে হয়—আমাদের মুক্তির পথ আরও সুদূরপরাহত।"—থামিয়া একটা ভারী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল শ্রীমন্ত।

মিঃ ঘোষের গায়ে ঢোলা খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়ে ক্রোম-লেদারের অতিসাধারণ কাবুলী জুতা। নীরবে দক্ষিণ পায়ের গোড়ালিটা একরকম অনাবশ্যকভাবেই বারকতক মেঝেতে ঠুকিয়া নিয়া কনুই পর্য্যন্ত দুই হাতের আস্তিন গুটাইয়া নিলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে একটি চুরুট ধরাইয়া আর-একটু ভাল হইয়া বসিলেন মিঃ ঘোষ।

শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "দেখে-শুনে ইচ্ছে হয় কি ঘোষবাবু, দুঃশাসনের বুকে ভীমের মতো পৃথিবীর এইসব শোষক আর চাটুকারী অভিনেতাদের বুকে চেপে বসি ; পেটে যখন ভাত জোটে না, তখন একবার বহু বিচিত্র জীবনের নাড়ী চিবিয়ে দেখি সত্যিই পেট ভরে কিনা ! হিমালয় থেকে কন্যা কুমারি পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষ আজ হাহাকার ক'রে কাঁদছে, আরও কি চুপ ক'রে থাকা যায় ?"

মিঃ ঘোষ এবারে হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চুরুটের কুণ্ডলিকৃত ধোঁয়ার সাথে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দি ভেরী স্পিরিট্ আই লাইক্ ; ইউ আর রিয়ালি দি পারফেক্ট্ বেঙ্গলী এ্যাণ্ড্ দেন ইণ্ডিয়ান, শ্রীমন্ত বাবু। কিন্তু উপায় নেই, পথ নেই,—ক'ল্‌কাতায় ব'সে এক-একটা প্রসেশন লক্ষ্য ক'রেছি, আর যথেষ্ট ভেবেছি এই নিয়ে, কিন্তু এর শেষ খুঁজে পাই নি। আর যা পেয়েছি—তা শুধু হাজত, জেল আর ফাঁসি। অথচ—" একটু বিশেষ রকমের জোর দিলেন শব্দটার উপরে মিঃ ঘোষ : "অথচ এই সংগ্রাম ভিন্নও আমাদের পথ নেই। আপোষ ক'রে ক'রে দেখা গেল—আত্মমর্য্যাদা তাতে এতটুকুও বাড়ে নি, বরং একটা 'ইউনাইটেড্ স্পিরিট' ক্রমশঃ পিছিয়ে প'ড়ছে।"

"আর গত সিম্‌লা বৈঠকেও সেই প্রহসনই হ'য়ে গেল।" শ্রীমন্ত বলিল, "বার বার জিন্না সাহেবের দুয়োরে গিয়ে কাতর আবেদন নিয়ে দাঁড়ালেন মহাত্মাজী, কিন্তু জিন্না সাহেবের অন্তরের পরম পুরুষটি এতটুকুও ট'ল্‌লেন না। সীমলায় লাটপ্রাসাদে নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হ'লো ২৫শে জুন : দু'দিন ধ'রে বড়লাটের নতুন শাসন-পরিষদে সদস্য-মনোনয়ন নিয়ে লীগ্-কংগ্রেস্ আপোষ আলোচনা ক'রে ব্যর্থ হ'লেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। মহাত্মাজী স্পষ্টভাবে ব'ল্‌লেন, 'নূতন শাসন পরিষদে যাতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই শুধু গ্রহণ করা হয়, সেজন্যে সকল দলেরই চেষ্টা করা উচিৎ।'—সকল দলেরই আন্তরিক

সমর্থন পেলো বটে কংগ্রেস, কিন্তু জিন্না সাহেব দেখ্‌লেন—তাঁর পাকিস্তানী পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়। ওম্‌নি বেঁকে ব'স্‌লেন তিনি। ওয়াভেল সাহেবকে আগে বারকয়েক খুব দৌড়-ঝাঁপ ক'রতে দেখা গেল, কিন্তু হঠাৎ যেন নিভে গেলেন তিমি জিন্না সাহেবের চালে। নিভ্‌বারই কথা যে ঘোষ বাবু, লীগ তো কিছু আর একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা নয়! যেখানে অঙ্গ-সম্বন্ধ, সেখানে প্রত্যঙ্গের ব্যথায় যে অঙ্গেরই ব্যথার কারণ হয়; তাই ভেঙে গেল বৈঠক। 'জিন্না সাহেব জিন্দাবাদ' ব'লে চারদিকে ধ্বনি উঠ্‌লো, গভর্ণমেন্ট্‌ মনে ক'রলেন, যা' হোক্‌ কিছুদিন আবার তবে চ'ল্‌বে। এই ডিভাইড্‌ পলিশি মনে মনে পুষে রেখেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড এসেছিলেন সেবার মুক্তির বাণী প্রচার ক'রতে, আর তারই শেষ দৃশ্যের যবনিকা হ'য়ে গেল বড়লাট-সাহেবের এই ব্যবস্থিত বৈঠকে।"—বিচিত্র শব্দে সহসা একবার হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত।

আবার বারকয়েক চুরুটে টান পড়িল। শাদা ফ্যাকাশে একরাশ ধোঁয়োয় ঘরটা মুহূর্ত্তে আরএকবার ভরিয়া উঠিল! কি একটা বলিবেন বলিয়া মনে হইল মিঃ ঘোষ। কিন্তু পারিলেন না।

থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "আর ঠিক ঐ একই সময়ে সান্‌-ফ্রান্সিস্কোতে ঘ'ট্‌লো বিশ্বশান্তি সম্মেলন। আপনারা বিশেষ সাংবাদিক মণ্ডলীর মধ্যে কাটান ক'ল্‌কাতায়, ঘোষ বাবু, আপনার কাছে এর পুনরুল্লেখ ধৃষ্টতা ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু জানেন তো, কথায় কথা আনে। পঞ্চাশটি জাতির প্রতিনিধি

নিয়ে ব'সলো সম্মেলন। ভারতের অধিকার রইলো না সেখানে কিছু ব'ল্‌তে। ম' মলোটভ অবশ্য ভারত সম্পর্কে দু'-এক কথা তুলেছিলেন, কিন্তু মিথ্যে সারা আমেরিকা আর বিলেত ঘুরে চেঁচিয়ে ম'রলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ; ইংরেজের টিকিটিও তাতে ন'ড়লো না। তাঁরা হিসেবের খাতা খুলে দেখালেন—আছে, ভারতের প্রতিনিধি আছে, স্যার ফিরোজ খাঁ নুনই সেই প্রতিনিধি। অথচ ভারতবর্ষ সত্যিই কি তাঁকে তার প্রতিনিধি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল? নেয় নি। এই তো গেল প্রহসনের সূচনা, তারপর যা বাকী রইলো, মানদণ্ডে বিচার ক'রতে গেলে তাই-বা কম কি ঘোষ বাবু! প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্যে যে 'লীগ অব নেশন' গঠিত হ'য়েছিল, তা থেকে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, এবার প্রয়োজন হ'লে সামরিক শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হ'লো। বেশী ক্ষমতা দেওয়া হ'লো প্রধান পাঁচটি শক্তির হাতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক-একটি প্রধান শক্তিকে কতকগুলি অঞ্চলে ম্যাণ্ডেটারী প্রভুত্বের অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল, এবারে তার পরিবর্ত্তে ঐ ধরণের অঞ্চলে কর্তৃত্ব ক'রবার জন্যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি ট্রাষ্টিশিপ্ কাউন্সিল গঠিত হ'লো। কিন্তু একেই কি শান্তি প্রতিষ্ঠার সুন্দর ব্যবস্থা ব'ল্‌বেন আপনি, ঘোষ বাবু? জুজুর ভয় দেখিয়ে শিশুকে বশ করা যায় সত্য, কিন্তু সামরিক শক্তির প্রয়োগে আন্ত-

র্জ্জাতিক সেনাবাহিনীর ভয় দেখিয়ে কখনো কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় পৃথিবীর। মানুষের মন থেকে যতক্ষণ না হিংসা, দ্বেষ আর সংগ্রামলিপ্সা দূর হ'চ্ছে, ততক্ষণ আইন ক'ষে বা সশস্ত্র শক্তির অধিকারে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এবং দেখাও গেল তাই। শান্তিপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বোবা কান্নার মতই আবার গুম্‌রে উঠ্‌লো। বিজিত ও দুর্ব্বল জাতিগুলির উপরে সমান প্রভুত্ব আর দমননীতিই চালু রইল, ভেদনীতি এতটুকুও ক'ম্‌লো না। তার প্রমাণ এই ভারতবর্ষ আর ইংরেজ। বনেদি সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল সাহেব পান থেকে চুন খসাতে রাজী ন'ন। এদিকে জার্ম্মাণ গেল, জাপান গেল, বনেদিয়ানার ষোল আনা ডঙ্কানিনাদ হ'লো চার্চ্চিল সাহেবের ; ভেবেছিলেন—খাস বৃটেনেও একচ্ছত্র প্রভুত্ব চিরস্থায়ী রেখে লগ্নিকারবার ক'রে যেতে পারবেন তিনি মানুষের মন নিয়ে, কিন্তু কর্পূরখণ্ডের মতো সে আশাও কখন একসময় ঘূর্ণিবাতাসে উড়ে গেল। মস্‌নদ কেড়ে নিলেন এট্‌লি সাহেব। কিন্তু তাতে যে ভারতবর্ষের কিছু সুবিধে হ'লো, তা নয়। প্যালেষ্টাইন আর ইন্দোনেশিয়াতেও আজ ঐ একই অভিনয় চ'লেছে ইংরেজের। এই অন্যায় অনুশাসনের বিরুদ্ধে আমরা কি সত্যিই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছু ক'রতে পারি না ব'লে মনে করেন ঘোষ বাবু ?"

প্রথমটা মিঃ ঘোষ কিছু একটা উত্তর করিলেন না। এতক্ষণ

মুগ্ধচিত্তে তিনি শ্রীমন্তের কথাগুলি শুনিতেছিলেন আর ভাবিতে-ছিলেন, এম্‌নিতর একটি নিরেট তিস্তরঙ্গ অঞ্চলে শ্রীমন্তের মতো এতবড় বিপ্লবী কর্ম্মীর উদ্ভব হইল কেমন করিয়া ! কলিকাতার নাগরিক জীবনে ব্যবসাগতভাবে এবং সমাজিক সম্পর্কে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও কর্ম্মীর সাথে প্রতিদিন তাঁর বহুতর আলোচনাই হয়, কিন্তু কাহারও মধ্যে এমন স্বচ্ছ বিপ্লবী চিন্তাধারা তিনি বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমন্তকে তাই অত্যন্ত বেশী ভাল লাগিয়া গেল মিঃ ঘোষের। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শ্রীমন্তের কথার উত্তরে কহিলেন, "আমারও চিরকালের প্রশ্ন এই, শ্রীমন্ত বাবু। বহুদিন বহু লোকের সাথে এই নিয়ে আলোচনা ক'রেছি, গ্রুপ গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছি ; কিন্তু দেখ্‌লাম—মানুষের উন্মাদনা বড় ক্ষণবুদ্‌বুদের মতো। পৃষ্ঠপ্রদর্শনী মনোবৃত্তিতে এখনও সারা দেশ আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। আর সেই জন্যেই একদিন পলাশীর রণক্ষেত্রে সিরাজের পতন ঘ'টেছিল, নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ, আর আজও আমাদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে পারছে না। একসাথে সমগ্র জাতি 'বন্দেমাতরম' ব'লে এই সংগ্রাম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি না ; আমরা কেউ বামে দুল্‌ছি—কেউ দক্ষিণে, কেউ সোস্যালিষ্ট্‌, কেউ কম্যুনিষ্ট, কারো হাতে চরকা, কারো হাতে লাল ঝাণ্ডা। সবাই ভাব্‌চি, আমার নেতৃত্বে আমার দলেরই হাতে আস্‌বে স্বাধীনতা। অথচ চেয়ে দেখ্‌চি না—কেমন ক'রে আমাদের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে

ক্যালেণ্ডারের দিনগুলি স'রে স'রে যাচ্ছে। এই আজ আমাদের অবস্থা শ্রীমন্ত বাবু। গভর্ণমেণ্ট্ চেয়ে চেয়ে দেখ্ছেন আর হাস্চেন, মনে মনে ব'ল্ছেন : ও ইণ্ডিয়ান্স্, উই ফিল্ পিট ফর ইউ।"

এবারে যেন একটা কঠিন আর্ত্তনাদের মতই সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল শ্রীমন্ত, বলিল: "না, না, আর ব'ল্বেন না ঘোষ বাবু, আর শুন্তে পারি না। বহু জীবন আজ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছায় কিছু ছেড়ে দেবো না। আমরা নতুন ক'রে জাতিকে গ'ড়ে তুলবো। দলে দলে আই-এন্-এ'র সৈনিকেরা আজ ফিরে আস্চে ভারতবর্ষে। তাদের মধ্যে আজ নতুন স্বপ্ন অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্ছে। পণ্ডিত জওহরলাল, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি দাঁড়িয়েছেন লালকেল্লায় সরকারী ট্রায়ালের বিরুদ্ধে। ন্যায় যা, ধর্ম্ম যা—চিরকাল তার জয় সুনিশ্চিত। নতুন ক'রে ভারতের জীবন-স্পন্দন অনুরণিত হ'য়ে উঠ্বে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে এমন এক নতুন জাতি গ'ড়ে উঠ্বে—যে জাতির পায়ে স্বেচ্ছায় প্রণাম রেখে বিদেশাগতেরা তাদের নিজেদের পিতৃভূমিতে চ'লে যেতে বাধ্য হবে। বিয়াল্লিশের 'কুইট্'-ডিক্লারেশন আজও একটা স্লোগান মাত্রই হ'য়ে আছে, কিন্তু তার সার্থক রূপ পাবে সেই দিনই, এবং সেদিনও বেশী দূরে নয়।"

মিঃ ঘোষ আর কথা তুলিলেন না।

ইতিমধ্যে নিখিল ব্রহ্ম পুনরায় আসিয়া সাম্‌নের একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। তাহার নিজের আসনটি আজ ভুলেও একবার সে স্পর্শ করে নাই। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রতি এটা তার বিশেষ সম্মান প্রদর্শন।

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা হঠাৎই যেন একমুহূর্তে থামিয়া গেল। নিখিল ব্রহ্ম প্রসঙ্গটী সম্পর্কে অবশ্য খানিকটা ইঙ্গিত করিল বটে, কহিল, "আলোচনা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেকদূর গড়িয়ে উঠেছে শ্রীমন্ত বাবু, না কি বলেন?"

কিন্তু শ্রীমন্তের কিছু একটা জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়াই উত্তরে মিঃ ঘোষ কহিলেন, "শুধু আলোচনা নয়, একটা ব্যথাময় আলোচনা। বাংলার নিভৃত অঞ্চলে এমন একটি সুন্দর অথচ জ্বলন্ত হৃদয় লুকিয়ে আছে জান্‌লে এর বহু আগেই আস্‌তুম এখানে। শ্রীমন্ত বাবুকে আজ আমার অভিনন্দন জানাবার ভাষা নেই।" তারপর শ্রীমন্তের মুখের পানে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমার একান্ত অনুরোধ রইল, যদি কখনো ক'ল্‌কাতায় যান, তবে আমার বাড়ীতেই উঠ্‌বেন।" বলিয়া পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শ্রীমন্তের হাতে দিলেন। মসৃন শ্বেতশুভ্র আইভরী কার্ডে লেখা:

Binayendra Nath Ghosh,
M.A. (Com), B.L.

Managing Director—
YOUNG INDIA BANKING SERVICE

Residence
5, Baladev Sinha Lane, Calcutta.

সেইদিকে বারকয়েক দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সকৌতুকে শ্রীমন্ত কহিল, "কমার্স প'ড়েও শেষ পর্য্যন্ত কি উকীল হবার ইচ্ছে রেখেছিলেন নাকি ঘোষ বাবু ?"

মিঃ ঘোষ এবারে হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন এবং একই মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত জীবনটার উপর দিয়া একটা স্মৃতির রেখা টানিয়া আনিয়া স্বল্পক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, "মাথা তো কোনোকালেই ঠিক ছিল না, নিতান্তই গত-জীবনের স্বাক্ষর ওটা। রেখেছি এই জন্যে যে, মাঝে মাঝে অতীতের চিহ্ন কিছু চোখে প'ড়লে নিজের কাছেই বিস্ময় এবং আনন্দ লাগে।" থামিয়া বলিলেন, "সিক্সথ্ ইয়ারে উঠে হঠাৎ ঝোঁক চাপ্‌লো —ল'টাও প'ড়ে ফেলি ; আর কিছু না ক'রতে পারি, অন্ততঃ ওকালতি ক'রে তো পেট চালাতে পারবো বটেই। হ'লোও তাই ; পাশ ক'রে বেরুলাম, বাবা জীবিত ছিলেন তখন, সরকারী চাক্‌রীতে পেন্সন্ পেতেন, চেষ্টা ক'রলেন সরকারী দপ্তরেই কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। কিন্তু লাভ হ'লো না, বেঁকে ব'স্‌লাম ; ব'ল্‌লাম—'সরকারী চাক্‌রী আমার জীবন থাক্‌তেও ক'রবো না।' শুনে বিরক্ত হ'লেন বাবা, ব'ল্‌লেন, 'তবে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, আমি আর কোনোদিকে চেষ্টা দেখ্‌তে পারবো না।' বাবার কথার ওপরে একরকম রাগ ক'রেই গিয়ে জয়েন ক'রলাম 'বারে'। তার কিছুদিন পরেই বাবা চক্ষু বুজ্‌লেন। ভাব্‌লাম, নতুন কি করা যায়, এখানে সেখানে আলোচনাও ক'রলাম। কিন্তু কাজ খুব তাড়াতাড়ি

এগোলো না। তারপর আজ এই পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেচি, এই ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং সার্ভিস্। দেশের অন্ততঃ কয়েকজন ইয়ং ম্যানকেও যদি এদিকে ধ'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই নিজের প্রচেষ্টা সার্থক মনে ক'রবো। তারপর ইচ্ছে আছে—শীগ্‌গিরই একবার মেসিনারিজের দিকে ঝুঁক্‌বো। ন্যাশ্‌নাল গুড্‌স্ সস্তায় টেক্‌সই ক'রে সরবরাহের ব্যবস্থা না ক'রলে আমাদের নেশনের পক্ষে বাঁচা কঠিন। আপনাদের পাঁচজনের শুভকামনা ও সাহচর্য্য পাবো, এইটেই দাবী করি শ্রীমন্ত বাবু।"

শ্রীমন্ত এবারেও সেইরূপ কতকটা কৌতুকের ভঙ্গীতেই কহিল, "কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের আশঙ্কারও কারণ হ'চ্ছে। ভাব্‌চি, মাল্‌টিমিলিয়নেয়র হ'য়ে শেষপর্য্যন্ত এই জাতীয়তার পরিবর্ত্তে পুঁজীবাদ প্রচার ক'রতে না সুরু করেন। বাংলা দেশে এ শ্রেণীর লোকের অভাব নেই।"

এবারও তেম্‌নি স্বভাব-সুন্দর হাসি হাসিলেন মিঃ ঘোষ, কহিলেন, "ক্ষেপেছেন শ্রীমন্ত বাবু! আমরা ব্রহ্মার পুত্র, নিজেদের আদর্শের জন্য অন্ততঃ অনেককিছু ত্যাগ ক'রতে পারি।"

শ্রীমন্ত এতটুকুও ইতস্ততঃ করিল না, কহিল, "আপনার মুখ থেকে ঠিক এই কথা শুন্‌বো ব'লেই আশা ক'রেছিলাম; ইউ আর গ্রেট, ডিভাইন্ ইউ আর, ঘোষ বাবু।" তারপর থামিয়া কহিল, "যেমন বিচিত্র আপনার জীবন, তেম্‌নি আপনার মতবাদ এবং উদ্দেশ্যও আদর্শপূর্ণ। একটু আগেই যে-কথাটার

উল্লেখ ক'রেছি, সেটা শুধুই হাসির কথা নয়। ক'লকাতায় বড় বেশী যাওয়া পড়ে না বটে, কিন্তু সেখানকার কয়েকজন মিল-মালিক ও ব্যাঙ্কারের কথা অন্ততঃ জানি—যাঁরা বিশেষ-ভাবে বাংলার গত দুর্ভিক্ষে লোক-মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে চাষী আর মহাজনদের কাছ থেকে তাঁরা কম দামে চাল কিনে মজুদ ক'রেছেন নিয়ে তাঁদের প্রাইভেট গুদামে, তারপর সেই চাল গেছে অতিরিক্ত লাভের পাওনায় গভর্ণমেণ্ট-কনজাম্‌শনে; তাঁদের যে মিল আর ব্যাঙ্কে টিম্ টিম্ ক'রে একদিন বাতি জ্ব'ল্‌তো, চালের চোরাই টাকায় সেই মিল আর ব্যাঙ্ক ফুলে ফেঁপে উঠ্‌লো। অথচ আশ্চর্য্য দেখুন ঘোষ বাবু, তাঁদের মধ্যেই কেউ বা কোনো আশ্রমের মন্ত্র-গুরু, কেউ গেলেন ভাইস্‌রয়েস্ ক্যাবিনেটে, কারুর ছেলে পেলো ন্যাশ্‌নালিষ্টের আখ্যা। যে ন্যাশ্-নালিজ্‌মের পরাকাষ্ঠা তাঁরা দেখালেন, তাতে ইচ্ছে হয়, একটা বন্দুক নিয়ে গিয়ে তাঁদের সাম্‌নে দাঁড়াই, বলি, 'কোন্ পুণ্যে তোমরা এখনও সমাজে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাও, ব'ল্‌তে পারো? পারফেক্ট্ এ্যাণ্ড আনচ্যালেঞ্জ্‌ড্ ডেথ্—দিস্ ইস্ অন্‌লি দি রিওয়ার্ড ফর ইওর ড্রামেটিক্ ন্যাশ্‌নালিজ্‌ম্'।"

একটু দম নিলো শ্রীমন্ত, তারপর পুনরায় কহিল, "তাই ব'ল্‌ছিলাম, ডিভাইন্ ইউ আর ঘোষ বাবু, সমাজের এই সব পশুর কাছে আপনি দেবতা। অর্থকেই যদি জীবনের চরম লক্ষ্য না মনে ক'রে উপলক্ষ মাত্র ব'লে ভাবতে পারে আমাদের

সমাজ, তবে আর অর্থনৈতিক সমস্যায় দেশে এমন বর্ণগত বৈষম্য আর সংঘাত থাকে না। আপনার আদর্শকে আমি নতমস্তকে অভিবাদন করি। আপনার শ্রমলব্ধ অর্থে যেন এই মুমূর্ষু বাঙালী-সমাজের অন্ততঃ একটা খণ্ড অংশও ঋজু ও বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, চিরকাল এই দাবীই ক'রবো আপনার কাছে। কোনো প্রয়োজনে যদি কখনো সত্যিই ডাকেন, পিছনের সব কিছু ত্যাগ ক'রে নিশ্চয়ই গিয়ে দাঁড়াবো সেদিন আপনার পাশে ; এ প্রতিশ্রুতি আনন্দের সঙ্গেই আজ দিচ্ছি।"

একটা মুখর আত্মতৃপ্তি যেন এতক্ষণ বোধ করিতেছিলেন মিঃ ঘোষ। শ্রীমন্তের কথার পরে এবারে তিনি আর এমন কিছু একটা কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহা বলিয়া শ্রীমন্তকে খুসী করা না যাউক্, অন্ততঃ কিছুটা সময়ও অতিবাহিত হইতে পারে।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল।

সুযোগ বুঝিয়া এবারে নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "যদি আর দু'একটা দিন দয়া ক'রে নাই থাক্‌বেন, তবে এইবেলা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মগুলি দেখে নিলে সুবিধে হ'তো না কি স্যার! এরপর সিন্ধুরাম আবার থাক্‌তে চাইবে না; থাকে বটে ব্যাঙ্কেই, কিন্তু খাওয়া-দাবার ওর একটা স্বতন্ত্র আড্ডা আছে। তা'ছাড়া ব্রজবিহারী বাবুরও—"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "কাজ তো ঠিকই চ'লেছে, দেখ্‌বার বড় একটা আর কি আছে? তবে হ্যাঁ, একটা জিনিষ,

দিনকাল বিশেষ ভালো নয়, ওভারড্রাফ্‌ট্‌ সম্পর্কে একটু কেয়ারফুল হবেন। কারেণ্ট্‌ এ্যাণ্ড্‌ সেভিংস্‌ সম্পর্কে শ্রীমন্ত বাবু আছেন, ওঁকে আমার কিছু ব'ল্‌বার নেই।" তারপর থামিয়া কহিলেন, "ডাকুন একবার ব্রজবিহারী বাবুকে।" বলিয়া হাতঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য করিলেন মিঃ ঘোষ।

সাম্‌নেই কি একটা কাজে বাহির দিয়া ঘুরিতেছিল ব্রজবিহারী, আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "কালই কিন্তু আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। লঞ্চে যাতে যায়গা পেতে পারি, সেইদিকে একটু লক্ষ্য রাখ্‌বেন।"

ব্রজবিহারী যেন অনেকখানি গলিয়া গেল, এইভাবেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সে-কথা আপনার ব'ল্‌তে হবে কেন স্যার? সময়মতো সব ব্যবস্থা আমি ক'রে রাখ্‌বো।" ঈষৎ থামিয়া কহিল, "ব্যাঙ্কে কতকগুলি জিনিষের বড় অভাব হ'য়ে প'ড়েছে আমাদের; উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম্ম, চেক বই, কিছু প্যাড আর অন্ততঃ একটা আল্‌মারী,—এ না হ'লে বড় অসুবিধে পোয়াতে হচ্ছে, স্যার।"

"ছাট্‌স্‌ লুক্‌-আউট্‌ অফ্‌ ম্যানেজার। হেড্‌ আপিসে রিকুইজিশন্‌ পাঠাবেন, ব্যবস্থা হবে।" মিঃ ঘোষ কহিলেন, "মিঃ ব্রহ্ম যখন ব'ল্‌লেনই কথাটা, আসুন দিকি আপনার খাতাপত্র একবার, দেখে যাই।"

যাবতীয় কাজ পূর্ব্ব হইতেই ব্রজবিহারীর সম্পূর্ণ মিলানোই

ছিল, এবারে একে-একে খাতাপত্র আনিয়া মিঃ ঘোষকে দিয়া সই করাইয়া লইল।

শ্রীমন্ত কহিল, "এদিকে তো বিকেল একরকম গড়িয়ে গেল, চলুন না ঘোষ বাবু, আপত্তি যদি না থাকে, তবে একবার বন্দরের এ-পাড়টা ঘুরে দেখে যাবেন। সব সময় ক'ল্‌কাতায় থাকেন, পল্লী বাংলার কাদা আর কাঁচা মাটি একেবারে মন্দ লাগ্‌বে না।"

হাসিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আমাকে কি খাঁটি ক'ল্‌কাতার লোক ঠাউরেই ব'সে আছেন নাকি? আমার দেশও এই পূর্ব্ববঙ্গেই, ময়মনসিংহে; সুতরাং কাদা, জল আর কাঁচা মাটির সঙ্গে আমার শুধু পরিচয় নয়, রীতিমত আত্মিক যোগ আছে। চলুন ঘুরে আসি: বিকেল বেলাটা সত্যিই ঠায় ঘরে ব'সে থাক্‌তে মন চায় না।"

মিঃ ঘোষ উঠিয়া পড়িলেন। বাহির হইয়া পড়িল তাঁহাকে লইয়া শ্রীমন্ত ও নিখিল ব্রহ্ম।

অপরাহ্নের দক্ষিণা বাতাসে টল্‌মল্ করিতেছে আড়িয়াল-খাঁ'র কালো জল। পাশাপাশি কতকগুলি একমাল্লাই নৌকায় ছৈয়ের নিচে বসিয়া সারিন্দার সুরে গানে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে মাঝিরা। কোথায় ছিল এতদিন এই নৌকাগুলি, কে জানে! বাংলায় জাপানী আক্রমণের মুখে সরকারের চোখে পড়িলে এ নৌকাগুলিও কবে না জানি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত।

ভগবান রক্ষা করিয়াছেন দুর্গত মাঝিদের জীবন; গানটা এমন ভাবে আজ তাই সহজ গলায় জমিয়া উঠিয়াছে ঃ

দ্যাশের লোক সব কোথায় তোরা,
দ্যাশ যে পুইড়া হ'ল শ্মশান :
ও—তারে বারো ভূতে লুইটা খাইল,
শিকর-ধানে' জ্বালে রে মশান !···

একান্তমনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন মিঃ ঘোষ। তারপর পুনরায় চলিতে চলিতে কহিলেন, "জানেন শ্রীমন্ত বাবু, এই হ'লো খাঁটি লোক-সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের আজ যে সংস্করণ দেখতে পাই, তার প্রথম সূত্রপাত হ'য়েছিল বাংলার এই নদী, মাঠ আর জলাভূমি থেকে। ক্রমে আজ তা' বৃহৎ বনস্পতি হ'য়ে উঠেছে। এই হ'লো খাঁটি সঙ্গীত, যার মধ্যে দেশ-কালের পূর্ণ অবস্থা বিস্তৃতভাবে মিশে আছে। যত বিজ্ঞান আর সিনেমেটোগ্রাফ্ই দেশে আজ গ'ড়ে উঠুক, বাংলার এই আসল রূপকে কোথাও খুঁজে পাবেন না।"

সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধেও মিঃ ঘোষের প্রবণতা যে কিছু একটা কম নয়—এ-কথা ভাবিয়া মনে মনে শ্রীমন্ত মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। বাংলার লোক-সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীমন্ত জানে ; সাহিত্যের প্রতি প্রাণের সাধারণ টানটা তাহারও কম নয়। কবি জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরমানন্দ অধিকারীর তুক্, রূপ অধিকারীর ঢপ আর লালনসাই'য়ের দেহতত্ত্ব—অনেক

কাব্য ও সঙ্গীত-ইতিহাস সে পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বাংলার যে প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করিয়াছে সে, তাহা পরম মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত। মিঃ ঘোষের কথায় শ্রীমন্ত কহিল, "বাংলার সেই প্রাণের সুর শুধু এই মাঝিদের কণ্ঠেই নয়, বাংলার সমস্ত প্রকৃতিতে তা মিশে আছে। পল্লী-বাংলায় আপনার বাড়ী বটে ঘোষ বাবু, কিন্তু সম্ভবতঃ পল্লীর একেবারে প্রত্যন্ত নিভৃতে আমার মতো ঘুরতে পারেন নি! বাংলার বাউল, আধা আখ্ড়াই আর ভাটিয়ালে কেমন ক'রে যে বন-প্রকৃতি আর জল-মাটি মিশে আছে, অন্ততঃ কিছু কিছু তার জানি।"

আঁড়িয়াল-খাঁ'র পাড় ঘেষিয়া ক্রমান্বয়ে সাম্নের 'আল'-পথে আগাইয়া চলিতেছিল তিন জোড়া পা। স্বল্প থামিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "লালনসাই-সুর নিয়ে একদিন কিছু আলোচনা প'ড়ছিলাম। পলাশীর মাঠে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন হ'লো; ক্লাইভের লাল-কুর্ত্তী সৈন্যেরা ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে মীরমদনকে মারলো। স্বাধীন বাংলার সমাধি-রচনা হ'য়ে গেল সেই যুদ্ধে। পল্লীকবি মুখে মুখে ছড়া বাঁধ্‌লো—

কি হ'ল রে জানো?
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ'।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে র'য়ে,
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে স'য়ে!
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তী গায়
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়।

সেই করুণ চিত্রটির নির্ম্মম কাহিনীকে কবি ভাষা দিতে গিয়ে ব'ল্‌লো—

নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী,
ক'ল্‌কেতায় ব'সে কান্দে মোহনলালের পুতি।
তুধে ধোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান,
মীরজাফরের দাগাবাজীতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে ম'লো নবাব খোসবাগে মাটি,
চান্দোয়া খাট্টায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি।

এ শুধু ঐতিহাসিক তত্ত্বই নয় ঘোষ বাবু, এর মধ্যে একদিকে যেমন দেশের তৎকালীন চিত্র একটা বেদনাময় রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে কাব্য ও ছন্দেও চমৎকারিত্ব কম পায় নি। পার্থক্য বড় বেশী নেই; সেটা ছিল কোম্পানীর আমল আর এটা খাস সাম্রাজ্যবাদী যুগ, কথা একই। আজ মাঝির গলায় যা শুন্‌তে পেলেন, তা এই সাম্রাজ্যবাদী পীড়নেরই তুঃসহ রূপের কথা। এ সত্য ব'লেই প্রাণস্পর্শী ঘোষ বাবু, নইলে এমন ক'রে প্রাণে এসে বিঁধ্‌তো না।"

মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তিনজোড়া পা: মিঃ ঘোষ, নিখিল ব্রহ্ম আর শ্রীমন্তের। ধীরে ধীরে আড়িয়াল-খাঁ'র বুকে সন্ধ্যার হিমস্পর্শ ঘন হইয়া উঠিতেছে। বড় একটা লক্ষ্য আছে যে সেদিকে মিঃ ঘোষ আর শ্রীমন্তের, নিখিল ব্রহ্ম তেমন কিছু একটা ভাবিতে পারিল না। আলোচনার

মধ্যে একরকম কোণঠাসা হইয়াই গিয়াছে সে। অথচ মাঝে মধ্যে 'হ্যাঁ' 'হুঁ' কিছু একটা বলিয়াও যে কথায় যোগ দিবে, সেই দুঃসাহসই বা কোথায়? 'সাহিত্য'-অর্থে সহজলভ্য দুই একখানি নাটক উপন্যাস পড়া ভিন্ন তাহার সংজ্ঞা বিচারের মতো আসলে চিত্ত-ক্রিয়ারই অভাব নিখিল ব্রহ্মের মধ্যে। নীরবে পথ চলা ভিন্ন উপায় কি? অথচ এই নীরবতা যে কতখানি পীড়াদায়ক, তাহা ভাবা কঠিন। শ্রীমন্তের কথার জবাবে মিঃ ঘোষ কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া নিখিল ব্রহ্ম এবারে কহিল, "চলুন, এখন ফেরা যাক্; ওপাশে পাটের আপিস, শ্রীমন্ত বাবুর এলাকা ওটা। একবার হয়ত ওটাকে প্রদক্ষিণ না করিয়ে শ্রীমন্ত বাবু নিশ্চয়ই ছাড়বেন না! আমাদের বিজ্‌নেস্ অবিশ্যি ঐ পাটের আপিসের উপরেই অনেকখানি খাড়া হ'য়ে আছে। তা ছাড়া এখানে দেখবার মতো কিছু নেই ব'ল্‌লেই একরকম চলে। ফাঁকা মাঠে চোর-কাঁটা, কই-ওকড, বিন্না আব নিসিন্দে,—দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে বিশেষভাবে এগুলিই।"

কিন্তু কথাটা শ্রীমন্তকে আদৌ আনন্দ দিল না। আলোচনার গতিটা এতক্ষণ বেশ একটা সুরে চলিতেছিল, হঠাৎই যেন সেই মনোময় সুরটাকে নিতান্তই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণায় কাটিয়া দিল নিখিল ব্রহ্ম।

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "এই চোর-কাঁটা, বিন্না আর নিসিন্দেও যে বাংলারই খাঁটি ও অকৃত্রিম বস্তু! পল্লীর শোভা এই

দিয়েই বেড়েছে মিঃ ব্রহ্ম। দাঁত থাক্‌তে ঠিক দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না। ক'ল্‌কাতার মতো যায়গায় এর সামান্য কিছু স্পর্শ পেলেও আনন্দের সীমা থাকে না। মফঃস্বল থেকে এম্‌নি সব ঘাস আর আগাছা নিয়েই সেখানে রচনা হয় কুঞ্জ। যেমন ক'রে ব'ল্‌ছিলাম—পল্লী-সাহিত্য নিয়ে আজ বনস্পতি রচনা হ'য়েছে বাংলা ভাষার। আগাছার দোষ কি? মানুষের মনই যে এখানে কাঁচা সবুজ হ'য়ে ওঠে নরম মাটির স্পর্শে, আর আগাছা তো মূল রসই পায় সেই মাটির। যায়গায় ব'সে সেই জায়গার মাহাত্ম্য ঠিক সব সময় বুঝে ওঠা যায় না মিঃ ব্রহ্ম। আর কিছু না থাক্‌, অন্ততঃ আঁড়িয়াল-খাঁ'র মতো নদী আর কাঁচা মাটি আছে তো এখানে, উপভোগের পক্ষে এই বা কম কি?" তারপর থামিয়া কহিলেন, "শীগ্‌গির যে এদিকে আবার কবে আসা হয়, আঁচ করা কঠিন। এলামও একরকম হঠাৎ, যেতেও হবে কালই। এই হুড়তাড়ের মধ্যে লোকসান যেটুকু, তাও বেশ ভালো লাভের অঙ্কেই পুষে গেল; শ্রীমন্ত বাবুকে পাওয়া কি কম লাভের কথা? চলুন বরং আর একটু ঘুরেই না হয় যাই!"

আপত্তি তোলা কঠিন হইল এবারে নিখিল ব্রহ্মের পক্ষে; আর শুধু তাহাই নয়, নিজেকে অনেকখানি যেন অপ্রস্তুত বোধই করিল সে। তাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় মিঃ ঘোষ ও শ্রীমন্তের অনুগমন করিয়া চলিল মাত্র।

কথাচ্ছলে মিঃ ঘোষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "প্রসঙ্গক্রমে

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেল মিঃ ব্রহ্ম। কথাটা আপনার ঐ কই-ওকড় সম্পর্কেই। সেবার দেশ থেকে আমার ভাইপো এলো ক'ল্‌কাতায়, ইস্কুলে পড়ে, সামারের ছুটি তখন তার। ইচ্ছে যে, কাকার কাছে কিছুদিন থেকে যায়। বল্‌লাম, 'বেশ তো, এসেছ,—মিউজিয়াম, জ্যুলজিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি ঘুরে-টুরে দেখে যাও।' দেখ্‌লোও বটে। কিন্তু কি জানি, ভিতরে ভিতরে সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া নিয়েই এসেছিল দেশ থেকে। হঠাৎ একদিন শুয়ে প'ড়লো, জ্বর উঠ্‌লো সাড়ে চার। ভাব্‌লাম—দু'এক বড়ি কুইনিনেই সেরে যাবে, কিন্তু সেরে যাবে কি, বরং আরও উপসর্গ বেড়ে গেল কতকগুলো। ডাক্তারের সাথে বড় একটা সম্বন্ধ আমার কোনো কালেই নেই : বিশেষ শুভানুধ্যায়ী এক ক'ব্‌রেজ আছেন ঋষিকেশ গুপ্ত, ডাকালাম তাঁকে। উপসর্গ, বিসর্গ আর নিসর্গ যাই বলুন, সব কিছু পরীক্ষা ক'রে বিধান দিলেন তিনি কয়েক বড়ি অসুধের সাথে এই কই-ওকড়। ঝক্‌মারীর একশেষ, কই-ওকড় আবার জোটাই গিয়ে কোথায়? ব্যাঙ্কের বেয়ারাগুলোকে ব'ল্‌লাম, এর-ওর কাছে খোঁজ ক'রলাম, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বস্তু; ক'ল্‌কাতার মতো ইঁট-পাথরের দেশে কই-ওকড় গজাবে কোথায়? বিপদে প'ড়ে ক'ব্‌রেজকে গিয়ে ব'ল্‌লাম, 'দোহাই গুপ্ত মশাই, দয়া ক'রে ঐ গাছ-গাছড়া ইত্যাদি বাদ দিয়ে এবারে নতুন অনুপানের বিধান দিন।' শুনে কিছুক্ষণ খুব হাসলেন ক'ব্‌রেজ, তারপর প্রবাদ-বাক্যের মতই রসিকতা ক'রে ব'ল্‌লেন—'কই-ওকড়ে

ক'রবে না চীট্—(যদি) মার্কেটে যাও কলেজ ষ্ট্রীট্।' শুন্‌লাম, একমাত্র আয়ুর্ব্বেদিক্ সাপ্লায়ার সেখানে বিজয় পোদ্দার। গেলুম তার কাছে, এবং পেলামও, তবে টাট্‌কা নয়—শুক্‌নো। তবেই বুঝুন মিঃ ব্রহ্ম, হাউ গ্রেট্ ইজ্ ইওর কই-একড়! কবে শুন্‌বেন—নতুন 'ইউ-এস্-এ মেডিসিন' এসেছে : এক্স্‌ট্রাক্ট্ অব্ কাই-ইকাড়।"

নিজের রসিকতায় নিজেই একবার হাসিলেন মিঃ ঘোষ। শ্রীমন্ত কিম্বা নিখিল ব্রহ্মও হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না; তাহারাও সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "তাই তো বলি মিঃ ব্রহ্ম, কার মর্য্যাদা কোথায়—বলা বড় কঠিন। এই যে মাঝিরা সারিন্দা বাজিয়ে গানের সুরে সুরে অপরাহ্নিক্ কালটাকে এমন ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছে, এ হয়ত আপনাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে আদৌ দৃষ্টি দেবার মতো নয়, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরও মূল্য যথেষ্ট, এবং সে মূল্য হঠাৎই কিছু একটা নিরূপণ করা কঠিন।"

উদ্গত হাসির মুখে হঠাৎই যেন আবার কেমন নিভিয়া গেল নিখিল ব্রহ্ম। তাহার সমস্তখানি অপ্রস্তুততার উপরে সহসা যেন একটা গভীর কালির প্রলেপ লেপিয়া দিলেন মিঃ ঘোষ। কথাটা অস্বীকার করিতে পারিল না নিখিল ব্রহ্ম।

শ্রীমন্ত বলিল, "বাস্তবিকই কথাটা এক তিলও মিথ্যে নয়। কচুরীপানার ভিতর দিয়ে যে সোয়ারী দিনরাত তার নৌকো

চালিয়ে নেয়, কচুরীপানাকে বিশেষ একটা দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌বার অবকাশ তার আর থাকে না। তারও যে সৌন্দর্য্য আছে—সেটা উপভোগ ক'রতে হ'লে স্থান-কালই শুধু নয়, মনেরও একটা বিশেষ অবকাশ চাই। কিন্তু সেই অবকাশ কি মন আমাদের কখনো মঞ্জুর করে? 'ক্রশিং আউট্‌ দি হ্যাপ্টি পিরিয়ড্‌স্‌'—এই হ'চ্ছে আজ আমাদের সমাজ-জীবনের ধারা। চোখ সব সময়ের জন্যেই ধেঁধে আছে; যে দৃষ্টি দিয়ে সুকুমার কলা দর্শন ক'রবো—সেই দৃষ্টি বা অবকাশ কোথায়? মিঃ ব্রহ্মের ইঙ্গিতটি অর্থপূর্ণ, তর্কের খাতিরে ওঁকে যে একেবারেই বাতিল ক'রে দিতে পারি, তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব! ওঁর বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়।"

অপাঙ্গে একবার নিখিল ব্রহ্মের মুখের পানে চাহিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার যথেষ্ট ঘোষ বাবু, বস্তু ও ভাবের মিশ্রণে দৃষ্টিশক্তি আজ একটা স্থির লক্ষ্যে এসে পৌঁছেচে আপনার; সেই লক্ষ্যের সাথে অন্যের দৃষ্টির যদি তুলনা ক'রতে যান, তবে নিজেকেই বিপর্য্যস্ত করা ভিন্ন আর কিছু নয়। আসলে দৃষ্টিভঙ্গিটা স্বতন্ত্র বস্তু। ওটা আত্ম-স্বকীয়তায় গ'ড়ে ওঠে;—এই নিয়ে কখনো তর্ক চলে না।"

মিঃ ঘোষ আর বড় একটা দ্বিরুক্তি করিলেন না।

নিখিল ব্রহ্ম সম্ভবতঃ অলক্ষ্যেই এবারে একটা ভারী নিশ্বাস ফেলিয়া কিছুটা হাল্কা হইতে চেষ্টা করিল।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

কৃষ্ণা-তিথির রাত্রি। পথ-প্রান্তর ক্রমশঃই আবছা হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ঘোষই এবারে উপযাচক হইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা নিখিল ব্রহ্মের বাসাতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পথের ক্লান্তিতে দিনের অর্দ্ধেক বেলা স্নানাহার ও সামান্য নিদ্রার মধ্য দিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন মিঃ ঘোষ। পড়ন্ত বেলায় শরীরটা অনেকখানি ভারমুক্ত বোধ করিয়াই আলোচনায় আনন্দে দিব্যি সময় কাটাইয়া দিতে পারিলেন। অন্ধকার সন্ধ্যাটাও বড় কম উপভোগের নয়। বন্দরের বুকে সন্ধ্যাব ম্লানিমা। জোনাকির আলো চারিদিকে ঝিক্‌মিক করিতেছে। এমন সন্ধ্যার সাথে গত সাত বৎসরের মধ্যে পরিচয় নাই মিঃ ঘোষের। সাত বৎসর বৈ কি? ঊণচল্লিশ সালের জানুয়ারী হইতে পঁয়তাল্লিশ সালের এই নভেম্বর। যুদ্ধ-বিদ্রোহ দুর্ভিক্ষ-মহামারী—মহানগরীর বুকে তিলে তিলে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এই সাত বৎসর ধরিয়া। বিশৃঙ্খল জীবনপ্রবাহ এই সাত বৎসরের। একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি কর্ম্মে শৈথিল্য আনেন নাই। নিয়মিত ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া গিয়াছেন। বোমা পড়িয়াছে কলিকাতায়; শিয়ালদহ আর হাওড়া দিয়া লোক পলাইয়াছে কাতারে কাতারে। কিন্তু অটল আত্মবিশ্বাসের উপরে ভর করিয়া শুধু কাজ করিয়া গিয়াছেন তিনি। সেই সাত বৎসর পরে

আজ্‌কের এই পল্লী-বাংলার মুক্ত পরিবেশ আর স্নিগ্ধ সন্ধ্যা একটা অদৃশ্য জগতের স্বপ্নের রূপ লইয়া আসিয়াই ধরা দিয়াছে মিঃ ঘোষের কাছে।—মন্থর পায়ে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া একটা ইজি-চেয়ারের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিলেন তিনি।

শ্রীমন্তকে অব্যাহতি দেয় নাই নিখিল ব্রহ্ম। মাঝপথে একবার আপত্তি তুলিয়াছিল বটে শ্রীমন্ত, কিন্তু নিখিল ব্রহ্ম তাহাতে কান দেয় নাই।

খোঁজ পাইয়া ঘরের আড়াল হইতে চাপাস্বরের উপরে একটু বিশেষ জোর দিয়া ছেলের উদ্দেশে বিমলা দেবী কহিলেন, "শ্রীমন্ত যেন না খেয়ে যায় না নিখিল। মালতির রান্না শেষ হ'য়েছে, খাবার যায়গা এই হ'লো ব'লে।"

শ্রীমন্ত জানে, এই আদেশের পিছনে কতখানি জোর রহিয়াছে বিমলা দেবীর। তাই আপত্তি তোলা তো দূরের কথা, বরং এবারে একেবারে বিমলাদেবীর কাছে আসিয়াই সে কহিল, "মা'র আদেশ লঙ্ঘন ক'রবো, এমন সাহস নেই। তা ছাড়া একবার যখন এসে প'ড়েছি, অন্ততঃ খাবার আসনেও ঘোষ বাবুর সাথে আরও কিছুক্ষণ না কাটিয়ে যেতে পারলে নিজেই ক্ষোভে ম'রে যাবো। তা ছাড়া মালতির রান্না—"

সাম্‌নেই রান্নাঘর। কথাটা কানে যাইতেই উনুনের পাশ হইতে স্বর তুলিল মালতি: "এই বুঝি আবার ঠাট্টা আরম্ভ হ'লো, শ্রীমন্তদা ?"

উত্তরে শ্রীমন্ত কিন্তু আর কিছু একটাও বলিল না। শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ হাসিল, তারপর পুনরায় আসিয়া মিঃ ঘোষের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল।

খাইতে বসিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আপনার লিটারেরী কন্‌সেপ্‌সন্ আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে শ্রীমন্ত বাবু। বেশ কাট্‌লো বিকেলটা। এ্যাড্রেসের যে কার্ড দিয়েছি, নিশ্চয়ই তা হারাবেন না মনে করি। অবকাশ কম, নইলে কয়েকটা দিন থাক্‌তে পারলে আরও প্রচুর আনন্দ নিয়ে ফিরতে পারতুম। সময় ক'রে নিশ্চয়ই একবার ক'লকাতায় আমার বাড়ীতে যেয়ে উঠ্‌বেন। আপনার সঙ্গ সত্যিই ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।"

আনত দৃষ্টিতে শ্রীমন্ত কহিল, "বার বার এ-কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন ঘোষ বাবু। আপনারা মহৎ এবং মহাজন ব্যক্তি সমাজের, আপনাদের সংস্পর্শে আসা নিতান্ত ভাগ্যের দরকার। ব'লতে বাধা নেই, প্রথমটা একটু সঙ্কোচই এসেছিল বৈ কি আপনার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে? কিন্তু ভুল ভাঙ্‌লো অল্পক্ষণেই। আপনার মতো প্রাণের এমন সরলতা দিয়ে যদি মানুষ আজ মানুষকে কাছে টান্‌তে পারতো, তবে আর দুঃখ থাক্‌তো না সমাজে।"

ফল উল্টা ফলিল। লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবারে মিঃ ঘোষই। স্বল্পক্ষণ থামিয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন, "রক্ষা করুন শ্রীমন্ত বাবু। জলের ছিঁটে দিতে গিয়ে যে শেষ পর্য্যন্ত বাঁশের

গুঁতো খেতে হবে, তা ভাবতে পারি নি। আপনার সাথে কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।”

কথা শুনিয়া শ্রীমন্ত এবারে বহুক্ষণ ধরিয়া উচ্চশব্দে হাসিল। কী একটা পরিবেশন করিতে আসিয়া মালতিও ঈষৎ মুচ্‌কি হাসিয়া গেল।

কাহারও মুখেই আর কোনো কথা প্রকাশ পাইল না।

রাত্রি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল।

আহারান্তে আরও কিছুক্ষণ বসিল শ্রীমন্ত, তারপর বিদায় লইয়া কহিল, “কাল ভোরে যাওয়াই যখন স্থির ক’রেছেন ঘোষ বাবু, তখন আর বিশেষ রাত্রি ক’রবেন না। তাড়াতাড়ি শুয়ে না প’ড়লে ওদিকে আবার সকাল-সকাল উঠে লঞ্চ্ ধ’রতে অসুবিধে হবে।”—তারপর আর বিন্দুমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল শ্রীমন্ত।

কৃষ্ণাতিথির রাত্রি। বাহিরের যাযাবর জোনাকীগুলি তখন তাদের প্রদীপ্ত আলোক-শিখায় আরও তীব্রবেগে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে বায়ুমণ্ডলে। আর বাদুড়ের বিক্ষিপ্ত ডানা-ঝাপ্টানির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে কাছে-দূরের অশ্বত্থ আর বন-ঝাউয়ের পাতার আড়াল হইতে।

নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রার মধ্য দিয়াই রাত্রি প্রভাত হইল। ইচ্ছা ছিল, ভোরে উঠিয়া লঞ্চ্-ঘাটে যাইয়া শ্রীমন্ত 'সি-অফ্' করিয়া আসিবে মিঃ ঘোষকে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইয়া অনুমান করিয়া দেখিল, যাইয়া আর লঞ্চ্ ধরা যাইবে না। কিছুদিন হইল কোথা হইতে একটি সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্ ষ্টোভ্ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। দৈনন্দিন সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা-গুলি নির্ব্বিঘ্নে তাহাতেই চলিয়া যাইত। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া অল্পক্ষণেব মধ্যেই এবারে তাই ষ্টোভ্ জ্বালিয়া একবাটী চা তৈরী করিয়া লইল শ্রীমন্ত। তারপর কাগজপত্র ঘাঁটিয়া পুরানো একখানি মাসিক পত্র লইয়া বসিল। বাংলার মন্বন্তর-কালের ছোট্ট একটি কাহিনী ঃ

'নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার মহানগরীর রাজপথে। এখানে ওখানে স্লিট্-ট্রেঞ্চের মধ্য থেকে ময়লার উগ্র গন্ধ ভেসে আস্‌চে। পথের গ্যাস-পোষ্ট্‌গুলি শ্মশান-বৈরাগীর মতো আত্ম-তপস্যায় দাঁড়িয়ে আছে। ইলেক্‌ট্রীকের আলো থেমে গেছে বাটির মতো ছোট ছোট টিনের বাঁকা সেডে। কখনো মড়া-কান্নার শব্দ উঠছে সাইরেনে। এই বুঝি বেরিয়ে এলো একদল এ. আর. পি ! ভয় নেই, এই মুহূর্ত্তে অন্ততঃ বোমা বর্ষণ ক'রবে

না এসে জাপানীরা। মৃত্যু-মহোৎসবের মধ্যে তাদেরও ক্লান্ত চোখে ঘুম আছে, তাদেরও আনন্দ আছে, যেমন ক'রে আনন্দ-মুখর হ'য়ে উঠেছে এই মহানগরীর প্রেক্ষাগারগুলিও ঃ নাচ ও গান চ'লেছে মঞ্চে ও পর্দ্দায়; যৌবনের স্বপ্ন দেখ্‌চে লাইট্‌ হাউস্‌, মেট্রো, রূপবাণী, রঙ্‌মহল···। . .

'আর একটু আস্তে চলো বন্ধু। ক্ষতি কি আর একটু মন্থর পায়ে হেঁটে চ'ল্‌লে এইখান দিয়ে! চেয়ে দেখ'—যৌবনের স্বপ্ন-রাজ্যে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ছে ঐ ব্যাফ্‌ল্‌ড্‌ওয়ালগুলির গা বেয়ে। কারা যেন ছায়ার মতো নরকঙ্কাল দাঁড়িয়ে ওখানে, কঁকিয়ে উঠ্‌ছে ক্ষুধার জ্বালায় ঃ দে একটু ফ্যান দে মা, রাজরাণী হ'য়ে সুখে থাকবি,···একমুঠো এঁটো ভাত দিয়ে দুধের ছেলেটাকে বাঁচা আমার,···একটু ফ্যান মা, একটু ফ্যান—।

'আর একটু উপরে চেয়ে দেখ'—ঐ দোতলার ঘরে ঃ রেডিও-এ গান চ'লেছে কোন্‌ মীনাক্ষি দেবীর ; মাথার উপরে ডি. সি. কারেণ্ট্‌ পাখা চ'লেছে মাঝারি স্পীডে। নিস্পন্দভাবে ওপাশে দেয়ালের গায়ে লেগে আছে রেগুলেটারটা।···

'ব'ল্‌তে পারো বন্ধু, চালের দাম আজ বাজারে কত উঠ্‌লো ?'···

গল্পের গোড়ার দিক এটা। নতুন টেকনিকে কোন্‌ এক আধুনিক প্রগতিশীল লেখকের রচনা। সমাজের খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক রূপের একটি সার্থক অভিব্যক্তির স্পর্শে মনে-মনে একদিকে যেমন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল শ্রীমন্ত,

অন্যদিকে সামাজিক ভেদ-নীতি ও বিরাট ভাঙনের ইঙ্গিতেও বড় কম বিষাইয়া উঠিল না সে নিজের মধ্যে। প্রতিমুহূর্ত্তেই এই ধ্বংসমুখীতা লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে শ্রীমন্ত। অযোধ্যার চরে সেই যে রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে একটি নিঃসহায়া মহিলার মর্ম্মন্তুদ আত্মকাহিনী সে শুনিয়াছিল সেদিন, কিম্বা মুমূর্ষু শোকাতুর দেখিয়াছিল সেই যে গরু-বিক্রী-প্রয়াসী সর্ব্বহারা ভিখারী লোকটিকে, তাহাদের সাথে এই গল্পে বর্ণিত মহানগরীর ঐ ক্ষুধিত নর-কঙ্কালগুলির কি এতটুকুও পার্থক্য আছে? যাহারা গ্রামের ভিটায় পড়িয়া থাকিয়া খাবারের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই সেদিন, তাহারাই তো ক্ষুদ-কণার সন্ধানে দলে দলে ছুটিয়াছিল একসময় কলিকাতার রাজপথে। কাহারা যেন তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল: 'ক্যান্টিন আছে, এ-পথে ও-পথে রোজগারের সুযোগ আছে; ছুটে পড়ো।' সেই 'ছুটে-পড়া' মানুষগুলিই এম্‌নি করিয়া পথে, ফুটপাতে আর ব্যাফ্‌ল্‌ড্‌-ওয়ালগুলির আনাচে-কানাচে যাইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেদিন, কাতরকণ্ঠে বিত্তশালী সুখী পরিবারগুলির কাছে আবেদন করিয়াছিল: 'এক মুঠো এঁটো ভাত দে, একটু ফ্যান দে মা।'

পড়া শেষ হইল না শ্রীমন্তের।

সহসা দুয়ারের কাছে আসিয়া স্বর তুলিল নিখিল ব্রহ্ম। সম্ভবতঃ শ্রীমন্তের এই আশ্রম-গৃহে নিখিল ব্রহ্মের এই প্রথম আবির্ভাব। বলিল, "লঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে এলাম কর্ত্তাকে।"

"কোনো রকম অসুবিধে হয় নি তো যায়গা পেতে! ব্রজবিহারী বাবু নিশ্চয়ই কোনো একটা ভালো যায়গার ব্যবস্থা ক'রতে পেরেছিলেন?' শ্রীমন্ত কহিল, "কিছুদিন ধ'রে ভোরের ঘুমটা এমন ক'রে দু'চোখে লেগে থাক্‌ছে যে, চেষ্টা ক'রেও ঠিক সময়মতো উঠে কোনো কাজ ক'রতে পারি না। অন্ততঃ ঘোষ বাবুর যাবার মোমেণ্টে একবার তাঁর সাথে মিট্‌ করা উচিত ছিল তো বটেই! কি মনে ক'রলেন তিনি, বলুন তো?"

"মনে কিছু নিশ্চয়ই তিনি করেন নি।" উত্তরে নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "বরং যাবার আগে তিনি আর-একবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গেলেন আপনার। প্রশংসার ভাগী কিছুটা অবিশ্যি ব্রজবিহারী বাবু আর সিন্ধুরামও, কারণ যাত্রীর ভিড়ে তিনি যে যায়গা পেয়েছেন, তা আশাতীত, এবং ব্রজবিহারী বাবুই তার কারণ; আর দ্বিতীয়তঃ সিন্ধুরামের মোট বওয়া। বেটাচ্ছেলে বক্‌শিস্‌ পেয়েছে পূরো পাঁচ টাকার একখানি কড়কড়ে নোট। দেখ্‌লাম—এর মধ্যে অভাগ্য একমাত্র আমিই।" বলিয়া ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা টানিল নিখিল ব্রহ্ম।

কথা শুনিয়া হাসিল এবারে শ্রীমন্তও, কহিল, "একি একটা কথা হ'লো? এতকিছু প্রশংসা আর বক্‌শিসের মূল প্রাণকেন্দ্র যে আপনিই মিঃ ব্রহ্ম। আপনি আছেন ব'লেই আপনাকে উপলক্ষ ক'রে আমরা তবু যা-হোক্‌ দু'টো মিঠে কথা শুনি পাঁচজনের মুখে। আমাদের এতগুলি মানুষের

হৃদয় নিয়ে আপনি খেল্‌ছেন—একি একটা কম গৌরব আপনার পক্ষে ?”

এরপর সম্ভবতঃ আর এ-প্রসঙ্গ তোলা যায় না। নিখিল ব্রহ্মও এবারে একরকম লজ্জার মুখেই কথাটা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কহিল, “ষ্টোভ দেখ্‌চি, জল গরমের ব্যবস্থা আছে নাকি ?”

এবারেও মুখ টিপিয়া একবার হাসিল শ্রীমন্ত, কহিল, “বিলক্ষণ, ব্যবস্থা আবার নেই ! তবে চরম ব্যবস্থাটা সম্ভবতঃ খুব সুখকর স্বাদে গিয়ে পৌঁছাবে না শেষ পর্য্যন্ত। দুধের অভাব আছে ; তবে আদা দিয়ে ‘র’ চা চ’ল্‌তে পারে অনায়াসেই।”

“মে গড্‌ হেল্প্‌ মি।” নিখিল ব্রহ্ম কহিল, “তাই বা পাচ্ছি কোথায় এই মুহূর্ত্তে ?”

শ্রীমন্ত আর দ্বিরুক্তি করিল না। পুনরায় ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

খানিকটা ঘন হইয়া আঁটিয়া বসিয়া মাসিক পত্রখানি হাতের কাছে টানিয়া লইয়া চিহ্নিত গল্পটির দিকে এবারে একঝলক দৃষ্টি বুলাইয়া লইল নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, “সকালে উঠেই বুঝি ‘চাউল’ নিয়ে প’ড়েছেন, শ্রীমন্ত বাবু ?”

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গল্পটির নাম—‘চাউল’।

শ্রীমন্ত কহিল, “মিথ্যে নয়, লঞ্চ্‌-ঘাটে যেতে দেরী হ’য়ে যাওয়ায় ব’সে ব’সে ঐ কাহিনীটিরই খানিকটা বাস্তব রূপ এঁকে নিচ্ছিলাম মনে মনে। আমাদের সাহিত্য যে আজ ধারে

ধীরে কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পারবেন এই জাতীয় গল্প প'ড়েই, মিঃ ব্রহ্ম।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া কহিল, "কিন্তু একটা জিনিষ আজও আমি ভেবে উঠ্‌তে পারলুম না, যাদের অব্যবস্থায় সারা বাংলায় সেবারে এত লোকের প্রাণনাশ ঘ'ট্‌লো, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সমাজের কতকগুলো পাষণ্ডকে ব্ল্যাক-মেলিং-এর সুযোগ ক'রে দিল, তারা আজও দিব্যি আরামের নিশ্বাসে ফ্যানের নিচে ব'সে হাওয়া খেতে পারছে, আদালতে আজও তাদের বিচার হ'লো না। জন-মতের দাবী অবিশ্যি খুব বড় ক'রেই উঠেছিল, তার চাপে প'ড়েই গভর্ণমেণ্ট্ বাধ্য হ'লেন 'তুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন' বসাতে। আশা ছিল, কমিশন তদন্ত শেষ ক'রে গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই রায় দেবে; কিন্তু ফল হ'লো উল্টো। রায় দেওয়া দূরে থাক্, বরং উল্টো চাপ দিয়ে কমিশন ঘোষণা ক'রলো—'সরকারের নির্ব্বুদ্ধিতাই বাংলার মন্বন্তর ও লক্ষ লক্ষ জীবন-বিসর্জ্জনের কারণ।' এক মুঠো চালের ব্যবস্থাও সেদিন হয় নি, কারণ চাল গিয়েছিল সরকারের অনুগৃহীত মহাজনী দালালদের হাতে। কালোবাজারী লাভটা 'বিড়ালের পিঠে ভাগের মতো' উভয় পক্ষেই চ'ল্‌বার ব্যবস্থা ছিল সেদিন। এই আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র, মিঃ ব্রহ্ম।"

নিখিল ব্রহ্মকে উপলক্ষ করিয়া পূরা তুই বাটি চা-ই প্রস্তুত হইয়া গেল। 'র' চায়েরও একটা বিশেষ স্বাদ আছে, আদার রসের অনুপানটা নেহাৎই গন্ধাত্মক নয়। স্বাদ এবং গন্ধ মিলিয়া

তবে স্বস্তি-মাধুর্য্য। অনুরূপ একটি স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিল বটে নিখিল ব্রহ্ম। বাটিতে চুমুক দিয়া কহিল, "হাতের গুণ আছে দেখ্‌চি।"

শ্রীমন্ত কহিল, "'র' চায়ের ব্যাপারে এটা নিতান্তই বাহ্য কথা; গুণ টুন কিছু নয়, মোটামুটি গলাধঃকরণ করা—এইটুকুই সার বুঝি। আসলে দুধহীন চা আর স্বাধীনতাহীন দেশ—ঠিক একই রকমের বিস্বাদ এবং তিক্ত; তাতে না আছে আনন্দ, না আছে জীবন।"

নিখিল ব্রহ্ম এবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "হিয়ার ইউ আর শ্রীমন্ত বাবু; আপনার এই কম্পারেটিভ্ এক্স্‌প্রেশনের জন্যেই তো আপনাকে এতবেশী ভাল লাগে।"

স্বল্পকাল থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "ফানি থিং রাখুন। আসলে কি জানেন মিঃ ব্রহ্ম, কোনো কিছু নিয়ে রসিকতা ক'রতে আজ সত্যিই বুকে বাঁধে। লেবু চট্‌কাতে চট্‌কাতে যেমন তিতো হ'য়ে যায়, আমাদের জীবনটাও আজ ঠিক তেম্‌নিই তিতো হ'য়ে উঠেছে।"

"সেইজন্যেই দরকার তার মধ্যে কিছু আনন্দ আনা।" নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "অতিরিক্ত রোগে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে শেষ পর্য্যন্ত যেমন 'রিকেটি' হ'য়ে যেতে হয়, এও ঠিক্ তেম্‌নি। এ সমস্যা আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সব চাইতে বড় এবং প্রধান, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার মধ্যেও কিছু হাল্কা বস্তু দিয়ে মনকে প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন নয় কি? মহাত্মা গান্ধী জাগতিক

সমস্যার সাথে ভারতীয় সমস্যা নিয়ে ফরমূলা ক'ষেও কস্তুরবা'র সাথে দাম্পত্যজীবনের অতি সাধারণ হাল্কা ঘটনাগুলিকেও তো অভিব্যক্তির পথে রূপ দিতে দ্বিধা করেন নি! কত ছোটখাটো সাধারণ বিষয় নিয়েও রসিকতা ক'রে সময় ব্যয় ক'রতেই কি কিছু একটা কম দেখা গেছে তাঁকে?"

"পরম সিদ্ধ পুরুষেরই লক্ষণ ওটা। ওটা মহাত্মাজীর জীবনের নিতান্তই একটা অলস হাল্কা মুহূর্ত্ত নয়, ওটা তাঁর অখণ্ড বিপ্লবী জীবনেরই একটা মনোময় অঙ্গ; ঐখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।—স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা ভিন্ন তাঁর জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশ; আমাদেরও সেই লক্ষ্য হওয়াই উচিত। তাঁর আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য আকাশ আর পাতাল। তিনি মহীরুহ, আমরা তৃণখণ্ড। হাল্কা চিন্তার অবকাশ আমাদের জীবনে কোথায়, ব'ল্তে পারেন মিঃ ব্রহ্ম? ধানের দেশের মানুষ হ'য়ে যেখানে আজ একমুঠো চালের জন্যে আমাদের হাহাকার ক'রে ম'রতে হ'চ্ছে, সেখানে অন্য চিন্তা করি কখন্ বলুন? এই চা'ল সমস্যা আজ সর্ব্বত্র : গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, বক্তৃতায়—সব কিছুতে। গল্পটাও প'ড়ছিলাম দুর্ভিক্ষ-বিদ্ধস্ত নাগরিক পরিবেশে সেই চা'ল নিয়েই। পড়ুনই-না একবার গল্পটা। কাগজের সংখ্যাখানি পুরোনো বটে, কিন্তু গল্পটি অ-পাঠ্য ব'লেই নতুন। অন্ততঃ আপনার ভাল লাগ্‌বে ব'লেই আশা করি।"—একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল শ্রীমন্ত নিখিল ব্রহ্মের মুখের পানে।

অনাবশ্যক তর্ক তুলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিল না নিখিল ব্রহ্ম। বাসায় অবশ্য সকাল-বিকাল বাজারের কাজ সিন্ধুরামের দ্বারাই একরকম চলিয়া যায়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিসাবে এই সুবিধাটুকু সে পাইয়াছে। সিন্ধুরামের কর্ত্তা-ভক্তিটাও এই প্রসঙ্গে খানিকটা উল্লেখযোগ্য বৈ কি! তাহা না হয় গেল, এদিকে আবার ব্যাঙ্ক খোলা আছে, সময়মতো যাইয়া স্নানাহার সারিবার তাগিদ আছে পিছনে। তাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া এবং কতকটা শ্রীমন্তকে খুসী করিবার জন্যই নীরবে আগাগোড়া গল্পটি পড়িয়া শেষ করিল নিখিল ব্রহ্ম। তারপর কিছুক্ষণ শ্রীমন্তের চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যিই গল্পটি সুন্দর এবং বেদনাপূর্ণ।"

শ্রীমন্ত বলিল, "তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারছেন মিঃ ব্রহ্ম, আমরা আজ কিসের উপরে দাঁড়িয়ে আছি! এই 'চাউল'-সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে আজ আমাদের মেধা, মজ্জা, সংস্কৃতি আর সভ্যতা। ঐ দুর্ভিক্ষ যে কতবড় প্লাবন বইয়ে দিয়ে গেল আমাদের শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে—তা ভাবা যায় না। এখনো ক'ল্‌কাতায় রেশনে চাল ষোল টাকা দর, আর আমাদের এসব অঞ্চলেই বা কিছু একটা কম কি?" তারপর স্বল্পক্ষণ থামিয়া পুনরায় কহিল, "অতি দুঃখে হাসি পায় এসব কথা ভাব্‌তে গিয়ে। অন্ন-বস্ত্র সমস্যা গেল একদিকে, তারপর কাগজের দিকটাই দেখুন না! আগে দু'পয়সায় ছিল দৈনিক ষোল পৃষ্ঠা কাগজ, আজ দু'আনায় পাচ্ছি চার পৃষ্ঠা। এই

নিয়েও জার্ণালিষ্ট্ এ্যাসোসিয়েশন আর প্রেস-ওনার্স্ কমিটির আন্দোলনই কি কম হ'লো কিছু! দৈনিকের পৃষ্ঠায় আপনিও অবিশ্যি প'ড়ে থাকবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট্ সেদিকেও আজ পাকা শাসনের জাল ফেলেই ব'সে আছেন। পেপার-কণ্ট্রোল অফিস খুল্লেন, ইচ্ছেমতো 'পারমিট্' দেবেন তাঁরা 'কনজুমার'দের। দেশের শিক্ষা চালু থাক্বে কি তাল-পত্রে, ব'ল্তে চান? কিন্তু আজকের এই এতবড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জেনারেশনে ক্রাউডী পপুলেশনের পক্ষে তাই-বা সম্ভব কি! এই জন্যেই এক-এক সময় ভাবি, এদেশে এখনও সন্তান-উৎপাদন চালু আছে কি ক'রে! বংশ বাড়িয়ে শুধু তাদের ঘাড়ে কতকগুলো পাপ আর এই পরাধীনতার কঠিন নিষ্পেশন তুলে দেওয়া ভিন্ন যে আর কিছুই নয়, মিঃ ব্রহ্ম।"

উত্তরে কি একটা বলিতে যাইয়া যেন সহসা কথা হারাইয়া ফেলিল নিখিল ব্রহ্ম। পরে কতকটা কৌতুকের সুরেই কহিল, "অনর্থক ভেবে ভেবে মাথায় বায়ু বৃদ্ধি করা শুধু; সমস্যার কি সত্যিই শেষ আছে শ্রীমন্ত বাবু! এরপর আবার আপনাকে হয়ত জল চাপাতে হ'তে পারে ষ্টোভে, অনর্থক সময় ক্ষেপন তাই ভালো নয়। ঘুম থেকে উঠে সাহিত্য নিয়ে ছিলেন বেশ ঠাণ্ডা মাথায়, মাঝ থেকে খানিকটা বকিয়ে গেলাম এসে। অবিশ্যি লাভটা এতে আমারই বেশী, কারণ—পলিটিক্স্ খুব যে তেমন একটা মাথায় ঢোকে, তা তো নয়, শুনে শুনে কিছু শিখ্তে পারি। কিন্তু বেলা বোধ হয় ব'সে নেই! মিঃ ঘোষ

যদি তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে আজকের দিনটা ছুটির ব্যবস্থা ক'রে যেতেন, তা হ'লেও আরো কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে ব'স্‌তে পারতুম। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো বন্ধ নয় বটেই, অতএব উঠ্‌তে হ'চ্ছে এবারে।" তারপর কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আর ভালো কথা, কাল রাত্রে আপনি চ'লে আস্‌বার পর মালতি ব'ল্‌ছিল আপনার কথা। যদি পারেন, সন্ধ্যার দিকে একবার ঘুরতে-ঘুরতে যাবেন, মাও খুসী হবেন আপনাকে পেয়ে।"

দ্বিধামুক্ত মনে ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মতি জানাইল শ্রীমন্ত।

বেলা সত্যিই বসিয়াছিল না। সকালের তরুণ সূর্য্য আকাশের অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসিয়াছিল।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একসময় উঠিয়া পড়িল নিখিল ব্রহ্ম।

আজকের এই নিশ্চল পলাতক জীবনে শ্রীমন্তের কিন্তু কোনোদিকেই তেমন কিছু একটা তাড়া নাই। এখানে ব্যাঙ্কের কাজ নিতান্তই একটা সৌখীনতা ভিন্ন আব কিছু নয়। কোথায় সেই অযোধ্যার চর আর তালমার হাট, তারপর এই বন্দর! তিলে তিলে নিজের ভারগ্রস্ত মন আর দেহটাকে অনবরত সে টানিয়া নিয়া চলিয়াছে সাম্‌নের পথে। এইখানে এই বন্দর-

ভূমিতে আসিয়াই কেমন যেন দীর্ঘদিন টিকিয়া গেল তার। নিম্ন মধ্যবিত্ত আর চাষী-জীবনের সাথে ভদ্রগৃহস্তের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইয়া নিয়াছে সে এখানে। কখনো-সখনো ব্যাঙ্কে যাইয়া বসাটা নিতান্তই তাহার ইচ্ছাধীন। সামান্য একটা আর্থিক যোগ আছে মাত্র ব্যাঙ্কের সাথে ; ইহার বাহিরে যেটুকু, তাহা নিতান্তই নিখিল ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া। নিজেকে পরিপূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও একটা অদ্ভুত প্রীতির সম্বন্ধ সে গড়িয়া তুলিয়াছে ইতিমধ্যে। অযোধ্যার চরের মহেন্দ্র সর্দ্দার আর তালমাহাটের সদানন্দ বৈরাগীকে অবশ্য ভুলিয়া যাওয়া কোনোদিন সম্ভব হইবে না তাহার জীবনে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিল শ্রীমন্ত—তাহাদের সাথে প্রীতির যোগটা ঠিক এতখানি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—যেটুকু এই স্বল্পকালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে নিখিল ব্রহ্মের সাথে। এটুকুকে সে তাহার সংস্কৃত-মনের সংযোগ বলিয়াই মনে করে। যতটুকু কল-মুখরতার সুযোগ পাইয়াছে সে এই চরমুগরিয়ার বন্দরে, অযোধ্যার চরে আর সদানন্দ বৈরাগীর আখড়ায় নিতান্তই এইটুকু স্বপ্ন ছিল তাহার কাছে।

অনেকক্ষণ নিজের মধ্যে আত্মনিমগ্নাবস্থায় বসিয়া রহিল শ্রীমন্ত। অলক্ষ্যেই কখন্ আবার দীর্ঘকাল পরে ধীরে ধীরে তাহার স্মৃতি-পথে আসিয়া দাঁড়াইল হারাণ ঘটক আর হরেন চাকী। তাহার দুঃসহ দুর্গম পথের দুই বিপ্লবী বন্ধু। এ জীবনে কত ঋণ যে জমা হইয়া রহিল তাহাদের কাছে, তাহার হিসাব

নাই। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার ডায়ারীর পাতায়। নিজের মধ্যেই সহসা একবার দুঃসহবেগে নড়িয়া উঠিল শ্রীমন্ত। তারপর ডায়ারী খাতাখানি আর একবার স্বভাববশতঃই অধীর আগ্রহে হাতের মুঠায় টানিয়া নিয়া পর-পর কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লইল ঃ

'সেই তো প্রথম বেরিয়ে প'ড়লাম সেই নিশুতি ঘুমন্ত রাত্রেঃ ঘুমন্ত রাত্রির সেই দেড়টা। সৌদামিনীও হয়ত ভালো ক'রে জান্‌লো না—কি ক'রে ব'সলাম! ওদিকে আগুন উঠ্‌লো দাউ দাউ ক'রে। অন্ধকারের নিভৃতে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চ'ল্‌লাম আমরা ঃ আমি, হারাণ ঘটক আর হরেন চাকী। কত বনঝাউ আর বাঁশের ঝাড়, কত মান্দার, আঁশস্যাওড়া আর ফণিমনসার জঙ্গল। এগিয়ে চ'ল্‌লাম ক্রমাগত আমরা। দুরন্ত নেশায় তখন দিগন্তের পথে ছুটে চ'লেছি। হঠাৎ পথের কাঁটায় বুঝি একবার ডান পা'টা ছড়ে' গেল হারাণের। মাঝপথে হঠাৎই সে থেমে দাঁড়িয়ে প'ড়লে, ব'ললে, 'এ উধাও-যাত্রা হয়ত সফল হবে না, অতএব এখানেই নোঙর ফেলি।' রাত্রির তখন শেষ প্রহর। সাংসারিক আবেষ্টনে কখনো খুব বড় কিছু একটা সংস্কারমুক্ত মনে চলা সম্ভব ছিল না হারাণের পক্ষে। পাঁজি দেখ্‌তে হ'তো অনেক সময়ই। বুঝ্‌লাম—সত্যিই আর চ'ল্‌বার মতো তার ধৈর্য্য নেই তবে। শুধালাম, 'কোথায় তবে আত্মগোপন ক'রবে? এখনও যে তিন ক্রোশ পথই ফুরোলো না!' দ্বিধা ক'রলে না হারাণ, জবাবে চিরকালই চট্‌পটে সে,

ব'ল্‌লে, 'এদিকেই কোথাও ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাক্‌বো ; আবহাওয়া ততক্ষণে শান্ত হ'য়ে আস্‌বে নিশ্চয়ই।'

'ব'ল্‌লাম, 'তা হ'লে এইখানেই বিদায়। সুযোগ মতো আবার আমরা এসে একসাথে মিল্‌বো। পথের এ কাঁটা সামান্য ; যেদিন আমাদের এই রক্তরাঙা বুকের কাঁটা নামাতে পারবো, সেইদিনই হবে আমাদের এই দুর্গম যাত্রা শেষ। প্রাণে রেখো বন্দেমাতরম মন্ত্র, আর কণ্ঠে রেখো নজরুলের সেই গান :

'শিকল ছেঁড়া কল আমাদের শিকল ছেঁড়া কল,
এই শিকল দিয়ে শিকল এবার ক'রবো রে বিকল।...'

'হারাণ 'তথাস্তু' ব'লে হাত তুলে বিদায় জানালো। দেখ্‌লাম, হরেনও কেমন যেন নিশ্চল হ'য়ে গেছে। অপেক্ষা ক'বলাম না আর এতটুকুও। আবার ক্ষিপ্রগতিতে সামনের পথে পা বাড়ালাম। আপন সত্তাকে একবার উদ্দেশ ক'রে সেই নিভৃত অন্ধকার-পথে ব'লে উঠ্‌লাম : কাল-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো মথুর ; শুধুই সেখানে পাথরের নুড়ী আর ঝিনুক নয়, হয়ত সোনাও মিল্‌তে পারে।

'তারপর থেকে এই তো চ'লেছি, কেবল চ'লেছিই। কি মিলেছে, কি পেয়েছি, ভেবে দেখবার অবসর পাই নি তা নিয়ে। কিন্তু খোয়ালাম যে অনেকখানিই! পারলো না নিজেদের লুকিয়ে রাখতে হারাণ ঘটক আর হরেন চাকী ; ধরা প'ড়লো পুলিশের হাতে। এই কি কিছু কম খোয়ালাম! বিপ্লবী

জীবনের দুর্গম পথে একি সত্যিই কিছু একটা কম ক্ষতি! আজ আবার যতই প্রদক্ষিণ ক'রে চলি না কেন ঐ বন-ঝাউ, মান্দার আর ফণিমনসার জঙ্গল, কোথাও কি আর তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবো? যে দেশের দীর্ঘ মেয়াদী রাজবন্দীরা পর্য্যন্ত আজ অবধি কয়েদীর মতো কারাপ্রাচীরের নিভৃতে যক্ষা রোগীর ন্যায় অনবরত ধুঁকছে—সে দেশের রাজতন্ত্রের নাগপাশ থেকে আর কি সহসা মুক্তি পাবার এতটুকুও সম্ভাবনা রইলো হারাণ ঘটক আর হরেন চাকীর? বোকাগুলো, কঠিন সাধনার পথে নেমেও এখন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার বিদ্যেটুকু শিখতে পারলো না!

'তবু—তবু তাদের উদ্দেশে আজ হৃদয়ের সমস্তটুকু প্রীতি নিবেদন করি, অন্তরের ডাক পাঠিয়ে বলি: একদিন তোমরাই বাঁধ কেটে দিয়েছিলে আমার খরস্রোতা বিপ্লব-নদীর। তোমরা ছিলে ব'লেই তো সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছিলাম সেদিন অমন ক'রে। আজও তাই আমার জীবনে তোমরা ধ্রুবতারার মতই জ্বলে' আছো বন্ধু।...'

অনুচ্ছেদটি এই পর্য্যন্ত আসিয়াই শেষ হইয়াছিল সেদিন। আজকের মতো মন লইয়া যদি সেদিন কলম ধরিত শ্রীমন্ত, তবে সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বিদায়-মুহূর্ত্তটাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাকে আরও খানিকটা প্রকাশের সুযোগ দিতে পারিত। এক একটা নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত্তে যখন সে নিজেকে লইয়া বড় বেশী উদ্বেল হইয়া ওঠে, অন্ততঃ সেই খণ্ড খণ্ড নিমেষগুলিকে তবে তার অতীতের

সেই বাস্তব স্বাক্ষরগুলি কিছু-বা কাব্যের সুরে কিছু-বা সাহিত্য-লাস্যে ভরিয়া তুলিতে পারিত। অতিরঞ্জন তার মধ্যে যেটুকু থাকিত, সেটুকু তার সেই বাস্তবনিষ্ঠাতেই বস্তুধর্ম্মী হইয়া উঠিত।

বড় একটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কোনোদিকে যাইবার মতো তাগিদ নাই। চাষীপাড়ার প্রাথমিক কাজটা একরকম তার শেষ হইয়াছে বলিলেই চলে। প্রয়োজন ছিল তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা আনিয়া জাতীয় বিপ্লবের পথে তাহাদের চিরকালের লাঞ্ছিত জীবনের ভীরু গতিটাকে সবল ও ক্ষিপ্র করিয়া তোলা। সে-কাজ এতদিনে তার শেষ হইয়াছে বৈ কি! বাকী কাজের জন্য সময়ের সমুদ্র পড়িয়া আছে সামনে। দুই-একটি দিনের সামান্য নিশ্চেষ্টতা কিছু নয়। বাহিরের দিকে অপাঙ্গে একবার তাই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া শিয়রের বালিশটাকে বুকের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে চাপিয়া পা দুইটাকে রীতিমত লম্বাভাবে পিছনের দিকে ছড়াইয়া দিয়া উপুড় হইয়া এবারে শুইয়া পড়িল শ্রীমন্ত।

পৃষ্ঠাটির নিচের অংশে সামান্য কিছুটা যায়গা ছিল। তাহারই মাঝামাঝি দিকে কালির একটা মোটা দাগ কাটিয়া ধীরে ধীরে আবার কয়েকটি পংক্তি লিখিয়া রাখিল সে ঃ

'—এই বিপ্লবই হোক্ আমাদের জীবনের শেষ বিপ্লব, বন্ধু। বিয়াল্লিশের বিপ্লবের যে আজও অবসান হয় নি আমাদের জীবনে! একদিকে এই মহা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের সেই

সংগ্রাম, আর-একদিকে আজাদ-হিন্দের মুক্তিযুদ্ধ সিঙ্গাপুরে, মালয়ে আর ব্রহ্ম-ফ্রণ্টে! একদিকে আমাদের অহিংস-ঋষি গান্ধীজী আর বিপ্লবী জওহরলাল, আর-একদিকে নেতাজী সুভাষ। ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠছে লালকেল্লা : ভাবচি কবে আমাদের ত্রিবর্ণ নিশান উড়বে তার মাথায়! পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের ভাস্কর জ্ব'ল্ছে আমাদের বক্ষে। পূর্ণ স্বাধীনতার মালা প'রে নতুন ঊষা তার শ্যামল আস্তরণ মেলে দিয়ে হাসি-মুখে সত্যিই এসে দাঁড়াবে বৈ কি আমাদের সাম্‌নে! তারই যে আভাস বেজে উঠ্‌ছে আজ আকাশে বাতাসে। য়ুরোপের আকাশ আজ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন। যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে বটে, এম্‌নি ক'রেই যুদ্ধ শেষ হ'য়ে থাকে বটে তাদের, কিন্তু রাহুচক্রে আজ স্পষ্ট জেগে উঠেছে সেখানে সূর্য্যগ্রহণ। সারা বিশ্বের মেঘ এসে আজ গ্রাস ক'রছে সাম্রাজ্যবাদকে। একটুখান আত্মরক্ষা, একটুখানি এগিয়ে যাওয়া, আর একটুখানি মাত্র ধৈর্য্য এখন। তারপরই সফল হবে আমাদের এই বিপুল ভারতবর্ষের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ। তোমাদের ঐ কঠিন কারা-প্রাচীর সেদিন পুষ্পিত বাসর-মন্দির হ'য়ে দাঁড়াবে, বন্ধু।'

—নিচে তারিখ লিখিতে যাইয়া কিছুটা ইতস্ততঃ—চোখে একবার ঘরের বেড়ার দিকে লক্ষ্য করিল শ্রীমন্ত। ছোট্ট একটা ইংরেজি ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছিল সেইখানে। নভেম্বর : ১৮ই। এই নভেম্বরেরও একটা বেদনাময় বিপ্লবের বাস্তব কাহিনী আছে বৈ কি য়ুরোপের ইতিহাসে! দীন মজুরের

বিপুল সংগ্রাম জাগিয়াছিল সেদিন বুর্জ্জোয়া সমাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে।

—একটা ভারী নিঃশ্বাস নামিয়া আসিল শ্রীমন্তের বুক হইতে। ধীরে ধীরে ডায়ারীর একাংশে তারিখটি লিখিয়া রাখিল সে, তারপর অসার নিস্পন্দের মতই কিছুক্ষণ মুদিত চক্ষে পড়িয়া রহিল। মাথাটা সত্যিই যেন কেমন অনাবশ্যক ভাবেই ভারী হইয়া উঠিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে সৌদামিনী আসিয়া যদি একবার পাশে বসিত, তবে অন্ততঃ আর একবার ঐ 'র' চা-ই গলাধঃকরণ করিবার তুঃসাহস করিতে পারিত সে, তারপর মৃদু হাতে একবার মাথাটাকে বেশ করিয়া টিপাইয়া লইয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আবার অনেকখানি কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিতে পারিত।

আঃ! সৌদামিনীর কথা ভাবিতে সত্যিই যেন কেমন এক অদ্ভুত ভাল লাগে! নিজের মধ্যে কথাটাকে সহস্রবার ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সেটুকুকে ঠিক খাটি রূপ দিতে পারে না শ্রীমন্ত! ভাষার এত দীনতা এখনও পৃথিবীতে।

পাট-গুদামে সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক মজুরী লইয়াই কুলিরা কিছুদিন যাবৎ নিজেদের মধ্যে বেশ খানিকটা তাতিয়া উঠিয়াছিল। সম্মিলিত দাবী জানাইয়াছিল তাহারা বড় বাবুর কাছে, কিন্তু বড়বেশী তাহা কাজে আসে নাই। বিকালের দিকে পাট-গুদামের সাম্‌নে আজ তাই তাহারা রীতিমত একটা বিরাট হুলুস্থূল বাঁধাইয়া নি'ল।

কাছে থাকিয়া একরকম অনাবশ্যকভাবেই তাহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইল শ্রীমন্তকে। কহিল, "আবেদন নিবেদন ক'রে সত্যিই যখন দেখ্‌লে কিছু হ'লো না, তখন মূর্খের মতো নিজেরাই বা এই দীর্ঘকাল ধ'রে চুপ ক'রে রইলে কেন? ট্রেড্‌-ইউনিয়ন কংগ্রেস র'য়েছে, অনায়াসে তাদের কাছে নিজেদের অবস্থা পেশ ক'রে কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারতে!"

বিক্ষুব্ধ আলোড়নে এবারে সমস্বরে গুঞ্জন করিয়া উঠিল কুলিরা; কহিল, "ব'লেছেন মিথ্যে কি, মুখ্যুই যদি না হবো, তবে আর এমন্ ভাবে হাড়-মাস এক ক'রেও সংসার পরতিপালন ক'র্‌তি পারুম না কেন? ঐ যে কংগ্রেস না কি নাম কইলেন বাবু, কিছু একটা তার ঠিকানা পেলি তো লেখাজোকা ক'রতি পারি!"

কিন্তু ঠিকানা পাইয়া লেখাজোকা অর্থে তাহাদের কাছে আবেদন পেশ করার ব্যাপারটা সম্প্রতি অনেকখানিই দূরের বিষয়, তাহার পূর্ব্বেই আর-একটি অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার জন্য বাস্তবিকই শ্রীমন্ত প্রস্তুত ছিল না।

পাটগুদামের বড়বাবু অর্থে বীরেশ্বর সাহা চৌধুরী একসময় ডাকিয়া নিয়া শ্রীমন্তকে বেশ কিছু কটু কথা শুনাইয়া দিল। কহিল, "ঘরের খেয়ে এমন ক'রে বনের মোষ তাড়াতে আপনাকে বলে কে, ব'ল্‌তে পারেন শ্রীমন্ত বাবু ?"

শ্রীমন্ত অবশ্য প্রথমতঃ কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল, বলিল, "ঘরেরও খাই না, বনের মোষও তাড়াই না, সুতরাং বলাটা আপনার ভুল হ'লো মিঃ চৌধুরী। নিতান্তই কোনোভাবে দিন-গুজ্‌রানি ক'রে আছি, আর ওরাও কিছু একটা মোষ নয়, আমার আপনার মতই রক্ত-মাংসের মানুষ।"

"মানুষ না জানোয়ার, তা আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি, নইলে এ ভাবে আর চার্জ্জ্‌ নিয়ে ব'সে থাক্‌তে পারতুম না এখানে।" আত্মশ্লাঘায় হঠাৎই যেন বড় বেশী দীপ্ত হইয়া উঠিল এবারে বীরেশ্বর সাহা চৌধুরী। কহিল, "আপনি ওদের আস্পর্দ্ধাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন ; কিন্তু আপনার জানা উচিত যে, এভাবে এখানে ঠিক আপনি টিঁকে উঠ্‌তে পারবেন না—অন্ততঃ অন্যত্র গিয়ে আপনার বাসা বাঁধ্‌তে হবে।"

হঠাৎ যেন একটা আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতই কথাটা মনে হইল শ্রীমন্তের কাছে। এমন কল্পনা সে অন্ততঃ কিছুক্ষণ

আগে পর্য্যন্তও করিতে পারে নাই যে, পাটগুদামের কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো একটি খণ্ডকালের জন্যও তাহার মনোমালিন্য ঘটিবে! নিতান্তই আশ্রিতের মতো এই বন্দরের বুকে তার ক্ষণকালের স্থিতি। একরকম অনিশ্চিত বানের জলের মতই সে একসময় ভাসিয়া আসিয়াছে এখানে, আবার একদিন সেই বানের জলের মতই এখান হইতে ভাসিয়া যাইবে। মাঝখানে কয়েকটা দিন বা কয়েকটা সংযুক্ত মাস মাত্র। তাহার মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক আবহাওয়াকে তার কোনো একটি ক্ষীণ মুহূর্তের চিন্তার মধ্যেও স্থান দিতে পারে নাই শ্রীমন্ত। বরং একটা বিশেষ সহায়তাই লাভ করিয়া আসিয়াছে সে আজ পর্যান্ত। ব্যাঙ্কের কাজে পাটগুদামের সাহচর্য্য-লাভে বঞ্চিত হইলে হয়ত অধিক বঞ্চনা সহ্য করিতে হইত তাহার নিজের পাকস্থলীকেই তাহাদের মিলিত অর্থের উপরে একটা সামান্যতম কমিশনই যে তাহার সেই পাকস্থলীকে সুস্থ রাখিবার সুযোগ দিয়াছে এখানে! অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের মধ্যে চিন্তা করিল শ্রীমন্ত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রশ্নও বড় কম জাগিল না মনে। যে অবস্থায় আসিয়া সম্প্রতি ঘটনাটি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিষয়টি লইয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে শেষ পর্য্যন্ত যদি পুলিশ আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তবে যে তাহার এই দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা সমস্তই মাটি হইয়া যাইবে। অন্ততঃ এইভাবে সে পুলিশের হাতে ধরা দিয়া বোকা সাজিতে রাজি নয়।

নিজের মধ্যেই বিষয়টা লইয়া বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল

শ্রীমন্ত, তারপর গলার স্বর কতকটা স্বাভাবিক স্তরে আনিয়া কহিল, "যদি অলক্ষ্যে কিছু অপরাধ ক'রে থাকি, মার্জ্জনা চাইতে রাজি আছি মিঃ চৌধুরী। তবে প্রসঙ্গতঃ এই কথাটাও না ব'লে পারছিনা যে, জন্তু জানোয়ার ব'লে যতদিন এই মুটে-মজুরদের মনে ক'রবেন, ঠিক ততদিনই আপনার সাথে ওদের এই বিরোধের পার্থক্য পাহাড়ের মতো খাড়া হ'য়ে থাক্‌বে। আজ আপনাদের কিছুটা নিচে নাম্‌বার দিন এসেছে ; মানুষের ন্যায্য অধিকার আর দাবীকে দাবিয়ে রেখে কখনো মঙ্গল হয় না। এইজন্যেই আজ সুদূর আমেরিকার কারখানা থেকে সুরু ক'রে এই নগণ্য বন্দর অবধি সর্ব্বত্র জিন্দাবাদ জেগে উঠ্‌ছে শ্রমিক-বিদ্রোহের। এটা আদৌ সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষণ নয় মিঃ চৌধুরী। আপনার হাতের ক্রিড়ণক ওরা, ছা-পোষা মানুষ ওরা, আপনার কাছেই তো ওরা দাবী জানাবে, আর আপনাকেও যে সেই দাবী পালন ক'রতে হবে! এখানে কেউ কারুর আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দেবার নেই। ক্ষিধে না মিটলে একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত চেঁচায়, আর আমরা তো মানুষ! অন্যায় মনে ক'রলে ক্ষমা ক'রবেন মিঃ চৌধুরী, কিন্তু আপনাকে ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে এসব কথা।"

কিন্তু বীরেশ্বর সাহা চৌধুরী আসলে তখন কতখানি প্রকৃতিস্থ, সে-কথাটাও ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বৈ কি? কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কতকটা উষ্মা প্রকাশের ভঙ্গীতেই কহিল, "আমাকে কোনো বিষয়ে ভেবে দেখ্‌বার জন্যে অন্ততঃ

আমার 'ব্রেন' যে ঘুমিয়ে নেই, এটুকু আপনি জেনে রাখ্‌লেই আমি আপাততঃ সুখী হবো শ্রীমন্ত বাবু।"

আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া ত্রস্তে কোথায় একদিকে উঠিয়া গেল বীরেশ্বর সাহা চৌধুরী।

অধিক দুঃখেও বড় হাসি পাইল এবারে শ্রীমন্তের। কোথা দিয়া সত্যিই যেন ঝড়ের মতো কি একটা হইয়া গেল। শ্রীমন্তও আর অকারণে বিলম্ব করিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া সোজা পথের দিকে পা বাড়াইল।

আড়িয়াল-খাঁ'র কালো জলে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে কাছে-দূরের সবুজ বনরাজি আর পথের ধূলায়।

নিখিল ব্রহ্মের প্রাভাতিক আমন্ত্রণ ইতিমধ্যেই ভুল হইবার কথা নয়। কিন্তু সারা মন ব্যাপিয়া যে আকস্মিক বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছে—তাহাতে নিখিল ব্রহ্মের বাসায় যাইয়া সাধারণ হাসি-ঠাট্টার মধ্যে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে বলিয়া মনে করিতে পারিল না শ্রীমন্ত। অথচ নিজের মধ্যেও নিজেকে নিভৃতে ধরিয়া রাখিয়া স্বস্তি পাইতেছে না। বীরেশ্বর সাহা চৌধুরী চটিয়া যাওয়ায় কাজটা বাস্তবিকই ভাল হয় নাই। ক্ষতি তাহাতে শ্রীমন্তেরই। কিন্তু মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়াই বা এখানে টি*কিয়া থাকার সার্থকতা কি?

একরকম বিভ্রান্ত মনেই এ-পথে সে-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একসময় নিখিল ব্রহ্মের বাসায় আসিয়াই উপস্থিত হইল

শ্রীমন্ত। সন্ধ্যা কাটিয়া গিয়া তখন খানিকটা রাত্রি হইয়াছে।

সাম্‌নের বারান্দাটিকে মাঝামাঝি অংশে চাটাইয়ের বেড়া দিয়া দুইভাগে ভাগ করিয়া নেওয়া। দুইটিতেই কোঠাঘরের মতো বেশ পরিসর। দক্ষিণ দিকের অংশে সাধারণতঃ বাহিরের লোকজন আসিলে বসিবার ব্যবস্থা, বাঁ দিকের অংশের মালিক অধিক সময়ের জন্যেই মালতি। অর্থাৎ—লেখাপড়া, সূঁচের কাজ প্রভৃতির জন্য এই অংশটিই মালতির জন্য নির্দ্দিষ্ট।

বিমলা দেবী ঐ দক্ষিণ দিকের অংশেই একান্তে বসিয়া সম্ভবতঃ ভাগবৎ না চণ্ডী—কি একখানি বই পড়িতেছিলেন। শ্রীমন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মুখ তুলিয়া কহিলেন, "এই যে এস বাবা, নিখিল ব'লেছিল—সন্ধ্যে নাগাদই তুমি আস্‌বে, তা—এই বুঝি তোমার সন্ধ্যে হ'লো?"

উত্তর দিতে যাইয়া একবার ইতস্ততঃ করিল শ্রীমন্ত, কহিল, "না—এই মানে একটু বেড়িয়ে তবে এলাম কিনা, এই যা একটু দেরী।"

বিমলা দেবী কহিলেন, "কাল তো একরকম তোমাদের ব্যাঙ্কের কর্ত্তাকে নিয়েই ব্যস্ত রইলে, রাত্রে দু'টো ভাল ক'রেও খেয়ে গেলে না; কাছে ব'সে যে একআধটুকু দেখাশুনো ক'রবো, তাও পারলুম না। পেট ভ'রে যে নিশ্চয়ই খাও নি, একথা সত্যিই।"

"এইবারেই হাসালেন মা।" শ্রীমন্ত কহিল, "আমরা শুধু খাই না, গো-গ্রাসে খাই। বাংলা তো আজ আর সোনার বাংলা নেই যে, ফেলে ছড়িয়ে দু'এক গ্রাস ক'রে যখন-তখন খাবো। সোনার বাংলা পুড়ে আজ শ্মশান হ'য়েছে, একবারই বা হাঁড়িতে ভাত চড়ে কোথায়? বারবার ক'রে খাবার ভাগ্য তো কবেই চুলোয় গেছে। তাই মুখের সাম্‌নে যখনই কোনো একটি পূর্ণ থালা এসে পড়ে, তখন আর পাকস্থলীকে নিতান্ত লজ্জা ক'রেও নির্য্যাতন দেই না। কাল বরং ঘোষবাবুর সঙ্গে ব'সে গল্পে গল্পে কিছু বেশী পরিমাণই খেয়েছিলাম, পথে বেশ কষ্টই হ'লো শেষ পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে।" ব'লিয়া মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিতে চেষ্টা করিল শ্রীমন্ত।

বিমলা দেবীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বোঝা গেল—অনেকখানিই যেন স্বস্তিবোধ করিলেন তিনি এ-কথায়। সামান্য নীরবে থাকিয়া পরে কহিলেন, "চলো বাবা, ভিতরে যাই, নিখিলও এই কিছুক্ষণ আগে এসেই ঘরে শুয়েছে, ঘুমিয়ে প'ড়লো কিনা কি জানি।"

সামান্য মোড় ঘুরিতেই শ্রীমন্তের লক্ষ্যে পড়িল—বাঁ দিকের অংশের মাঝামাঝি দরজাটা খোলা, ভিতরে তক্তপোষের উপরে নির্ব্বিবাদে হারিকেনের সলিতা পুড়িতেছে আর তাহারই সাম্‌নে খোলা রহিয়াছে প্রবেশিকা-পাঠ্য 'প্রোজ্ সিলেকশন্'খানি এবং তাহারই অনতিদূরে পাতা বুজানো রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'খানির। মালতি সম্ভবতঃ উঠিয়া ভিতরেই কোথাও

একদিকে গিয়াছিল। শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, ইতি-মধ্যেই আবার সে ফিরিয়া আসিতে যাইয়া ঘরের চৌকাঠের সামনেই শ্রীমন্তের মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কহিল, "আচ্ছা, কি রকম লোক আপনি বলুন তো শ্রীমন্তদা ? দাদার মুখে শুনলাম, সকালে নাকি দুধের অভাবে আপনার একরকম চা খাওয়াই হয় নি ! একটুখানি তো পথ মাত্র, একবারটি এসে গেলেই বা ক্ষতি ছিল কি ! গোয়ালা তো সেই কোন্ ভোরেই আমাদের দুধ দিয়ে যায় রোজ। এমন লজ্জা ক'রে না থাক্‌লেই কি নয় ? এ বেলা আপিস থেকে ফিরে এসে দাদা ব'ল্‌লে—সন্ধ্যায় আপনি আস্‌বেন, তবে দু'জনে মিলে একসাথে ব'সে চা খাবে। সেই আসা এলেন তো এই ; ঐ দেখুন, সেই থেকে অপেক্ষা ক'রে ক'রে দাদা এতক্ষণে প্রায় এক ঘুম দিয়ে উঠ্‌লো।"

নিখিল ব্রহ্ম বাস্তবিকই বিশ্রামের ফাঁকে নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মালতির উচ্চকণ্ঠের শব্দে তাহার সেই তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। খানিকটা আড়মোড়া ভাঙিয়া উঠিয়া বসিতেই শ্রীমন্ত কিছু-বা বিস্ময়ের সুরে কিছু-বা লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, "সামান্য চায়ের ব্যাপারটাকে এমন্ ক'রে ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে বুঝি আর শান্তি পাচ্ছিলেন না মিঃ ব্রহ্ম !"

উপস্থিত মতো লজ্জিত হইল নিখিল ব্রহ্মও কম নয়, কহিল, "ব্যাপারটা কিছুই নয়, আসলে মালতিকে এসে ব'ল্‌ছিলাম, সকালে আপনার হাতে 'র' চা খেয়ে এলাম, মালতি দুধ

মিশিয়েও এমন চমৎকার ক'রে তৈরী ক'রতে পারে না। সেই থেকেই ও ধ'রে নিয়েছে যে, দুধের অভাবে সত্যিই সকালে আপনার চা খাওয়া হয় নি।” তারপর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তা' যা-ই বলুন না কেন, 'র' চা-টা যখন চিরাচরিত অভ্যাস নয়, তখন তাতে কষ্টই খানিকটা হয় বৈ কি! তার চাইতে আসুন এবারে দুধ মিশিয়ে একটু ভালো ক'রে চা খাই; আমিও হা-পিত্তেশের মতো অপেক্ষা ক'রে আছি সেই বিকেল থেকে।”

শ্রীমন্তের পক্ষে এবারে কথা বলা শক্ত হইয়া উঠিল। অন্ততঃ সকাল বেলার মতো মনটা প্রফুল্ল থাকিলেও ইহা লইয়া কিছু একটা ব্যাঙ্গাত্মক শ্লেষ তুলিতে পারিত সে, কিন্তু মনের দিক দিয়াই কিছু একটা সাড়া পাইল না। নিখিল ব্রহ্মের কাছাকাছিই তক্তপোষের একপাশে তাই বসিয়া পড়িয়া কথাটাকে খানিকটা ঘুড়াইয়া লইবার অছিলাতেই বিমলা দেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “সন্ধ্যা থেকেই আজ বুঝি প্রোগ্রাম ক'রে মায়ে-ঝিয়ে পাঠ-অধ্যায়নে মন দিয়েছেন, মা?”

“এক-আধ সময়ে বই নিয়ে বসে বটে মালতি, কিন্তু পড়া যে কিছু একটা হয়—তা মনে হয় না; বুঝতেও হয়ত পারে না সব জিনিষ ভালো ক'রে।” থামিয়া বিমলা দেবী বলিলেন, “আর আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও বাবা। উনি বেঁচে থাকতে এখান-ওখান থেকে কিছু কিছু বই-পত্তর আন্‌তেন সংগ্রহ ক'রে, প'ড়বারও রুচি ছিল তখন যথেষ্ট। অভ্যাসটা

এখনও যে না আছে, তা নয়। তাই মাঝে-মধ্যে সময় পেলেই মন দিতে চেষ্টা করি কোনো একটাতে।"

সুযোগ মতো নিখিল ব্রহ্মের পক্ষেও কথাটা ঘুরাইয়া লইতে বেগ পাইতে হইল না। কহিল, "মালতির কিন্তু আপনার উপর ভারী রাগ, শ্রীমন্ত বাবু। সেদিন এই পড়াশুনোর কথা নিয়েই ব'ল্‌ছিল—আপনি কিন্তু বড় বেশী নজর দিচ্ছেন না ওর দিকে।"

মুচ্‌কি হাসিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "বাস্তবিকই এ-জন্য আমি অত্যন্ত বেশী অপরাধী।"

কিন্তু 'অপরাধী' বলিলেই যে মুক্তি পাওয়া যায় না, মালতি উপস্থিত থাকিলে তাহা শ্রীমন্ত অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, কথাবার্ত্তার মাঝখানে ইতি-মধ্যেই মালতি চা তৈরীর জন্য সম্ভবতঃ রান্নাঘরের দিকেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ থামিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "আজ অন্ততঃ মালতিকে আমি বইয়ের অনেকগুলো পাতা পড়িয়ে তবে যাবো।"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "দেখ্‌বেন, শেষ পর্য্যন্ত ওর আবার তা' হজম হয় কিনা!"

বিমলা দেবীও ছেলের কথায় মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়ি-লেন।

শ্রীমন্ত বলিল, "নিজে অবিশ্যি পড়াশুনো ছেড়েছি অনেককাল,

কিন্তু এ বিশ্বাস আমার এখনো আছে যে, কাউকে কোনো জিনিষ পড়িয়ে দিলে তা খারাপ হবে না।” বলিয়া নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে নিজেই আর-একবার হাসিল শ্রীমন্ত।

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, “হাসি দিয়ে নিজের কথাটাকে লঘু ক’রতে চাইলেন বটে আপনি, কিন্তু আসলে আপনার উপর ও বিশ্বাস আমারও যে নেই, তা নয়। ভালো টিচিং অধিক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে ভালো ডেলিভারী অব ল্যাঙ্গোয়েজের উপরে। এবং সেই ক্যাপাসিটি অব ডেলিভারেন্স্ আপনার আগাগোড়াই প্রেইজওয়ার্দ্দি। অতএব—”

বাধা দিয়া শ্রীমন্ত কহিল, অতএব, দোহাই আপনার, থামুন তো এবারে! আপনার এই ধরণের কথাগুলোকে আমি ধারালো তীরের মতই ভয় করি।”

থামিতেই হইল বটে নিখিল ব্রহ্মকে। তবে তাহা শ্রীমন্তের কথায় নয়, ইতিমধ্যেই মালতি চা লইয়া আসিয়া পড়ায়।

মালতি কহিল, “দেখুন না শ্রীমন্তদা একবারটি মুখে দিয়ে, বিস্বাদ না হ’য়ে গিয়ে থাকে, তাই ভাব্‌চি।” বলিয়া সাম্‌নে একখানি জলচৌকি টানিয়া দুই বাটি চা সুদ্ধ হাতের থালাখানি তাহারই উপর নামাইয়া রাখিল।

শ্রীমন্ত কহিল, “কথায় দেখ্‌চি, দাদা আর বোন তোমরা দু’জনেই সমান।” এবং সাথে সাথে আর-একটি দ্রব্যের প্রতিও বড় কম নজর পড়িল না শ্রীমন্তের।

চায়ের সাথে মালতির নিপুন হাতের সযত্ন-তৈরী ওম্‌লেট আর সিঙাড়ায়ও দুইটি প্লেট সাজানো।

শ্রীমন্ত বলিল, "এ আবার কী পাগ্‌লামা, মালতি ?"

"বাঃরে, পাগলামী আবার কিসের ?" উত্তরে মালতি কহিল, "শুধু শুধু বুঝি কেউ আবার চা খায় ! নিজের হাতে বিকেলে ব'সে সিঙাড়া ভেজেছি, ভালোমন্দ কিছু একটা প্রশংসা কিম্বা নিন্দেও কি শুন্‌তে ইচ্ছে হয় না আমার !"

বিমলা দেবী কোনো কথা বলিলেন না, ধীরে ধীরে এক-সময় পাশ কাটাইয়া বারান্দার ঘরের হারিকেনটি হাতে লইয়া উঠানের ওপাশে দক্ষিণ পোতার শণ-আঁটা ছোট্ট ঘরখানির দিকে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্ত কহিল, "নিন্দে প্রশংসা না হয় শেষ পর্য্যন্ত দু'টোই ক'রলাম, কিন্তু এদিকে ভাগ যে একটা কম হ'য়ে গেল দেখ্‌চি। চা না হয় তোমাকে নাই সাধ্‌লাম, সিঙাড়া আর ওম্‌লেটের কিছু ভাগ নিতে তো বাধা নেই নিশ্চয়ই !"

লজ্জায় দুই পা পিছাইয়া গেল এবারে মালতি, কহিল, "না, না, আমি আবার ভাগ নেবো মানে, আমি আপনার আসার অনেক আগেই খেয়েছি।"

অথচ আসলে এটুকু আদৌ সত্য নয়।

শ্রীমন্ত বলিল, "খেয়ে থাকলেও এতক্ষণে নিশ্চয়ই তা হজম হ'য়ে গেছে, এবারে আবার তাই খেতে বাধা নেই। এসো এদিকে লক্ষ্মী, নইলে এসব কিছু অম্‌নিই প'ড়ে থাক্‌বে।"

মালতি একরকম বাধ্য হইয়াই এবারে তাই কাছে আসিয়া প্লেট হইতে হাতে করিয়া দুইটি সিঙাড়া তুলিয়া নিয়া বিনা দ্বিধায় মুখে পুরিয়া লইল, কহিল, "এই তো খেলাম, এবারে হ'য়েছে তো! এরপর চা কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হ'য়ে যাবে।"

"হ'লে না হয় আর এক কাপই খাওয়াবে; কেমন রাজী তো?" মৃদু হাসিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "আজ কিন্তু ঠিক ক'রেছি একখানি গোটা বই-ই তোমাকে পড়িয়ে শেষ ক'রবো। তোমার দাদা ব'ল্‌ছিলেন, তুমি আবার হঠাৎ তা বড় বেশী হজম ক'রে উঠ্‌তে পারবে কিনা! কি বলো, সত্যিই পারবে না নাকি?"

"উপস্থিত মতো সেটা বোঝা যায়। আগে থেকেই কিছু একটা বলি কেমন ক'রে?" থামিয়া মালতি কহিল, "বেশ তো, চলুনই না, বারান্দার ঐ ঘরে গিয়ে বসি; বই-খাতা ওখানেই সব খোলা আছে। দাদা বরং ততক্ষণে আর একবার ঘুম দিয়ে উঠ্‌বে।"

আপত্তি তুলিল না নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, "আর একবার কেন, রীতিমত সমস্তটা রাত্রির মতই নিশ্চিন্তে চোখ বুজ্‌তে পারি। এমন আর ক্ষিধে রইল না যে, বড় একটা তাড়াতাড়ি আবার খাবার জন্যে উঠ্‌তে হবে। তার চাইতে তোর বরং কাজের পড়াই হোক্ খানিকটা।"

"আচ্ছা হ'য়েছে, নাও থামো এবারে।" বলিয়া ত্রস্তেই

একরকম মালতি আসিয়া আবার নিজের পড়ার যায়গাটিতে চুপচাপ বসিয়া পড়িল।

চায়ের পর্ব্ব শেষ করিয়া শ্রীমন্তও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিল না। আসিয়া মালতির পাশে বসিতেই তাহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল মালতির 'প্রোজ-সিলেক্‌শন'-নোটের খোলাপাতার একাংশে কয়েকটি পংক্তির দিকে :

…Joan is condemned and burned at the stake on May, 30, 1431.

[*N. B.*: Joan, the martyred patriot, burned as a witch, was finally declared a saint. The Pope revoked on 7th July, 1456, the Sentence passed on Joan. She was made venerable in 1902 and declared blessed in 1908. She was finally declared a Saint by the Roman Catholic Church in 1920]

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এটা তোমাদের নিশ্চয়ই কোর্সে আছে মালতি, না কি বলো?"

অস্ফুটস্বরে মালতি কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু ভালো ক'রে বুঝি নি একটুও শ্রীমন্তদা।"

"একটি অদ্ভুত এবং জ্বলন্ত আদর্শ-চরিত্র এই জোয়ান অব আর্ক্।" শ্রীমন্ত কহিল, "কাহিনীটিকে কোর্সে রেখে বিশ্ব-বিত্থালয় অত্যন্ত সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তুমিও কবে

যে ঐ জোয়ান অব আর্কের মতই আদর্শরূপিনী হ'য়ে উঠ্‌বে, তাই শুধু ভাব্‌চি মালতি। মা'র কাছে তোমাকে উৎসর্গ চেয়েছিলাম দেশের জন্যে, কিন্তু মা'র রক্ষণশীল মন তাতে সায় দেয় নি। তা—না হয় না-ই দিল', কিন্তু তুমিও কি পারো না লক্ষ্মীটি দেশের কাজে এগিয়ে আসতে ?"

আগাইয়া আসিতে মালতিও যে চায়! কিন্তু দুই হাতে তার সমস্ত অন্তরায় ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার দুর্ব্বল ভীরু পায়ে সেই বা কেমন করিয়া পথ চলিবার নেশায় মাতিয়া উঠিবে! আজন্মের বহুতর সংস্কারের রজ্জুতে যে তাহার সমস্তখানি মন দৃঢ়ভাবে বাঁধা! কী একটা জবাব দিতে যাইয়া কথা হারাইয়া ফেলিল মালতি। ভাবিল, দুর্জ্জয় সাহসে অন্ততঃ একটিবারও সে বলেঃ 'কেন পারবো না এগিয়ে আসতে শ্রীমন্তদা, আপনার পথ-নির্দ্দেশ যে আমার সব চাইতে বড় সম্পদকে পাবারই সুযোগ মিলিয়ে দেবে।' কিন্তু নিজের মধ্যে শতবার চেষ্টা করিয়াও মুখ ফুটিয়া সেটুকু প্রকাশ করিতে পারিল না মালতি শ্রীমন্তের কাছে। কিছুক্ষণ থামিয়া শুধু কহিল, "আমার মতো মেয়েকে দিয়ে কিছু আবার কাজও হ'তে পারে নাকি দেশের! আপনি বরং গল্পটাই আমাকে বুঝিয়ে দিন শ্রীমন্তদা!"

অলক্ষ্যে সম্ভবতঃ একটা দীর্ঘশ্বাস নামিয়া আসিল শ্রীমন্তের বুক হইতে। কহিল, "বুঝিয়ে দেবো বৈ কি মালতি, কিন্তু কি জানো, এমন একটা যুগের মধ্য দিয়ে আজ আমরা চ'লেছি

যে, শুধু বই প'ড়েই কিছু হবার নয় : বইয়ের পড়াকে ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি ক'রবার দরকার আগে। নইলে সেই পড়াটাও নিতান্ত নিরর্থক হ'য়েই দাঁড়ায়। সেই ব্যবহারিক জীবনের কথাটাই তাই তোমাকে ব'লতে চেয়েছিলাম আগে। জোয়ান অব আর্ক্ নিজের মধ্যে সেই উপলব্ধিকে সব চাইতে বড় ক'রে বোধ ক'রতে পেরেছিল ব'লেই আজও সে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।"

স্বল্প থামিল একবার শ্রীমন্ত, তারপর 'সিলেক্শন'-বইখানির কয়েকটি পৃষ্ঠার উপর দিয়া একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "পাঁচ শ' বছর আগে ফ্রান্সের ডোরেমি গ্রামে জন্ম হয় জোয়ানের। ফ্রান্সের ইতিহাসে তখন জীবন-মৃত্যুর সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্ত : ঠিক আমাদের আজ্কের এই ভারতবর্ষের মতই। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চ'ল্ছিল তখন ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে। ক্রমাগত ইংরেজ তখন গ্রাস ক'রছে ফ্রান্সকে। অনেকে ইংরেজকেই ফ্রান্সের রাজা ব'লে ভাব্তে সুরু ক'রেছে তখন। একদিকে এই বহির্ম্মুখী সংগ্রাম, আর একদিকে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। দেশের লোকদের মধ্যে দল ছিল তখন দু'টি : বুর্গান্ডিয়ান্স্ আর আরমান্যাক্স্। নিজেদের মধ্যেই লড়াই ক'রতো এরা অনবরত। মূর্খ বুর্গান্ডিয়ান্রা শেষ পর্য্যন্ত দেশের বিরুদ্ধে যোগ দিল' ইংরেজের সাথে। ফ্রান্সের রাজা ছিলেন তখন এক অপটু অক্ষম পাগল। তাঁর ছেলে ডাফিনও ছিল ঠিক বাপ্কে ব্যাটা অর্থাৎ কাপুরুষ, মূর্খ

এবং ফুলবাবু রাজা। অথচ লোকের মনে শান্তি নেই, দুঃখের আগুন জ্ব'ল্‌ছে সারা ফ্রান্স জুড়ে। জোয়ানের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। দেশের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো জোয়ানের।"

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একান্ত মনে কথাগুলি শুনিতেছিল মালতি, কহিল, "মাত্র ঐ দশ বছরেই দেশ-সম্বন্ধে জ্ঞান জ'ন্মেছিল জোয়ানের?"

"নয় তো কী?" শ্রীমন্ত কহিল, "দেশকে সারা হৃদয় দিয়ে ভালবাস্‌তো ব'লেই দেশের সমস্ত পাপ, সমস্ত কুশ্রীতা বড় ক'রে আঘাত হেনেছিল তার বুকে। আরও আশ্চর্য্য যে, সামান্য একজন কৃষকের ঘরের মেয়ে ছিল জোয়ান। একদিন দৈব-বাণীর মতই হঠাৎ সে কানে এক ধ্বনি শুন্‌তে পেলো, কে যেন কোন্ এক অদৃশ্য জগৎ থেকে তাকে চীৎকার ক'রে ব'লছে: 'তুমি রাজা ডাফিনের কাছে যাও, গিয়ে তাঁর অকর্ম্মণ্য মন্ত্রী আর পারিষদদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা ক'রে রেমিসে নিয়ে তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দাও।' শুনে নিজের মধ্যে একবার কেঁপে উঠ্‌লো জোয়ান। কিন্তু নিতান্তই একটা মুহূর্ত্তকালের ঘটনা এটা। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন এসেছে তার জীবনে। সেই বাণীকে লক্ষ্য ক'রে অনবরত দুঃসাহসী-বেগে ছুটে চ'ল্‌লো জোয়ান। এম্‌নি ক'রেই কখন্ যে তার জীবনের উপর দিয়ে দ্রুত অশ্ব-বেগে কেটে গেল ছ'টা বছর, তাকিয়ে দেখ্‌বার অবকাশ পেলো না সে। সতের' বছর যখন তার বয়স, কৃতকার্য্যতার পথে এসে দাঁড়াল

তখন জোয়ান। ফ্রান্সের সমস্ত অর্লিয়ান্স্ অঞ্চলটি তখন সম্পূর্ণ ইংরেজ-করতলগত। ডাফিনকে হাতে এনে জোয়ান চিঠি দিল' ইংরেজকে—তারা যেন অবিলম্বে অর্লিয়ান্স্ থেকে তাদের সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেয়।—"

মালতির সমস্ত চেতনার মধ্যে ক্রমশঃই যেন কেমন একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছিল, বলিল, "ইংরেজ শুন্‌লো সে কথা ?"

"ক্ষেপেছ তুমি ? সহজ কথায় কোনোদিন ইংরেজকে একচুলও কোথাও থেকে ন'ড়তে দেখেছ ? সেই চিঠি উপহাসচ্ছলে উড়িয়ে দিল' ইংরেজ। অনন্যোপায় হ'য়ে জোয়ান তখন প্রত্যক্ষ পথে নেমে সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়ে নিজেই প্রধান সেনাপতির কার্য্য পরিচালনা ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হ'লো। বুঝ্‌লে মালতি, মাত্র আট দিন; যুদ্ধ ক'রে মাত্র আট দিনেই অর্লিয়ান্সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রলো জোয়ান। তারপর সুরু হ'লো তার ক্রমাগত যুদ্ধজয়ের পালা। কিন্তু দুর্ভাগ্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে এই হতভাগ্য ভারতের মতই উমিচাঁদ আর মির্জ্জাফরের দল। ফ্রান্সের রাজাই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলো তার সাথে। বিপুল বিজয়ের মাঝপথে এসে এই প্রথম তাকে পরাজয়ের কণ্টকহার গলায় প'রতে হ'লো।—"

গৃহাভ্যন্তর হইতে নিখিল ব্রহ্মের বড় একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। হ্যারিকেন হাতেই বিমলা দেবী কি একটা

কাজে আসিয়া ইতিমধ্যে একবার সাম্‌নে দিয়া ঘুরিয়া গেলেন।

স্বল্প থামিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "কিন্তু কি ভাগ্য বিবর্ত্তন দেখ', সেই রাজাই একদিন বিপদে প'ড়লো কম্পিনে। আমরা হ'লে হয়ত স্বস্তিবোধ ক'রতাম, কিন্তু দেশপ্রাণ জোয়ান নিজের জীবনাদর্শের পথ থেকে এতটুকুও ভ্রষ্ট হয় নি। আবার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ ক'রে এগিয়ে গেল সে রাজাকে সাহায্য ক'রতে। আবার সম্মুখ-যুদ্ধ শত্রু-সৈন্যের সাথে নিয়তি বুঝি আড়াল থেকে একবার অট্টহাসি হাস্‌লো। ধরা প'ড়লো জোয়ান এবারে বুর্‌গান্‌ডিয়ান্‌দের হাতেই। শৃঙ্খলিত ক'রে তাকে রোয়েনে পাঠানো হ'লো। দেড়মাস ধ'রে বন্দী রইল সে কারাগারের শ্বাসরুদ্ধ সেলের ভিতরে। এদিকে ষাটজন লোক নিয়ে ব'স্‌লো বিচার-সভা। প্রধান বিচারপতি ফ্রান্সের পুরোহিত বিশপ কুশন ছিলেন একজন স্বার্থপর অত্যাচারী ইংরেজ-প্রভুভক্ত। বিচারে জোয়ান দোষী সাব্যস্ত হ'লো হত্যাকারী ও পাপী ব'লে। আর শাস্তি বিধান হ'লো —জীবন্ত দগ্ধ।"

সহসা একবার বিচিত্র শব্দে হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত। বলিল, "বিধান হ'লো—তাকে সজ্ঞানে আগুনে পুড়িয়ে মারা।"

মালতির বুকের ভিতরটাও আতঙ্কে একবার ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল, কাঁপিয়া উঠিল তাহার সমস্ত শরীরটা। সারা মুখের উপরে যেন মুহূর্ত্তমধ্যেই কেমন একরকম পাংশুবর্ণ ছায়া ফেলিয়া গেল।

শ্রীমন্তের চোখে সেটুকু এড়াইল না। কহিল, "এই দেখ', কাহিনী শুনে তোমারও মনে ব্যথা বেজেছে, কিন্তু যে-দেশবাসীর মুক্তির জন্যে শিশু-বয়স থেকে প্রাণপাত ক'রলো জোয়ান, সেই দেশবাসীর প্রাণে এতটুকুও আঘাত লাগে নি সেদিন। অত্যাচারী বিশপ আদেশ দিলেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে ; লেলিহান শিখায় দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো অগ্নিকুণ্ড। ফেলে দেওয়া হ'লো তার মধ্যে নিরপরাধিনী দেশত্রাতা বীরসেনানী জোয়ানকে। মুহূর্ত্তের জন্য শুধু একবার করুণ আর্ত্তনাদ ক'রলো সে : 'মাইকেল,—মাইকেল, আমাকে সাহায্য করো।' কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এসে দাঁড়ায় নি। জোয়ানের তখন মাত্র উনিশ বছর বয়স। সেই উনিশ বছরের শেষ প্রার্থনা-বাণীটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যেই। কেউ বুঝ্‌তে পারলো না, তাদের কতবড় আত্মজনকে এম্‌নি ক'রে নৃসংশ ভাবে মারা হ'লো,—কেউ বুঝ্‌তে পারলো না—ফ্রান্সের কতবড় দরদী সর্ব্বত্যাগিনী দেশপ্রাণাকে চোখের সাম্‌নে তাদের হারাতে হ'লো।"

স্বল্প থামিয়া একবার দম নিলো শ্রীমন্ত, তারপর পুনরায় কহিল, "জানো মালতি, এম্‌নি ক'রেই দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বোঝে না ; এম্‌নি ক'রেই দুর্ব্বৃত্তের হাতে প'ড়ে তাদের মৃত্যু হয়। যীশুখৃষ্টকেও এম্‌নি ক'রে একদিন ম'রতে হ'য়েছিল। অন্তিম মুহূর্ত্তে পরম বিধাতার উদ্দেশ্যে একবার স্বর তুলে শুধুমাত্র তিনি ব'লেছিলেন, "ঈশ্বর, ওদের ক্ষমা করো,

অন্ধের মতো ওরা কি ক'রছে, ওরাই বুঝ্তে পারছে না।'
তার পর-মুহূর্ত্তেই চিরদিনের মতো তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে গেল।
অথচ আজ 'যীশু···যীশু' ব'লে সমস্ত ইউরোপ মাথা খুড়ছে,
যীশুর নামে জয়ধ্বনি আজ বিশ্বের চারদিকে। জোয়ানের
নামেও তা-ই হ'লো। লোকে যেদিন তাদের ভুল বুঝ্তে
পারলো, জোয়ানের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম রেখে
অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রলো তারা সকলে। আর তারই প্রমাণ পাচ্ছ'
এই কাহিনীর মধ্যে···She was finally declared a
Saint.···"

মালতি বলিল, "সে অশ্রুর কি আর এতটুকুও মূল্য রইলো!
চিরদিন যে তার জীবনকে তুচ্ছ ক'রেও নির্য্যাতন সহ্য ক'রে
ম'রলো, ম'রবার আগে তো একবিন্দু স্নেহের কণাও পেলো
না সে দেশ আর জাতির কাছ থেকে!"

"পায় না মালতি, কোনো দিনই তারা পায় না।" শ্রীমন্ত
কহিল, "যারা বিপ্লবী, চিরকাল তারা অভিশাপ নিয়েই জন্মায়।
নির্য্যাতনই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমাদের দেশটাই
দেখ' না! গণপতি পাণ্ডের মতো নিঃস্বার্থ কর্ম্মীরও সেদিন
ফাঁসি হ'লো। জেলখানার সেলে আর ঐ ফাঁসিকাষ্ঠেই কি
কম দেশপ্রাণদের জীবন গেল! অথচ কী পেয়ে গেল তারা
দেশ থেকে?—অবহেলা আর দুঃখ।"

তারপর মালতির দিকে সামান্য আড়াল করিয়া নিজের
ডায়ারী খাতার কয়েকখানি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া প্রসঙ্গতঃ আরও

কয়েকটি জ্বলন্ত ঘটনা বিবৃত করিল শ্রীমন্ত মালতির কাছে। নিতান্ত অন্যমনস্কতার মধ্যেও প্রতিমুহূর্ত্তের ভয় তার—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে তার একান্ত গোপন সংবাদগুলি। ডায়ারীর পাতায় মিশিয়া আছে তার ধ্বংস আর নিরাপত্তা একই সঙ্গে।

মালতির মুখে আর একটি কথাও প্রকাশ পাইল না। নির্ব্বাক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চাহিয়া রহিল শ্রীমন্তের মুখের পানে। জোয়ানের জীবন-কাহিনী এবারে জলের মতো স্বচ্ছ সহজ হইয়া গিয়াছে তাহার মাথায়। তাহা লইয়া আর এতটুকুও প্রশ্ন নাই। নির্ব্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল সে শুধু শ্রীমন্তকেই। অনেকখানি ঘামিয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যে। কপালের উপর বিক্ষিপ্ত ঘামের বিন্দুগুলি আরও যেন স্পষ্ট ও গভীর করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে। বাস্তবিকই কেমন একটা অদ্ভূত আকর্ষণ জাগে তাহার প্রতি! তাহার আবেদন ঠেলিয়া ফেলিতেও যে হৃদয়ে লাগে! অথচ শ্রীমন্তের কথায় যে-পথের ইঙ্গিত জাগে, সে-পথ যে চিরকালীন বন্ধুর, চিরকালীন ক্ষুরধার। সে-পথের পুরষ্কার যে ঐ জোয়ানের মতই বিভীষিকাময়, ত্রাসময়। সে-পথে চলিবার মতো আদৌ যে শক্ত ঋজু নয় মালতি। শ্রীমন্তই কি পারে না নিজে হইতে তাহাকে হাত ধরিয়া সেই পথে নামাইতে! সত্যিই তবে ভয় করে না মালতি, একটুও ভয় করে না সে—যদি শ্রীমন্ত তার বলিষ্ঠ বাহুতে তাহাকে সমস্ত ঝঞ্ঝা হইতে ঢাকিয়া রাখে।

শ্রীমন্ত কিন্তু মালতির মনের এই স্রোতকে বিন্দুমাত্রও

উপলব্ধি করিতে পারিল না। কহিল, "জোয়ান যদি তার ঐ মাত্র উনিশ বছর বয়সেই প্রত্যক্ষ শত্রু-সমরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে পারলো, তুমিও কেন পারবে না অন্ততঃ খানিকটাও এগিয়ে আস্‌তে মালতি? তুমিও তো নারী, তোমার মধ্যেও যে শক্তি আছে মাথা তুলে দাঁড়াবার। পাশে শুধু 'সঞ্চয়িতা'ই রেখেছ, পড়ো নি 'সবলা'? নারী ব'ল্‌ছে—

শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে'
সার্থকের পথ!
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্‌গা পাশে!
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।...

নারী শুধু তো তার হাতের কাঁকনেই আবদ্ধ নয়, শক্তির অস্ত্রও যে র'য়েছে তার হাতে। সেই অস্ত্র দিয়ে পথ কেটে চ'ল্‌বে সে নিজের গতিতে। সেই শক্তির অস্ত্রকে একবার নিজের মধ্যে কি শানিয়ে নিতে পারো না মালতি? একবারও কি পারো না ওম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে—'কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ!"

এতক্ষণের মধ্যে মালতির চোখের পলক সম্ভবতঃ একবারও পড়ে নাই। এবারে হঠাৎই একরকম তার মুখ দিয়া বাহির

হইয়া আসিল: "কেন পারবো না ব'লতে শ্রীমন্তদা ? বলুন, আপনি আমার পাশে থাক্‌বেন,—বলুন, যদি কখনও ঝড় আসে, আগ্‌লিয়ে রাখ্‌বেন আমাকে ত্ব'হাত দিয়ে ? আপনাকে পেলে যে আমি সব পথেই চ'ল্‌তে পারি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যেন খানিকটা বাড়িয়া গেল মালতির। তিল তিল করিয়া যে কথাটাকে এতদিন সে নিজের মনের মধ্যেই ঘুমাইয়া রাখিয়াছে, এমন অসম্বৃতভাবে যে তাহা এইভাবে সে বলিয়া ফেলিবে—এ-কথা একটু আগে পর্য্যন্তও সে ভাবিতে পারে নাই।

শ্রীমন্ত কিন্তু কথাটাকে সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিল। একবার মনে হইল সৌদামিনীর কথা। নারী জাতিটা পুরুষের মতো ঠিক বিজ্ঞান-বিক্ষুব্ধ নয়, সমস্ত কিছুর মধ্যেও তাহারা মূলের দিকটায় একবারে স্বতন্ত্রভাবে এক। সৌদামিনীও প্রথম-প্রথম ঠিক এম্‌নি করিয়াই প্রশ্ন তুলিত। কহিল, "কিছু একটা অবলম্বনের উপরে নির্ভর ক'রে কখনো বিজয়-যাত্রা হয় না পৃথিবীতে, মালতি। এতক্ষণ ধ'রে এই যে জোয়ানের জীবন-কাহিনী শুন্‌লে, এটা কি নিতান্তই রূপকথার মতো অলীক হ'য়ে দাঁড়ালো তোমার কাছে ? তোমার বয়সে জোয়ান ফ্রান্স থেকে ইংরেজকে তাড়িয়েছিল, আর তোমার কাছে তুমি নিজেই তাড়না বোধ ক'রছো ? আজও কি বুঝ্‌বো না যে, আমাদের মা-বোনদের অন্ততঃ এতটুকুও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য হ'য়েছে !"

মালতি দ্বিধা করিল না, বলিল, "ও-দেশ আর এ-দেশ, কার সাথে কি তুলনা ক'রতে চাইছেন শ্রীমন্তদা ?"

মনটা গোড়া হইতেই বিক্ষুব্ধ হইয়া ছিল, এবারে কতকটা উদ্দীপ্ত হইয়াই উঠিল শ্রীমন্ত : "শিখেছ শুধু দেশের তারতম্যই বিচার ক'রতে মালতি। কেন, আমাদের দেশেই কি শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার মতো নারী নেই, ব'ল্‌তে চাও ? তেহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী মহা বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার মতো জীবন দিলেন গত বিয়াল্লিশে। লক্ষ্য করো নি কাগজের রিপোর্ট ? শোনো—" বলিয়া দ্রুত হস্তে ডায়ারীর কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া শুনাইল শ্রীমন্ত : '...মেদিনীপুর আগষ্ট বিপ্লবের শহীদ বয়োবৃদ্ধা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন-কথা বাংলার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রহিল। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সহস্র সহস্র নরনারী, বালক-বালিকার বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়াছে—তাহাব পুরোভাগে মহাশক্তির অংশসম্ভূতা বীর-নারী মাতঙ্গিনী; এক হাতে তাঁহার শঙ্খ, অন্য হাতে চল্লিশকোটী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলিতে তাঁহার বামহাতের কুনুই বিদ্ধ হয়, হাতের শঙ্খ পড়িয়া যায়। তথাপি বামহস্ত বিদ্ধ হইয়াছে হউক, দক্ষিণ হস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াই তিনি শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরমূহূর্ত্তে আবার গুলি,—গুলি আসিয়া বিদ্ধ হইল এবারে দক্ষিণ হাতের কনুইয়ে, এবং সেই মূহূর্ত্তেই তাঁহার ললাট লক্ষ্য

করিয়া পুনরায় গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। গুলিবিদ্ধ হইয়া ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী পড়িয়া গেলেন, তথাপি জাতীয় পতাকা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। বীর নারী আত্মবলি দিয়াও পতাকার সম্মান রক্ষা করিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ আত্মাহুতি ভারতীয় নারীসমাজকে যে কতবড় আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গেল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।'…

সামান্য থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "অথচ বাস্তবিকই যে এতটুকুও অনুপ্রেরণা এসেছে নারী-সমাজে, তা তো মনে হ'চ্ছে না। অন্ততঃ তা হ'লে তোমার মধ্যেও তার এতটুকুও ধ্বনি বাজ্‌তো।"

কতকটা অপ্রস্তুতই হইয়া পড়িল এবারে মালতি। অথচ মন যে তাহার সাড়া দিতেই উন্মুখ হইয়া আছে। এ-কথা শ্রীমন্তকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! তাহার সমস্তখানি মন যে শ্রীমন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার ঐ গুম্ফাবৃত অবয়বের মধ্যে সে যে এক দীপ্ত মাধুর্য্যকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। অসহায়া নারীর মতই প্রতিমুহূর্ত্তে সে নিজের মধ্যেই নিজে মজা নদীর মতো মজিয়া আছে! শত চেষ্টা করিয়াও যে মুখ ফুটিয়া সে এইটুকু বলিতে পারিতেছে না: 'তুমি আমাকে গ্রহণ করো, তোমার কাছে যে আমার কোনো ভয়ই নাই, তোমার সাহসে সাহস নিয়া আমি যে ঐ মাতঙ্গিনীর মতই পুলিশের বুলেটকেও ভয় করি না; দুঃসাহসে বুক পাতিয়া দিতে পারি বন্দুকের গুলির সামনে।' এইখানেই তার

নিজের কাছে নিজের পরাজয়, তার সমস্ত সত্তার পতন। যে কারণে একসময়ে মন তার মাদারীপুরের সেই প্রিয়তোষের সম্বন্ধে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইয়াছে—মনুষ্যত্বের কাছে প্রিয়তোষের সমস্ত অনুভূতি ও ব্যক্তি-সত্তার মূল্য কত হেয়, কত ছোট, সেই বিশেষ কারণটির অতুলতা যে শ্রীমন্তের সংস্পর্শেই সে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহাকে ভালবাসিতেই যে সুখ।

এতটুকুও আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না মালতি। কিছুক্ষণ শ্রীমন্তের চোখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া নিলো সে।

শ্রীমন্ত সম্ভবতঃ আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে বাহিরের দুয়ারে যেন কাহার গলার শব্দ পাওয়া গেল। প্রথমটা কেহই বড় একটা কান দিল না সেদিকে।

স্বল্পকাল পরে পুনরায় একবার কৃত্রিম কাশির শব্দ হইল: "রায় বাবু আছেন নাকি, রায় বাবু আছেন এখানে!"

ভিতর হইতে গলার স্বরটা ঠিক ভাল করিয়া চেনা যায় না।

"কে?"—উঠিয়া আসিল শ্রীমন্ত।

বাহিরে আসিতেই অস্পষ্ট অন্ধকারে একবার সেলাম ঠুকিয়া লোকটি কহিল, "আইজ্ঞা কর্ত্তা, আমি মক্‌বুল আলী!"

"আরেঃ—খবর কি, কখন্ এলে তুমি মক্‌বুল?"—বিগতপ্রায় কৃষ্ণাতিথির সেই অন্ধকারেই একবার কাছে আগাইয়া মক্‌বুল আলীর ঘাড়ের উপরে দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল শ্রীমন্ত।

মক্‌বুল আলী কহিল, "এই কিছুক্ষণ হ'লো মাত্র এসে পৌঁছেচি। ঘরে খোঁজ ক'র্‌তি যেতে গিয়ে দেখ্‌লাম তালাবন্ধ; ভাব্‌লাম রাত ক'রে আর কোথায়ই বা যাবেন, ম্যানেজার বাবুর বাড়ীতেই হয়ত এসি থাক্‌বেন, তাই এলাম।—"

"তা বেশ ক'রেছ! তারপর, মজীদের স্ত্রীর কোনোরকম অসুবিধে হয় নি তো সেখানে?" শ্রীমন্ত কহিল, "এস, আর খানিকটা পথের দিকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলি।"

সামনেই রাস্তার একটা সামান্য মোড়। আগে আগে ঐ মোড়েই লাইট-পোষ্টের মতো একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রেশন চালু হইবার পর হইতে সে বাতিটা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল দুইজনে।

মক্‌বুল আলী কহিল, "দিয়ে অবিশ্যি এলাম, কিন্তু বেশী দিন যে সেখানেও থাক্‌তি পারবে মজীদের বউ, তা মনে হ'লো না। যাদের হাতে নিয়ে তাকে দিয়ে এলাম, আড়ালে যেন একবার তারা কপালে চোখ তুল্‌লো। আসবার কালে অনেক কান্নাকাটি ক'রলো বউটা, ব'ল্‌লো, 'ভাইজান, মাঝে-মধ্যি খোঁজ খবর ক'রবেন।' ব'ল্‌লাম, 'ক'রবো বৈ কি, নিশ্চয়ই ক'রবো।' ব'ল্‌লাম বটে রায় বাবু, কিন্তু সত্যিই কি তা আর সম্ভব হবি? রওনা হলাম, অনেক দূর থিকা একবার পিছন ফিরে তাকালাম দেখ্‌লাম—বাচ্চাগুলি একদিষ্টে তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে। ইচ্ছা হ'লো না আসি—"

সম্ভবতঃ শেষদিকে একবার গলাটা ধরিয়া আসিল মক্‌বুল আলীর।

শ্রীমন্ত কহিল, "আমাদের উচিৎ হবে এখন, যে কোনো ভাবেই হোক্‌, অন্ততঃ ওর বড় ছেলেটা সক্ষম হ'য়ে না দাঁড়ানো পর্য্যন্ত প্রতিমাসেই কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে ওকে পাঠানো। তোমার উপর এ ভার রইলো।"

এ ভার যে কতবড় গুরুভার, তাহা মক্‌বুল আলীর বুঝিতে বা জানিতে বাকী নাই। তথাপি শ্রীমন্তের কথার উত্তরে কিছু একটা বলিতে পারিল না। নীরবে সাম্‌নের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমন্ত বলিল, "এসে সম্ভবতঃ এখনও খাওয়া-দাওয়া সারো নি! যাতায়াতে পথে খুব কষ্ট হ'য়েছে নিশ্চয়ই, না কি বলো?"

"ও কষ্ট কি কিছু একটা গায়ে লাগে রায় বাবু? কর্ত্তব্য-কাজে আবার একটা কষ্ট কি!" হাসিয়া মক্‌বুল আলী কহিল, "আপনার চরণের আশীর্ব্বাদে কষ্টকে এখনো কিছু একটা কষ্ট ব'লে মনে করি না।" তারপর থামিয়া কহিল, "পথে পাংশা ইষ্টিশনে বড় ভালো 'সবরী'-কলা আর চম্‌চম্‌ পেয়ে গেলাম, তাই দিয়েই জল খেয়েছি। এই তো এখন ঘরে গিয়ে আবার খাবার ব্যবস্থা ক'রবো।"

"তবে আর দেরী কোরো না। খাওয়া দাওয়া সেরে রাতের মতো আজ বিশ্রাম নাও গে। নইলে শরীর ভেঙে প'রবে।

কাল সকালে বরং পারো তো একবার আমার ওখানে এসো, কথা আছে।” কিছুটা ইতস্ততঃ করিল শ্রীমন্ত। তারপর পুনরায় কহিল, “এখানকার অবস্থাটাও বড় বেশী ভালো যাচ্ছে না এখন। সে সম্বন্ধেও চিন্তা আছে। সে সম্বন্ধেও তোমাকে ব'ল্‌বো। আজ্‌কের মতো বরং এস তুমি।”

মক্‌বুল আলীও আর বৃথা কালক্ষেপ করিল না। আরও দুই-একটা কি সামান্য কথা সারিয়া লইয়া ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

কিন্তু শ্রীমন্ত কেন যেন হঠাৎই আবার আসিয়া মালতির পাশে বসিতে পারিল না। সহসা কেমন যেন মাথায় তার সমস্ত কিছু তালগোল পাকাইয়া গেল। এই মুহূর্ত্তে অকারণেই আর একবার মনে পড়িল বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর কথাগুলি। বিকালের ব্যাপারটা আদৌ শুভ বা রুচিকর হয় নাই। এই ঘটনার পর আর কি বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিবার এতটুকুও সুযোগ রহিল? আর সেই সুযোগ না থাকা অর্থ পাটগুদামের ত্রিসীমানার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। বহুক্ষণ ধরিয়া নিজের মধ্যে নানারকম চিন্তা করিল শ্রীমন্ত।

ঘরের তক্তপোষে তখন নিখিল ব্রহ্ম সত্যিই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ আজ সে একটু বেশীই ক্লান্ত হইয়াছে কাজে। শরীরের অবসন্নতায় এমন মুহুর্মুহুঃ তাই ঘুমের জড়তায় দুই চোখ বুজিয়া আসিতেছে।

মালতি কিছুক্ষণ একই অবস্থায় বসিয়া ছিল। শ্রীমন্তের ডায়ারী খাতাখানি অতর্কিতে সেই অবস্থায়ই খোলা পড়িয়া ছিল হারিকেনের সাম্‌নে। বড়বেশী সাবধানতা সত্ত্বেও বাহিরে আসিবার মুহূর্ত্তে খাতাখানিকে হাতের মুঠায় টানিয়া নিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল শ্রীমন্তের। একরকম কৌতূহল বশতঃই দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপে তাহার প্রায় সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাগুলিই একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল মালতি। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরে একবার যেন কেমন এক অদ্ভুত কাঁপন খেলিয়া গেল, শিরশির করিয়া উঠিল একবার সমস্ত শরীরটা, একটা অজানা আতঙ্কেও বুকখানি বড় কম দুর্‌-দুর্‌ করিয়া উঠিল না মালতির। যে স্বপ্ন-সাগরে একটু আগেও সে সুখের সেতু রচনা করিতেছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ভাঙিয়া চৌচির হইয়া গেল। মথুর দত্ত নামটি ইতিপূর্ব্বে সেও কাগজে দেখিয়াছে, আগষ্ট বিপ্লবের এই পলাতক আসামীর খোঁজে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও জোর পুলিশ তদন্ত চলিয়াছিল। শ্রীমন্ত আর এই মথুরের মধ্যে তবে কি সত্যিই কোনো পার্থক্য নাই! চকিতে উঠিয়া গিয়া বিমলা দেবীর কাছে আসিয়া ডাকিল মালতি: "মা!"

একেবারে সম্পূর্ণ একটি নতুন স্বর মালতির কণ্ঠে।

"কেন রে? পড়া শেষ হ'লো?"—বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া আগ্রহের সুরে কহিলেন বিমলা দেবী।

কিন্তু মালতি আর কিছু একটাও বলিতে পারিল না।

বিমলা দেবী কহিলেন, "এদিকে রাত তো ক্রমশঃ বেড়েই

চ'লেছে, খাবার ব্যবস্থা ক'রলে পারতিস্ নে মা? আবার বরং কাল প'ড়বি!" থামিয়া কহিলেন, "আজ যেন একটু ভালো ক'রে দেখে শুনে দিস শ্রীমন্তকে।"

মালতির মুখে এবারও কিছু একটা কথা ফুটিল না। নীরবে একসময় সে রান্নাঘরের দিকে উঠিয়া গেল। . .

চিন্তার শেষ ছিল না শ্রীমন্তের। মানুষের মন আর বিবেক-বস্তুটা সম্ভবতঃ এমনি করিয়াই তৈরী। একটা কিছুর সংস্পর্শ পাইলেই সে বস্তুতর অবস্থার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে। মকবুল আলীকে কাল একটা নতুন যায়গাই দেখিয়া দিতে বলিতে হইবে।..

ধীরে ধীরে আবার বারান্দার ঘরে উঠিয়া আসিল শ্রীমন্ত।

হারিকেনটা তখনও তেমনি করিয়াই জ্বলিতেছে। মালতি নাই। বইগুলি তেমনিই খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ডায়ারী খাতাখানির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সহসা সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল এবারে শ্রীমন্তের। নিজেকে আজ সে একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছে এই বন্দরে। মালতি যদি সত্যিই ইতিমধ্যে কোনো একটি বিশেষ পৃষ্ঠাও পড়িয়া থাকে, তবে যে তাহার এই দীর্ঘ-দিনের আত্মগোপন—সবই বৃথা হইয়া যাইবে। আর মালতির জানা মানে—সকলের কানেই তাহা রাষ্ট্র হইয়া যাওয়া। ইহা গোপন থাকিবার নয়, গোপন থাকিতে পারে না কখনো এ ঘটনা।--নিজের মধ্যে একবার শিহরিয়া উঠিল শ্রীমন্ত। সমস্ত

কাজই আজ যেন তাহার কেমন অস্বাভাবিক, কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে! আর ভাবিতে পারে না শ্রীমন্ত। কিছুক্ষণ দুই হাতে শক্ত করিয়া নিজের মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভিতর হইতে হঠাৎ ডাক আসিল: "ভাত বেড়েছি শ্রীমন্তদা, খেতে আসুন।"

ইতিমধ্যেই নিজেকে অনেকখানি প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছে মালতি। হৃদয়ের সুপ্ত ভালবাসার যে স্বপ্নসৌধটি তার এক নিমিশেই ভাঙিয়া চৌচির হইয়া গেল, তাহাকে লইয়া বৃথা ক্ষোভ করিয়া লাভ নাই। ডায়ারীর অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়িয়া যে অজানা সৌদামিনী ছায়ার মতো কায়িকরূপ ধরিয়া মিশিয়া আছে, সে যদি সত্য হয়, তবে আলোর তৃষায় পতঙ্গের মতো নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া জ্বালা বাড়ানো ভিন্ন আর কি সত্যিই কিছু লাভ আছে মালতির! নিজেকে যথেষ্ট সহনশীলতায় প্রকৃতিস্থ করিয়া লওয়া ভিন্ন আর পথ কোথায় তার?

আবার স্বর তুলিল মালতি: "খেতে আসুন শ্রীমন্তদা, এরপর যে আরও রাত হ'য়ে যাবে!"

কিন্তু খাবার জন্য আদৌ আজ প্রস্তুত ছিল না শ্রীমন্ত। ডাক শুনিয়া সহসা বড় সচকিত হইয়া উঠিল সে; কহিল, "খাবো মানে, আমার যে একটুও ক্ষিধে নেই; এই তো একটু আগে চায়ের সঙ্গে কত কি খেলাম!—"

কথাগুলি অবশ্য দুই পক্ষেরই নেপথ্যে হইয়া গেল।

শ্রীমন্ত ভাবিয়াছিল—চেষ্টা করিয়া আজ হয়ত সে এড়াইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিমলা দেবী। কহিলেন, "এখনও ব'সে কেন বাবা, খাবে তো ডাল-ভাত চাট্টি, তেমন কিছুই তো আজ আর হয় নি। এস, উঠে এস, আর দেরী কোরো না।"

এবারে বাধ্য হইয়াই শ্রীমন্তকে উঠিতে হইল।

মালতির ডাকে নিখিল ব্রহ্মকেও ইতিমধ্যে উঠিতে হইয়াছিল। বলিল, "নতুন ক'রে প্রতিবারই খাওয়া সম্বন্ধে এমন লজ্জা ক'রবার কোনো মানে হয় শ্রীমন্তবাবু?"

"এই বা কোন্ দিশি বলুন দিকি নি?" শ্রীমন্ত নিজেকে অনেকখানি চাপিয়া যাইয়া কহিল, "রোজ রোজ এমন ক'রে খাবার ব্যবস্থা করাই কি ভালো?"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ভালোমন্দ সে সব মালতির কাছে। একাধারে বোন এবং ছাত্রী, অতএব এ নিয়ে যদি কিছু একটা ঝগ্‌ড়া ক'রতে চান, তবে তার সাথেই করুন।"

মালতি কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল, মৃদু পায়ে এবারে সে ভিতর-বারান্দার আড়ালে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

বিমলা দেবী কহিলেন, "আমার যদি আর পাঁচটি ছেলে থাক্‌তো, তবে তো এম্‌নি ক'রেই একসাথে ব'সে খেতো। তুমি এটুকুতেই লজ্জা পাও বাবা শ্রীমন্ত, কিন্তু আমার যে কাছে ব'সে দেখে কতখানি চোখ জুড়োয়, তা খুলে ব'ল্‌তে ভাষা দেন নি ভগবান।"

শ্রীমন্তের আর দ্বিরুক্তি করিবার মতো এতটুকুও শক্তি রহিল না এবারে। যতখানি সম্ভব হইল, একরকম নীরবতার মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল।

মালতিও ইতিমধ্যে রান্নাঘরে বসিয়াই কখন এক ফাঁকে খাইয়া লইল। বিধবা মানুষ বিমলা দেবী, কোনোদিন বা একটু সামান্য সাগু ভিজাইয়া খান, কোনোদিন বা নির্জ্জলাভাবেই কাটাইয়া দেন। ইহা লইয়া বিন্দুমাত্রও তাগিদ নাই তাঁহার। একান্তে বসিয়া কিছুক্ষণ তাই বেশ গল্পে যোগ দিলেন তিনি শ্রীমন্তের সঙ্গে।

মালতি যে কখন আসিয়া আবার তাহার পড়ার যায়গাটিতে চুপ করিয়া 'সঞ্চয়িতা' খুলিয়া বসিয়াছে, তাহা কাহারোই দৃষ্টিতে আসে নাই। প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা জাগিয়া রহিয়াছে মালতির মধ্যে। শ্রীমন্তের মতো এমন বিপ্লবী জীবনকে যে দূর হইতেও ভালবাসার রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কে সেই সৌভাগ্যবতী সৌদামিনী? কাছে পাইলে একবার তাহাকে প্রশ্ন করিয়া যাচাই করিয়া লইত মালতি—মানবতার পায়ে সত্যিকারের প্রেমের অর্ঘ্য কাহার বড়? মাত্র সামান্যক্ষণের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড একটি বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে মালতি, তেম্‌নি এই সামান্য ক্ষণের প্রতিটি মুহূর্ত্তেই তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও বড় বেশী জড়াইয়া পড়িতেছে সেই বিস্ময়েরই জালে। 'সঞ্চয়িতা'র প্রতিটি কবিতার মধ্যেও

যেন ঠিক তেমনি বিস্ময়, তেমনি এক অদ্ভুত না-বোঝা আর না-জানা ইঙ্গিত-মূর্চ্ছনা।

স্বাভাবিক কণ্ঠেই হঠাৎ ডাক দিল মালতি : "শ্রীমন্তদা ?"

শ্রীমন্ত একরকম রাত্রির মতো বিদায় লইয়াই উঠিতেছিল সেই মুহূর্তে। আসিয়া পূর্ব্বের মতো সহজ ভঙ্গিতেই আর একবার কাছে বসিল মালতির। কহিল, "সঞ্চয়িতা'র সব কবিতা পরিষ্কার বোঝো ? যেখানে কবি এই বাস্তবতার মধ্যেও বস্তুকে ছাড়িয়ে দিগন্তপ্রসারী, যেখানে তাঁর সসীম আর অসীম এক হ'য়ে মিলে গিয়ে অদ্ভুত এক জীবনাদর্শের সৃষ্টি ক'রেছে, যেখানে তিনি সকল অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণের অনন্ত স্পর্শ এনে রেখেছেন—ধ'রতে পারো তাঁর সেই প্রাকৃতিক ও দার্শনিক দ্বৈত আর অদ্বৈত সুরের মিল ?"

মৃদুস্বরে মালতি কহিল, "প্রবেশিকার দ্বারই আজও পেরোতে পারলুম না, অমন দ্বৈত আর অদ্বৈত সুরকে ধ'রবো কোন্ বিদ্যেয় ! ভালো লাগে তাই পড়ি। দিন্ না তবু একটা বুঝিয়ে ?"

"বেশ।" 'সঞ্চয়িতা'র কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লইয়া শ্রীমন্ত কহিল, "ধরো এই 'বিলম্বিত' কবিতাটি। খুব অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত হাল্কা ভাবের রচনা—

'অনেক হোলো দেরী
আজো তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।'...

উধাও যাত্রার পথে জীবনের এক অনির্ব্বচনীয় দ্বৈতধারা এসে মিলেছে এই কবিতাটিতে।—"

বাধা দিয়া মালতি কহিল, "উঁহু ওটা নয়, আগে এটা সম্বন্ধে বলুন।"

আবার ক্কর-ক্কর শব্দে কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়া গেল।

মালতি একবার টানা টানা সুরে পড়িল ঃ

"আপনারে তুমি করিবে গোপন কি করি ?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি'।..."

চলার পথে আচম্বিতে একটা হোঁচট খাইবার মতই সহসা থামিয়া পড়িল এবারে শ্রীমন্ত। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়—এ-কথা সে জানে; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ঠিক যেন সে মালতিকে তার আপন স্বরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। যতখানি কচি মনে করিয়াছিল সে মালতিকে, ততখানি কচি খুকি ঠিক সে নয়। মালতির চোখের উপর দিয়া চকিতে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল শ্রীমন্ত। কিছু একটা বুঝাইবার মতো ভাষা এবারে সত্যিই সে খুঁজিয়া পাইল না নিজের মধ্যে। কহিল, "আজ রাত হ'য়েছে, ওটা বরং আর একদিন বুঝিয়ে দেব' তোমাকে, মালতি।"

"আগের ওটা বুঝাতেও কি রাত হ'তো না শ্রীমন্তদা ?" মালতির কণ্ঠ হইতে যেন সমস্ত জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। মনের কথাটুকুকে চাপিতে যাইয়া বারবার নিজের মনের মধ্যেই একটা বিরাট প্রশ্ন-সমুদ্রে সে আবর্ত্ত-চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল মালতি। তারপর কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, এই না মাকে সেদিন ব'ল্‌ছিলেন যে, বাড়ীতে এক বুড়ী ঠাকুরমা ভিন্ন আপনার আর কেউ নেই শ্রীমন্তদা,—তাই যদি হবে, তবে শ্রীময়ী এলেন কোত্থেকে? আপনার নামেরই তো উল্টো পিঠ তিনি, তাই নয় কি?"

শ্রীমন্তের জিভ্‌টাকে কে যেন গলার ভিতর হইতে এবারে সজোরে টানিয়া ধরিল। কথা বলিতে যাইয়া আড়ষ্ট হইয়া আসিল জিহ্বা। নিজের এই ব্যর্থ পরাজয়ের গ্লানিতে নিজেকে ধিক্কারও দিল সে বড় কম নয়।

মালতি কহিল, "আপনার সাধনা সম্ভবতঃ বৃথা যায় নি শ্রীমন্তদা। ভারতবর্ষ না হোক্, অন্ততঃ এই বাংলাদেশের একটি নারীও আপনার আদর্শে আদর্শময়ী হ'য়ে উঠেছেন। তিনি যদি বাস্তবিকই সত্য হ'য়ে থাকেন, তবে আপনাকে প্রণাম ক'রবার সাথে সাথে তাকেও প্রণাম করি আমি এই অবসরে।"

মাথা নত করিয়া আচম্বিতে একবার প্রণাম করিল মালতি শ্রীমন্তকে। কিন্তু সহসা যেন সেই নত শির আর বড় বেশী তুলিয়া ধরিতে পারিল না মালতি। কখন্ অলক্ষ্যে তাহার দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল শ্রীমন্তের পায়ে।

ভাগ্যবিধাতা হয়ত আড়ালে থাকিয়া একবার হাসিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে অতি সামান্য অথচ অত্যন্ত গভীর যে-বিষয়টি ঘটিয়া গেল, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেহই। না মালতি

না শ্রীমন্ত। অত্যন্ত কঠিন মন লইয়াই কথা তুলিয়াছিল মালতি, কিন্তু শেষ পর্যান্ত সত্যিই সে নিজেকেও যেন বড় বেশী স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিল নিজের অজ্ঞাতেই।

ত্রস্তে পা দুইখানি সরাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল শ্রীমন্ত। ইহার পর যেটুকু বাকী আছে, সেই অনর্থটুকু ঘটিতেও সম্ভবতঃ আর বিলম্ব হইবে না। মিথ্যা অনুমান করে নাই শ্রীমন্ত। নিজের ভুলে আজ সে নিজের সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিয়াছে এই বন্দরে। মালতির কাছে ডায়ারীর গোপন রহস্য আর এতটুকুও অজানা নাই। পাশে ঘরের ভিতরে নিখিল ব্রহ্ম আর বিমলা দেবী। ঘটনাটি যদি এই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কাছেও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আর তাহার এই স্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়া তাঁহাদের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব হইবে না।...

মুহূর্ত্তকাল মাত্র সোজা হইয়া একবার দাঁড়াইল শ্রীমন্ত, কহিল, "কোনো কিছু জানবার মতো ভগবান যদি সত্যিই কোনোদিন দিন দেন, তবে সবই জানতে পারবে মালতি। আমার সমস্তটুকু পরিচয়ের তবু এইখানেই শেষ নয়; যেটুকু অন্ততঃ জানতে চেষ্টা ক'রেছ, তাই নিয়েই আজকের মতো খুসী থাকো। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে তোমার সত্যিকারের দৃষ্টি খুলে গিয়ে একদিন শান্তি আসবে। 'জোয়ান'কে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতেই ধ'রে রেখো না, চেষ্টা কোরো তাকে জীবনের মধ্যে রূপ দিতে। আমাদের ঘরে ঘরে যেদিন তৈরী হবে

এমনিতরো এক-একটি জোয়ান, সেদিনই প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম সার্থক হবে আমাদের দেশে। মন স্থির ক'রতে চেষ্টা করো বোন, সত্যিই একদিন নিজের পথ নিজে খুঁজে পাবে, শান্তি পাবে জীবনে।"

ধীরে ধীরে সিঁড়ির পথে বাহিরের দুয়ারে সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল শ্রীমন্ত।

মৎস-শিশুদের চঞ্চল ক্রীড়া-কেলিতে আড়িয়াল-খাঁ'র মন্থর বুক তখন বিক্ষিপ্ত বুদ্বুদ-তরঙ্গে স-রব হইয়া উঠিয়াছে।

মালতি কতক্ষণ ধরিয়া যে একই অবস্থায় বসিয়া রহিল, তাহা যেন সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। সত্যিই যেন কেমন লজ্জা করিতে লাগিল এতক্ষণে তাহার। নিজের মধ্যেই বহুক্ষণ ধরিয়া আকাশ-পাতাল কী সব ভাবিল, তারপর 'সঞ্চয়িতা'খানি কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মনে-মনে কবিতাটি আগাগোড়া আর একবার পড়িয়া গেল। কিন্তু কোন অর্থে কী প্রশ্ন যে তুলিয়াছিল সে শ্রীমন্তকে—হঠাৎই যেন সবকিছু তার ভুল করিয়া বসিল নিজের কাছেই। কবি হয়ত কোনো দুর্জ্ঞেয়া নারী-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া একদিন রচনা করিয়াছিলেন এই কবিতাটি! প্রশ্নের মুখে সেটুকু ভুল করিয়া বসিয়াছে মালতি। হয়ত এই বস্তু-বাস্তবতার মধ্যেও বস্তুকে অতিক্রম করিয়া কবিতাটির মূল সুর কোনো দিগন্তপ্রসারী অতীন্দ্রিয় রূপ লইয়াই লেখনীর মুখে ধরা দিয়াছিল সেদিন কবির হাতে; কিন্তু এ-দিনের চিত্ত-বিভ্রমের সঙ্গেও কি তাহার বাস্তবিকই কোনো

মিল নাই, কোনো যোগ নাই! চিত্তের এই তরঙ্গ-প্লাবনের মুখে নব আর নারী যে একই জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো দাঁড়াইয়া আছে, একই প্রশ্ন যে তাহাদের হৃদয়ে!

নির্ব্বাক-মনে একই ভাবে বসিয়া রহিল মালতি। অলক্ষ্যে আর একবার হয়ত গোপন অশ্রুভারে চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল তাহার চোখ দুইটি।

সমস্তটা মাথার ভিতরে কে যেন অনবরত সজোরে হাতুরী দিয়া আঘাত করিতেছে। অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে শ্রীমন্তের। পায়ের নিচে কোথাও-বা কাঁচা সুরকী, কোথাও-বা নরম ঘাস। অভ্যস্ত পথের অন্ধকারে কাছে দূরের বিক্ষিপ্ত গাছ আর ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে ঝিঁঝি ডাকিতেছে, শোঁ শোঁ শব্দে একটা চাপা আর্ত্তনাদ জাগিতেছে ঝাউ আর বাঁশের শিষে। দ্রুত পায়ে আগাইয়া চলিল শ্রীমন্ত। চারিপাশের সমস্ত কিছু শব্দ মিলিয়া রীতিমত যেন ব্যঙ্গ করিতেছে তাহার এই পরাজিত সত্তাকে।

নিভৃত অন্ধকার-পথেই একবার সশব্দে উচ্চারণ করিয়া উঠিল শ্রীমন্ত ঃ

'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥...'

সহসা পাশ কাটাইয়া কাহাকে যেন চলিয়া যাইতে দেখা গেল।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

লোকটি থামিল না, কহিল, "আমি বিশ্বাস-বাড়ীর বৈকুণ্ঠ, নৌকো-ঘাট থেকে, ঘরে ফিরচি।"

তবু ভালো যে, পুলিশের চর নয়, কে একজন মাত্র বৈকুণ্ঠ।

আরও খানিকটা দ্রুতপায়ে আসিয়া একসময়ে ঘরে ঢুকিল শ্রীমন্ত। কিন্তু আজ আর ঘরের ভগ্ন আভিজাত্য বলিয়াও কিছু একটা রহিল না এখানে। অনবরত সে একটা তপ্ত নিঃশ্বাস বোধ করিতেছে এখানে বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর। কুলিদের লইয়া আবার যদি কিছু একটা কথা ওঠে তাহার সঙ্গে, তবে যে এক-তিলার্দ্ধ কালও আর এখানে থাকা সম্ভব হইবে না, ইহা নিশ্চিত। ধিক বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীকে! রাশি রাশি জঞ্জালের মতো নিজেকে দিয়া সমাজের কেবল স্তূপই বাড়াইতেছে, বাবুয়ানীর অভিজাত্যে এখনও বৈষম্যের বেড়া আঁটিয়া স্ফীত গর্ব্বে সমাজের বুকে মাথা উঁচু রাখিতে পারিয়াছে সে। হায় অন্ধ মদগর্ব্বী মানুষ!

ঘুমাইতে চেষ্টা করিল একবার শ্রীমন্ত। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দুই চোখে এতটুকুও তাহার ঘুম আসিল না। রাশিকৃত চিন্তার চাপে ব্রহ্মতালুটা যেন রীতিমত বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে, ঠকাঠক্ হাতুরী পড়িতেছে মাথার এপাশে ওপাশে।—সত্যিই আর থাকা চলে না, এক টিমুহূর্ত্তও আর থাকা চলে না এখানে।

চোরের মতো এই নিভৃত পলাতক জীবনে এতটুকুও শান্তি নাই। এ তো তার পথ নয়, এ যে তার সমস্ত নীতির বাহিরে। ইংরেজের গুপ্তচর চারিপাশে অনবরত ছায়ার মতো ঘুরিতেছে, শ্যেন দৃষ্টিতে অনবরত খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাহাকে পুলিশ। চলুক তাহাদের অবিরাম পরিক্রমা। একদিন এই দুই-হাতে লোহার হাতকড়া পড়িবে—একথা নিশ্চিত জানিয়াই তো সেই নিভৃত রাত্রির দেড়টায় সেদিন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল শ্রীমন্ত। তবু আরও কয়েকটা দিন ; নিপীড়িত নির্যাতিত বুভুক্ষু জন-মানবকে আর-খানিকটা অমৃতের পথে আগাইয়া নিয়া যাওয়া মাত্র। তাহা হইলেই সে নিশ্চিন্ত। গণ-বিপ্লবের পথে সেদিন যে ঝড় উঠিবে সারা আকাশে, সেই ঝড়ের মুখে ভাঙিয়া পড়িবে এই বনিয়াদি সাম্রাজ্যবাদের শিলাস্তম্ভ, লুইয়া পড়িবে বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর ঐ গর্ব্বিত মাথাটাও। আগষ্ট বিপ্লবের চাইতেও আরও প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব সেদিন। জানোয়ার বলিয়া আজ যাহাদের সে ঘৃণা করে, সেই জানোয়ারেরাই সেদিন দেশের শাসনভার তুলিয়া লইবে নিজেদের হাতে, ভীরু কাঁক্‌ড়ার মতো গর্ত্তের মুখে মুখ বাড়াইয়া তাহাদিগকে সেদিন শ্রদ্ধায় নমস্কার করিয়াও কুল পাইবে না এই বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর মতো মানুষেরাই। তাহার যতটুকু সাহচর্য্য আর অনুগ্রহে সার্থকতার ডালি ভরিয়া নিতে পারিয়াছে সে এখানে—সেটুকুর জন্যে পূর্ণ প্রাণেই কৃতজ্ঞতা রাখিয়া যাইবে শ্রীমন্ত।

কিন্তু তাহার চাইতেও অধিক সমস্যা নিয়া আজ দেখা

দিয়াছে মালতি। যেটুকু সে জানিয়া ফেলিয়াছে, কিছুতেই সে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না নিজের মধ্যে। কোনো একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতেই সে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। আর সেই প্রকাশ শুধু শ্রীমন্তকেই বিপর্য্যস্ত করিবে না, আলোড়িত করিবে নিখিল ব্রহ্মের সংসারকেও। বাতাসেরও কান আছে। সেই কানা-কানির ইঙ্গিত যদি পুলিশের দপ্তর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছায়, তবে নিগ্রহ সহিতে হইবে নিখিল ব্রহ্মকেও। বিপ্লবীর সংস্পর্শে অন্ততঃ সে পুণ্য অর্জ্জন করে নাই তো বটেই! অতএব এজাহার তলব করিতে বিলম্ব হইবে না।

ঘড়িতে কয়টা বাজিল কি জানি!

বাহিরে গাছের শাখায় শাখায় মাঝে মাঝে ঘুমকাতর পাখীগুলি অস্ফুটকণ্ঠে শব্দ করিয়া উঠিতেছে। নিশুতি রাত্রির হিম-আভায় জড়তা আসে শরীরে। তবুও রাত্রির এই প্রশান্ত স্পর্শের আবেশের মধ্যে শ্রীমন্ত রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছে। সত্যিই হয়ত আজ আবার কোন্ এক অজানা জনপদের আকর্ষণ আসিয়াছে তাহার! সমস্ত ঘটনাগুলি মিশিয়া যেন সেই আকর্ষণেরই ইঙ্গিৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রি ক্রমশঃ উষার প্রান্তে আগাইয়া চলিয়াছে। বাহির হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে নিশাচর কী একটা পাখীর সেই অতি পরিচিত স্বর—কুপ্-কুপ্-কুপ্।

অন্ধকারের নিভৃতেই আবার উঠিয়া বসিল শ্রীমন্ত। ইচ্ছা হইল—বাতিটাকে জ্বালিয়া নিয়া সৌদামিনীর উদ্দেশে আবার

কিছু একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে ডায়ারীর পাতায়, কিন্তু তাহাতেও যেন মনের দিক হইতে বড় বেশী সাড়া পাইল না। বিয়াল্লিশের সেই সংগ্রামের পরে একে একে তিন বৎসর তিন মাস অতীত হইয়া গেল। সৌদামিনীর জীবনেও কি কিছু একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে! শ্রীমন্তের প্রতিমুহূর্ত্তে ইচ্ছা হইয়াছে সৌদামিনীর পাশে যাইয়া ঠিক আগেকার দিনগুলির মতই উচ্ছল জীবন লইয়া দাঁড়াইতে। কিন্তু সেই উচ্ছলতা, সেই প্রাণের প্রাচুর্য্য আর অফুরন্ত সময়ের নির্ব্বিরোধ সুযোগ সত্যিই কি আর আসিবে?

ভোরের আলো দেখা দিতেই আর একটুও অপেক্ষা করিল না শ্রীমন্ত। মক্‌বুল আলীর আসিতে-আসিতে হয়ত অনেকখানি বেলা বাড়িয়া যাইবে! ত্রস্তে উঠিয়া মুখে চোখে কোনোরকমে বার কয়েক জল ছিটাইয়া বাহির হইয়া পড়িল সে চাষী পাড়ার উদ্দেশেই। মোরগ-ছানাগুলি তখনও গৃহবাসীর ঘুমভাঙানীয়া সুরে ইতস্ততঃ ডাকিতেছে। সকালের ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শির্‌শির্ করিয়া ওঠে শরীর। মফঃস্বল বাংলায় শীতের স্পর্শ নামিতে সুরু করিয়াছে কেবল।

ঘুম হইতে মক্‌বুল আলীও উঠিয়া পড়িয়াছিল সকালসকালই। আসিয়া ডাকিতেই শ্রীমন্তের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হইয়া গেল। কহিল, "তুমি যাবার আগেই আমি এসে প'ড়লাম মক্‌বুল ভাই। বিশেষ প্রয়োজনেই এলাম তোমার কাছে।"

কতকটা আশ্চর্য্য হইয়াই গেল্ল বটে মক্‌বুল আলী। শ্রীমন্তের চোখের দিকে তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "সে আবার কি কথা রায় বাবু, আমার মতো মান্‌ষির কাছে আপনার আবার প্রয়োজন থাক্‌তি পারে কি ?"

"আছে, আছে, আজ তোমার কাছেই সর্ব্বপ্রথম আমার প্রয়োজন মক্‌বুল ভাই।" থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "যে কথা কাল ব'লবো ব'লে ব'লেছিলাম, তা আর বরং নাই শুনলে। সম্প্রতি আমাকে এখান থেকে যেতে হ'চ্ছে।—"

"সে কি রায় বাবু, আপনাকে যেতি দিচ্ছে কে ?" মক্‌বুল আলী কহিল, "আপনাকে যে একদিনও না দেখ্‌তি পেলে ভাল ঠেক্‌বে না রায় বাবু !"

"তা জানি মক্‌বুল ভাই। তোমাদের স্নেহ, তোমাদের ভালোবাসা—তার যে সত্যিই তুলনা নেই। তোমাদের এ ঋণ জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ ক'রতে পারবো না।" গলার স্বর খানিকটা ভারী হইয়া আসিল শ্রীমন্তের। কহিল, "তবু আজ আমাকে একরকম হঠাৎই যেতে হ'চ্ছে। শীগ্‌গির যে আর ফিরতে পারবো, তা মনে হয় না। পথে পথে আমাদের কাজ, এক যায়গায় এঁটে থাক্‌লেও যে চলে না ! এদিকের সব ভার রইল তোমার ওপর। আমি জানি, তোমার শক্তি আর কর্ত্তব্য-বোধের কাছে কিছুই প'ড়ে থাক্‌বে না। দেশময় আজ নানা গোলযোগ ; চাল নেই, কাপড় নেই, রোগে অনাহারে অনবরত ভূগে ভূগে

ম'রছে আমাদের সমাজ। চোখের সাম্‌নেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছ' সব। ইংরেজ এম্‌নি ক'রেই আমাদের মেরে মেরে মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। এই অন্যায়কে আমাদের দেশ গত পৌনে দু'শো বছর ধ'রে কেবল ক্ষমা ক'রে ক'রেই এসেছে। কিন্তু কালের পরির্ত্তন এসেছে আজ। আজ আমাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ব'লে কিছু নেই; এক-জাতি এক-প্রাণ আমরা, আমরা সৈনিক। এ কথা যেন ভুলে যেয়ো না মক্‌বুল ভাই! আমাদের ক্ষুধার খাদ্য চাই, পরণে বস্ত্র চাই, রোগের অষুধ আর পথ্য চাই, বাঁচ্‌তে চাই আমরা মানুষের মতো। এর জন্যে যে-কোনো সংগ্রামকেই আমরা বরণ ক'রে নেবো।—এই পণ ক'রে কাজ ক'রে যেয়ো। হাতে যতক্ষণ লাঙলের ফলা আর সাবল আছে, ভয় কি ততক্ষণ পথের বাধাকে!"

নিষ্পলক-দৃষ্টিতে মক্‌বুল আলী চাহিয়া রহিল শ্রীমন্তের মুখের পানে। এতটুকুও প্রশ্ন তুলিবার মতো আজ আর তাহার কিছু নাই।

থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "পার তো মজ্ঞীদের স্ত্রীকে মাঝে-মধ্যে গিয়ে দেখে এস'। তাকে অর্থসাহায্যের প্রশ্ন আর নতুন ক'রে কিছু ব'ল্‌বার নেই। যদি সুযোগ পাই, তবে তোমাকে খবর দেবো।"

অভিভূত কণ্ঠে সামান্য স্বর তুলিতে চেষ্টা করিল এবারে মক্‌বুল আলী। কহিল, "সত্যিই তবে যাচ্ছেন রায় বাবু! কত সময় কত বেয়াদবী কত অপরাধ ক'রেছি, সব যেন তার

মাপ ক'রবেন। নইলে যে সে-পাপের আর প্রাচিত্তির হবে না!"

সস্নেহে দুই বাহুতে শ্রীমন্ত জড়াইয়া ধরিল মক্‌বুল আলীকে; বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, একথা ব'লে যে আমাকে ব্যথা দিলে মক্‌বুল ভাই! অপরাধ ক'রবে তুমি? ছিঃ, একথা কখনো মনেও ঠাঁই দিয়ো না।"

পাশেই সম্ভবতঃ একটা খাসী-মোরগ গ্রীবা দোলাইয়া আহার্য্যের সন্ধান করিতে করিতে চকিতে একবার ডাকিয়া উঠিল: কক্করক্ ক্কক্ ক্কক্—।

স্বল্পকাল থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "বেলা ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌ছে, আর দেরী ক'রলে হয়ত শেষে গিয়ে লঞ্চ্ ধ'রতে পারবো না। ব্যাঙ্কের কারুর সাথেই বড় একটা দেখা ক'রে যাওয়া সম্ভব হ'লো না। আমার হ'য়ে তুমিই বরং একবার দেখা কোরো নিখিল বাবুর সাথে। বোলো, অত্যন্ত বেশী প্রয়োজনেই যেতে বাধ্য হ'চ্ছি, আমার অভাবে কাজের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধেই হবে না তাঁর। পারেন তো, আমার প্রণামটুকু যেন তিনি পৌঁছে দেন তাঁর মাকে। আর—"

মালতির কথাটাও কি এই প্রসঙ্গে কিছু একটা উল্লেখ করা প্রয়োজন! একবার চিন্তা করিয়া দেখিল শ্রীমন্ত।

মক্‌বুল আলী প্রশ্ন করিল, "আর কাউকে কিছু—?"

"না—।" নিশ্চিন্ত মনে এবারে কথা শেষ করিল শ্রীমন্ত: "তবে—দেখা হ'লে সিন্ধুরামের হাতে কিছু বক্‌শিস্ দিয়ে

যেতাম। তা না হয় তুমিই বরং তাকে পৌঁছে দিও।" বলিয়া বুক পকেটে একবার হাত দিল শ্রীমন্ত। বাহির হইয়া আসিল ছুইখানি নোট: একখানি দশটাকার, আর একখানি ছুই টাকার। উচিৎ ছিল আরও কিছু বেশী থাকা; কিন্তু তাহা লইয়া বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিল না শ্রীমন্ত। কহিল, "এই নাও, যাবার সময় আমার এই সামান্য দান যেন তুমি ঠেলে ফেলো না মক্‌বুল ভাই! বড় নোটখানি তোমার নিজের, আর এই ছোটখানি পার তো পৌঁছে দিও সিন্ধুরামকে।"

মক্‌বুল আলীর মাথা যেন এবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল। নিজের ভাগের নোটখানি লইয়া একবার আপত্তি তুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

"আসি তবে মক্‌বুল ভাই।" সহসা মক্‌বুল আলীর কাঁধের উপরে নিজের দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল শ্রীমন্ত, তারপর ধীরে ধীরে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

ওপাশে অস্পষ্ট সুরে আর একবার শব্দ হইল: কক্করক্ ক্কক্ ক্কক্—।

মক্‌বুল আলীর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে কেমন যেন একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্জ্জীব ধারা নামিয়া আসিয়াছিল। অপলক দৃষ্টিতে সে তেম্‌নি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।...

সংবাদটা যথাসময়েই নিখিল ব্রহ্মের কানে আসিয়া পৌঁছিল, পৌঁছিল বিমলা দেবী আর মালতির কাছেও। নিথর নিস্তব্ধের মতো বহুক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ মনে বসিয়া রহিল

নিখিল ব্রহ্ম। মক্‌বুল আলী তাহাকে কিছু খুলিয়া বলিতে পারে নাই। শ্রীমন্তের পরিত্যক্ত ঘরখানির কাছে আসিয়া একবার ঘুরিয়া গেল সে; দেখিল—সারা ঘরে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে একখণ্ড পোড়া মোম, কতকগুলি পুরানো কাগজপত্র, এমন কি চায়ের ছোট্ট কেত্‌লী আর ষ্টোভটিও। কোনোটিই সঙ্গে যায় নাই শ্রীমন্তের।

ঘরে ফিরিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "এ সম্বন্ধে তুই কিছু জানিস্ মালতি, কাল তোকে পড়িয়ে যাবার সময় কোনো কিছু ইঙ্গিত ক'রে গেছেন শ্রীমন্ত বাবু?"

উত্তর দিতে গিয়া স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল মালতির, জল আসিল একবার দুই চোখ ছাপাইয়া। অতিকষ্টে সেটুকুকে সম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে শুধু সে কহিল, "কৈ, যাবার কথা তো কিছু বলেন নি! সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌বার আগে এই ব'লে শুধু বিদায় নিলেন—আমি যেন জোয়ান অব আর্কের মতই একদিন বিপুল শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।"

বিমলা দেবী পাশেই ছিলেন; একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে একসময় নীরবে অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

মালতির কথার উত্তরে নিখিল ব্রহ্মের কণ্ঠে শুধু একটা চাপা শব্দ হইল মাত্রঃ "হুঁ!" আর একটি কথাও তাঁহার মুখে আসিল না। আগাগোড়া শ্রীমন্তের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে সে, কিন্তু এত পরিচিতির মধ্যেও কোথায় যেন একেবারেই আলাদা সত্তায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ শ্রীমন্ত, তাহার

আসল রূপকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই নিখিল ব্রহ্ম। প্রথম দিকের আলোচনাটা এই সূত্রে একবার তাহার মনে পড়িল। শ্রীমন্ত বলিয়াছিল : 'ইংরেজের এই জড় সভ্যতা মানুষকে দেখাতে শিখিয়েছে বাইরের থেকে, অন্দরমহল সেখানে একেবারে ঢাকা। কবাট একবার খুলে দিলে কি শেষটায় আর ঘরে স্থান দেবেন ?" কিন্তু কবাটও খোলা ছিল, শ্রীমন্তও আসিয়া কখন্ অলক্ষ্যেই, ঘর তো দূরের কথা, সমস্তটা সংসারেরই নিভৃত মনে পাকা আসন পাতিয়া বসিল। কিন্তু কৈ, তবু তো তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া হইল না, আবিষ্কার করা গেল না তাহাকে কোনোভাবেই! ভাবিল, কলিকাতায় মিঃ ঘোষকে এ-সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া জানাইলে কেমন হয়! কিন্তু কি লিখিবে, তাহাও কিছু একটা সহসা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না নিখিল ব্রহ্ম। গতকল্যকার অনাবিল ঘটনাবলীর পর আজ্‌কের এই এতটুকু সামান্য মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন যেন একটা অচিন্ত্যনীয় বিশ্রী বিপর্য্যয়ে মনের সমস্তটুকু সুর কাটিয়া গেল। আর ভাবিতে পারিল না নিখিল ব্রহ্ম। প্যাকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া দিয়াশলাইয়ের উপরে বার কয়েক ঠুকিয়া নিলো, তারপর নিজের মনেই একবার বলিয়া উঠিল : 'How miracle, what a mystry···!'

কি ভাবিয়া মালতির বুকখানি যেন একবার ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিলে দাদার কাছে সে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবে, তাই ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া

সেও একসময় বাড়ান্দায় তাহার সেই নিভৃত কক্ষটিতেই আসিয়া নীরবে বসিয়া পড়িল। মনে হইল, পথ চলার এই অবিরাম গতিকে মনে মনে পোষণ করিয়াই হয়ত তবে শ্রীমন্তদা কাল তাহাকে কাব্যের অনির্ব্বচনীয় দ্বৈত ধারা বুঝাইবার ফাঁকে ঐ 'বিলম্বিত' কবিতাটিই বাছিয়া নিয়াছিলেন :

'অনেক হোলো দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।...'

কিন্তু সেই দীর্ঘ পথের অন্ত তাঁহার কোথায়, কোন্ কুলে যাইয়া তাঁহার এই উধাও যাত্রার তরী ভিড়িবে? সেখানে যেন অন্ততঃ কোনো পুলিশ না থাকে, না থাকে কোনো ইংরেজের গুপ্ত অনুচর!

একরকম অন্যমনস্কভাবেই 'সঞ্চয়িতা'খানির মধ্যে মুখ ঠাসিয়া নিশ্চল পাথরের মতো পড়িয়া রহিল মালতি।

* * *

লঞ্চ ততক্ষণে বাতাসের মুখে অবিরাম গতিতে আড়িয়াল-খাঁ'র কালো জলে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। ঢেউ উঠিয়াছে শ্রীমন্তের মনেও। এবারে আর এইদিকে নয়। মহানগরীর পিচ-ঢালা পথে-পথে কিছুদিন পরিক্রমা করিয়া আসিলে মন্দ কি! গত দুর্ভিক্ষে মহানগরীর রূপ দেখার সুযোগ ছিল না তাহার জীবনে, কিন্তু দেখা অর্থে রূপ আজকেই বা কিছু একটা কম কি? কাগজে-পত্রে ইউনাইটেড্ প্রেসের সংবাদ প্রকাশিত

হইতেছে দিনের পর দিন ঃ বাংলায় আসিতেছেন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফুর খাঁ এবং আরও অনেকে। কলিকাতার রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিবে তাঁহাদের জয়ধ্বনিতে। একটা অপূর্ব্ব সুযোগ বৈ কি! নিঃস্বার্থে যাঁরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন দেশের জন্য, তাঁদের দর্শনলাভ যে একরকম তীর্থলাভই শ্রীমন্তের জীবনে! আর ঐ সর্ব্বত্যাগী মহাত্মাজী; চেতনা দিলেন যিনি নব্যভারতকে, আগষ্ট-বিপ্লবের মন্ত্রগুরু সেই মহাত্মা গান্ধীর পদধূলিস্পর্শে যে তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত সত্তা পরম পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে! সময়ের সমুদ্র বহিয়া চলিয়াছে, বাকী কয়টি দিন মাত্র এই নভেম্বরের, আর সামনে মাত্র ডিসেম্বরের একত্রিশটি শীতার্ত্ত প্রহর, তারপরেই আসিবে এই প্রতিদিনের বহু-প্রতীক্ষিত জানুয়ারী, সুন্দর পৌষের রৌদ্র-ঝলসিত প্রভাত। পথে পথে ভিড়, লোকে লোকারণ্য সেদিন হাওড়ার পুলে আর ষ্টেশন ঘরে।...

শীতের আড়িয়াল-খাঁ, অনুদ্বেল মসৃণ তার গতি। জল কাটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে লঞ্চ। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে প্রভাতের তরুণ সূর্য্য। ভাসিয়া চলিয়াছে জলের বুদ্বুদ আর ফেনাগুলি। তার চাইতে আরও দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে শ্রীমন্তের মন। পিছনে স্মৃতির মতো পড়িয়া রহিল চরমুগরিয়া। লঞ্চের দ্রুত গতির সাথে ক্রমশঃ সাম্‌নের দিগন্ত পথে আগাইয়া চলিল শ্রীমন্ত।

সদরে আসিয়া ট্রেণ ধরিবার কথা, কিন্তু মন সরিল না সে-পথে। ট্রেণের ঐ পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে বারোখাদা ছাড়াইয়া নাক-বরাবর। এই তিন বৎসরে নিশ্চয়ই কাহারও দৃষ্টির এমন একটা পরিবর্ত্তন হয় নাই যে, শ্রীমন্তের এই শ্মশ্রু-গুম্ফাবৃত পরিবর্ত্তিত রূপের মধ্যেও তাহাকে কিছু একটা চিনিয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে। ঘুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাই খুলনার পথে কলিকাতার রাস্তা ধরিল শ্রীমন্ত। দেবদারু, বট আর পিঠেপোড়ার কোলাকুলি পথে পথে। কোথাও বা জঙ্লা গাছের সবুজ ভিড়, কোথাও বা ঢালু মাঠের একাংশে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের পাশে লাউ আর ঝিঙের মাচা, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ পানের বরোজ। মাঝ দিয়া পথ গিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া। এম্নিতরই তো সবুজের সমারোহ বাংলার গ্রামে, পথে, মৌজায়, বন্দরে আর জনপদে। এখনও নাগরিক দুষ্ট-বিজ্ঞানের আক্রমণ আসে নাই এ-সব পথে, নইলে কবে না-জানি এই স্বাভাবিক সবুজের প্রাণ-হিল্লোলটুকুও নির্ব্বিবাদে মুছিয়া যাইত যান্ত্রিক চাপে।

ধীরে ধীরে চোখের উপর দিয়া কাটিয়া গেল এক একটি ষ্টেশন। গাড়ি আসিয়া থামিল শিয়ালদায়। মিঃ ঘোষের সেই শ্বেতশুভ্র আইভরী কার্ডখানি হারায় নাই শ্রীমন্তঃ ৫, বলদেব সিংহ লেন। খুঁজিয়া না পাইলে ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং সার্ভিস্ তো আছে বটেই। ক্যানিং ষ্ট্রীটের রাস্তায়

ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড নামাঙ্কিত ফলকটি আবিষ্কার করিয়া লওয়া এমন কিছু কঠিন হইবে না।

প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া পা বাড়াইল শ্রীমন্ত।

"কাগজঃ আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, আজাদ—।" হকারদের মুখে মুখে প্রভাত-ফেরীর সাড়া।

সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল শ্রীমন্ত। গত সম্পূর্ণ দিনটা কাগজের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখিতে পারে নাই সে পথের অসুবিধায়। একটা বাংলা কাগজ কিনিয়া নিয়া খানিকটা নিভৃতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ দৃষ্টি বুলাইয়া নিতেই সমস্তখানি চেতনার মধ্যে তার যেন কেমন একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। সংবাদটি সামান্য, অথচ অভূতপূর্ব। আদৌ প্রস্তুত ছিল না এজন্য শ্রীমন্ত। চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বারবার স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়িয়া লইল শ্রীমন্তঃ

> 'বারোখাদার আগষ্ট-বিপ্লবের ফেরারী আসামী শ্রীযুক্ত মথুর দত্তের উপর উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে যে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছিল, অদ্য একটি প্রেসনোটে বাংলা-সরকার তাহা তুলিয়া লইয়াছেন। ২০শে নভেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত দত্তকে পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে চলিবার অধিকার দেওয়া হইল। ভারতরক্ষা আইনের কোনো ধারাই বর্ত্তমানে আর তাঁহার উপর বহাল রহিল না।'—(এ. পি, ইউ. পি)

মাঝখানে একটা দিন শুধু পথ-চলার অবিরাম গতিতে কাটিয়া গিয়াছে। বিশে নভেম্বর চলিয়াছে আজ ঐ হকারদেরই একটানা প্রভাত-ফেরীকে বহন করিয়া। পূরা তিন বৎসর তিন মাস পরে আজ সে মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত। জনাবণ্য-কলিকাতা, যাত্রীর ভিড় ষ্টেশনে, তাহারই একপাশে নিভৃতে দাঁড়াইয়া একবার হো হো করিয়া হাসিরা উঠিল শ্রীমন্ত। যে ইংরেজ-রাজত্বে সূর্য্য অস্ত যায় না, সেই ইংরেজের একটি গুপ্তচরও এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহাদের আসামী মথুর দত্তকে ধরিতে পারিল না ; অথচ হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয় নাকি তাদের এক সি-আই-ডি বিভাগেই ঃ বিচিত্র বহুরূপী সি-আই-ডি তারা। অন্যদিকে তাদেরই চোখের সামনে একটি পয়সার অভাবে কত মুমূর্ষু নর-নারী কুকুরের মতো ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে পথে প্রান্তরে !

আর একবার হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—। মুক্তির স্বস্তির সাথে একটা কঠিন বিপ্লবী বিদ্রূপের সুর।

হঠাৎ ঠিক কানেব পাশেই পিছনে একটা আকস্মিক শব্দ হইল ঃ "হাস্‌চেন তো মশাই কাগজখানা একটু খুলে ধ'রেই হাসুন না ! নেতাজীর সম্বন্ধে কার একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট্ দেখ্‌লাম যেন ! একটু খুলেই ধরুন না ঐ পৃষ্ঠাটা।"

আধাবয়সী লম্বাধরণের ছিপ্‌ছিপে একটি লোক, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, কখন্ আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া যে পিছন

হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সংবাদগুলি লক্ষ্য করিতেছিল, শ্রীমন্ত তাহা আদৌ টের পায় নাই।

হঠাৎ যেন স্রোতের মুখে বাধা পাইল সমুদ্র।

"এঁ্যা—।" নিজের মধ্যে যেন খানিকটা সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল এতক্ষণে শ্রীমন্তের। পাশ ফিরিয়া এবারে সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল একবার লোকটিকে।

কিন্তু লোকটি আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না। সংবাদটির উপর ত্রস্তে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এপাশে ট্যাক্সির ভঁ্যাপু, ওপাশে রিক্সার টুং-টাং আওয়াজ. সাম্‌নেই সার্কুলার রোডে সরিসৃপের মতো মসৃন গতিতে চলিয়াছে ট্রাম, চলিয়াছে অতিকায় মিলিটারি লরী আর দেশী বাস। প্রভাতের কলমুখর কলিকাতা, তরঙ্গমুখর মহানগরী। বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে মানুষের জীবন-স্রোত। আরও তো অনেক বারই আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে সে কলিকাতায়! কিন্তু এই মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যেই শ্রীমন্তের মনে হইল—আজ আর কোথাও এতটুকু সরল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নাই; যে জীবন ছিল উনিশ শ' উনচল্লিশ সালেও, আজ সেই জীবন-প্রবাহ কোথায় কোন্ অন্ধকার পঙ্ক-গুহায় অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! চারিদিকে শুধু যান্ত্রিক-গতি। মরিয়া গিয়াছে সেই সঙ্গীতমুখর আলোময় কলিকাতা।

আবার সাম্‌নের পথে পা বাড়াইল শ্রীমন্ত। এই মুহূর্ত্তে

যদি কোনো ট্রেণ থাকিত, তবে আর এতটুকুও কালক্ষেপ না করিয়া ছুটিয়া পড়িত সে তার আজন্মের চিরস্বপ্নের বারোখাদায়। বিজয়ী বীরের মতো আর-একবার 'চ্যালেঞ্জ' দিবার অবকাশ আসিয়াছে কৈলাশ চক্রবর্ত্তীকে। সাথে সাথে কৈলাশ চক্রবর্ত্তীর কদাকার স্থূল মূর্ত্তিটি একবার মানস-দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল শ্রীমন্তের। ভাবিল—এতদিনে আদৌ কি বারোখাদায় অস্তিত্ব আছে তার, আজও কি লোকের অভাবে কাউণ্টারে দাঁড়াইয়া টিকিট দেয় কৈলাশ চক্রবর্ত্তী নিজে?

ট্রেণ সেই রাত্রি নয়টায়। স্থির করিল শ্রীমন্ত, আজই সে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবে সৌদামিনীকে। ঠাকুরমার কথাটাও এই ফাঁকে বড় গভীর হইয়াই মনে পড়িল তার। বুড়ীকে সে মন হইতে প্রায় মুছিয়াই ফেলিয়াছে! দুঃখ ছিল না তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে; এই বিশ্বাস তার ছিল যে, সৌদামিনী থাকিতে কোনো বিপদই তাঁহার গায়ে আসিয়া লাগিবে না। কিন্তু মন? মনের আঘাতটাই কি ঠাকুরমা হাসিমুখে সহ্য করিয়া নিতে পারিয়াছেন! অন্ধের যষ্টি ছিল যে তাঁর একমাত্র শ্রীমন্তই।

লোকের ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে রাস্তায় ফুটপাতে। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-পথে সে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল শ্রীমন্ত। হঠাৎ চোখে পড়িল: একদল অল্পবয়স্ক ছেলে নিশান হাতে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে বিপুল শব্দে। কণ্ঠে কণ্ঠে

তাদের দীপ্ত ধ্বনি : 'জয় হিন্দ্, ইনক্লাব—জিন্দাবাদ, আই-এন-এ বন্দীদের মুক্তি চাই, নেতাজী কি জয়।'

এতক্ষণে আবার যেন কিছুটা প্রাণের স্পর্শ পাইল শ্রীমন্ত। এই দাবীই আজ দেশের বিশেষ দাবী। নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে সুদূর প্রতীচ্য-প্রান্তরে শৃঙ্খলিত ভারতের মুক্তির জন্য যারা জীবন পণ করিয়া নামিয়াছিল যুদ্ধে, এই দাবী যে ইংরেজের হাতে বন্দী-হওয়া সেই ভারতীয় সৈনিকদেরই মুক্তির দাবী।

ক্রমে কাছে আগাইয়া আসিল শোভাযাত্রাটি। আবার ধ্বনি জাগিল : 'জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম, ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ।...'

মিশিয়া গেল শ্রীমন্ত তাহাদেরই মধ্যে। কারা এই শোভাযাত্রী, জানিবার প্রয়োজন নাই তার। তাহারই সতীর্থ এরা। এই তো সবচাইতে বড় পরিচয়! মনে প্রাণে সবাই তারা খাঁটি বাঙালী, খাঁটি ভারতবাসী। একই পথের যাত্রী তারা—যে পথ চলিয়া গিয়াছে কলিকাতার এই প্রাদেশিক রাজপথকে ছাড়াইয়া দিল্লীর লালকেল্লা পর্য্যন্ত। সিংহদ্বারের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলিয়াছে সেখানে তাহাদেরই মতো জনতা : 'মুক্তি চাই. চাই অধিকার, এই মুহূর্ত্তে খালাস চাই সব বন্দীদের।'

ক্ষুধায় পেট চন্-চন্ করিতেছিল। একসময় সাম্‌নের কি একটা পাইস-হোটেল হইতে কিছু খাইয়া লইল শ্রীমন্ত।

শোভাযাত্রা তখন প্রায় একরকম ছত্রভঙ্গ হইয়াই গিয়াছে; এপাশে ওপাশে অনবরত ছুটিয়া চলিয়াছে মিলিটারী লরী আর জিপ্-গাড়ী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় কাঠের বোর্ডে লাল ত্রিভুজ আঁকা, নিচে লেখা—'Look out, then go.' কোথাও বা বাংলায় লেখা—'দেখে শুনে পথ চলুন'। এবারও বড় কম হাসি পাইল না শ্রীমন্তের। এই দেশেরই মানুষের বুকের রক্তে তৈরী এই পথ, ঘরের প্রত্যেকটি সাজানো জিনিষের মতো প্রত্যেকের টানা মুখস্থ এই পথের দিশা; কোথাও কি একতিলও ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে? এখানে দেখিয়া শুনিয়া পথ চলিবার প্রয়োজন সাম্রাজ্যলোভী সওদাগর ইংরেজকেই। নইলে তাদের পরিত্রাণ নাই, ফল বিক্রীর ব্যবসাটা অতর্কিতে কখন্ পথের ধূলায় মাটি হইয়া যাইবে। সূর্য্যাস্তের দিনও যে তাদের খুব বেশী দূরে নয়! আর কেন তবে এই লরী আর এই জিপের মোহ! কেন আর এই রাজপথে তবে রক্তের পিপাসা?

অধিক বেলায় আসিয়া ক্যানিং ষ্ট্রীটে পৌঁছিল শ্রীমন্ত। দুইদিনের মধ্যে স্নান নাই, রুক্ষ চুলে ধূলা জমিয়া জট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। জামা-কাপড়ের অবস্থাও সেইরূপ। ট্রেণের কয়লার ধোঁয়া আর পথের ধূলায় মিলিয়া একটা অদ্ভুত রংয়ের প্রলেপ আঁকিয়া দিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে। ঘামে আর রোদের তাপে অনবরত চিট্‌মিট্ করিতেছে দাড়িগুলি। অন্ততঃ সৌদামিনীর কাছে যাইয়া দাঁড়াইবার আগে এইগুলিকে রীতিমত উৎপাটন করিয়া

ফেলিতে হইবে। আর থাকিলেই বা মন্দ কি! দেখিয়া দেখিয়া সৌদামিনী আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, বলিবে, "একেবারে উৎকল-দেশীয় পাকা সন্ন্যেসী ব'নে গেছ দেখ্‌ চি।" মন্দ কাটিবে না অন্ততঃ এই নিয়া সৌদামিনীর সঙ্গে।

ব্যাঙ্ক বহু পূর্ব্বেই খুলিয়াছিল। চিনিয়া আসিতে ভুল হয় নাই শ্রীমন্তের। প্রকাণ্ড ফলকে রৌদ্র-তাপে নামটা দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে ঃ দি ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং সার্ভিস।

কোনো অবস্থার মধ্যেই ঘোষবাবুর সাম্‌নে যাইয়া দাঁড়াইতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নাই। সকলের থাকে না, কিন্তু এই মাটির সঙ্গে যে তাঁহার একেবারে মর্ম্মের যোগ রহিয়াছে! সত্যিই 'ডিভাইন' ঘোষ বাবু।

এখানে সিন্ধুরাম নাই, আছে বনমালী। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কেবিন দেখাইয়া দিল সে-ই।

প্রথম দৃষ্টিতেই মিঃ ঘোষ উল্লাসে একরকম চীৎকার করিয়াই উঠিলেন, "আরেঃ, শ্রীমন্ত বাবু, আপনি? এরই মধ্যে এবং এত তাড়াতাড়িই আপনাকে আবার পেয়ে গেলাম! কিন্তু কি ব্যাপার, বলুন দিকি নি? চরমুগরিয়া থেকে মিঃ ব্রহ্মের হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পেলাম কাল রাত্রে; বলা হ'য়েছে—আপনি নাকি সেখান থেকে একেবারে নিরুদ্দিষ্ট? কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট কি মশাই, আপনি তো একেবারে সশরীরে সুস্পষ্ট এখানে; চরমুগরিয়ায় না হোক্ ক'লকাতায় তো বটেই!"

কথা শুনিয়া মৃদু হাসিল শ্রীমন্ত। ক্লান্তিতে অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হইতেছিল এতক্ষণ। মাথার উপরে পাখা চলিতেছিল; সাম্‌নের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ হাওয়া খাইয়া নিলো শ্রীমন্ত। তারপর কাগজের সেই বিশেষ সংবাদটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "খবর পাঠানো মিঃ ব্রহ্মের পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। আগে এই সংবাদটি পড়ুন, ততক্ষণ বরং একটু জিরিয়ে নেই, তারপর ব'ল্‌ছি সব ঘটনা।"

দ্বিধা করিলেন না মিঃ ঘোষ। সংবাদটির উপর দিয়া সতর্ক-দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিলেন, "মনে প'ড়ছে বটে, বিয়াল্লিশ সালেই এর প্রাথমিক ঘটনা পেয়েছিলাম কাগজে; আফ্‌টার অল্ ইট্ ইজ্ এ ভেরী থ্রিলিং ম্যাটার। নেতাজীর দৃষ্টান্ত এটা।" তারপর স্বল্প থামিয়া কহিলেন, "এই ধরণের ঘটনাগুলোই যে কাগজের পৃষ্ঠায় আপনার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে, তাতে বিচিত্র কি! আপনার মতো জাগ্রত স্বদেশী মনের যে তুলনা নেই শ্রীমন্ত বাবু। তা—সে যাই হোক্, চেনেন নাকি এই মথুর দত্তকে?"

এবারে পূর্ব্বের মতই আবার বিচিত্র শব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কেবিনে এই ধরণের হাসি এই প্রথম। কেবিনের বাহিরে ক্লার্ক, কেসিয়ার একাউন্টেণ্ট্ প্রভৃতি একবার সচকিত দৃষ্টিতে কান পাতিল সেই দিকে। তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ শ্রীমন্ত। কেবিনে প্রবেশের সময় লক্ষ্যে পড়িলে একবার ভাল করিয়া

দেখিয়া লইত তাহাকে সকলে। হাসির শব্দটি সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই কৌতূহলও বড় কম জাগিল না তাহাদের মধ্যে।

শ্রীমন্ত কহিল, "চিনি বৈ কি, আর চিনি ব'লেই তো এমন অতর্কিতে এসে আপনাকে এম্‌নি একটি মরমী সংবাদ উপহার দেবার সুযোগ পেলাম। ধৃষ্টতা মাপ ক'রবেন ঘোষ বাবু—" থামিয়া বলিল, "যদি বিশ্বাস করেন, তবে নিঃসঙ্কোচে ব'ল্‌তে পারি—মথুর দত্ত এই শ্রীমন্ত নিজে। সঙ্কোচের কোনো হেতু নেই, কারণ রাজপুরুষেরা তাঁদের বিপ্লবী ফেরারীকে অত্যন্ত কঠিন চেষ্টায় অনুগ্রহ ক'রেছেন আজ।"

আবার সেই উচ্চশব্দে বিচিত্র হাসি। সম্ভবতঃ এদিকে কি একটা যোগফল নামাইতে যাইয়া গণনায় ভুল করিয়া বসিল একটি কাঁচা বয়সের অপটু কেরাণী।

সারা মুখ-চোখের উপর দিয়া মুহূর্ত্তে যেন কেমন একটা অদ্ভুত রঙ খেলিয়া গেল মিঃ ঘোষের। অবাকবিস্ময়ে তিনিও আবার একরকম চীৎকার করিয়া উঠিলেন ঃ 'এ্যাঁ—, মথুর দত্ত আপনি নিজে? আপনিই মথুর দত্ত? বলেন কি শ্রীমন্ত বাবু? এখনও ব'সে আছেন, উঠুন, আলিঙ্গন কবি।"

উঠিয়া একরকম বাধ্য হইয়াই মিঃ ঘোষকে আলিঙ্গন করিতে হইল শ্রীমন্তের। তারপর আবার আসিয়া যথাস্থানে বসিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ ঘোষ আর কিছু একটা বলিতে পারিলেন না। যেমন করিয়া চরমুগরিয়ার ব্রাঞ্চ আপিসে

বসিয়া প্রথম কথার সূত্রেই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন সেদিন, তেম্‌নি অবাক-বিস্ময়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "এই জন্যেই সম্ভবতঃ প্রথম দিনের আলাপেই আপনাকে অত বেশী ভাল লেগেছিল। তাই তো বলি, নিজের ত্যাগ না থাক্‌লে কি কখনো দেশ সম্বন্ধে এমন অনুভূতি জাগ্‌তে পারে! ইউ আর সো গ্রেট্‌ এ্যাজ্‌ নট্‌ টু কন্‌সিভ্‌ অব্‌ ইট্‌স্‌ লিমিট।"

"বাড়িয়ে ব'ল্‌বেন না ঘোষ বাবু, তাতে পাপ হবে।" শ্রীমন্ত কহিল, "দেশের মুক্তি-সংগ্রামে আমার শুধু হাতেখড়ি। কোনো নির্য্যাতনই তো আজ পর্য্যন্ত সই নি, কেবল সমুদ্র-দর্শন আমার সুরু: কবে এ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবো, তা বিধাতাই জানেন। আর—যে কাজ ক'রেছি, তাও তো মহাত্মাজী জেল থেকে বেরিয়ে কিছু একটা অনুমোদন করেন নি। তবে এটুকুও জানি যে, সেটা তুচ্ছ বিষয়। প্রস্তুতি এসেছে আজ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে। আমি মনে করি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের খানিকটা নীতি পরিবর্ত্তনের দিন এসেছে আজ। পথ খুলে দেবার দরকার নানা দিকে, নইলে এই পৌনে দু'শো বছরের জগদ্দল পাথর আমাদের বুক থেকে অপসারিত হবার নয়।"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট্‌ পার্টির মতবাদও তাই। নেতাজীও তা-ই চেয়েছিলেন একদিন। কিন্তু সে-কথা না হয় গেল, কিন্তু আমি ভাব্‌চি, মিঃ ব্রহ্ম যে ভাবে 'তার'

ক'রেছেন, তার অর্থ কি? আপনি কি সত্যিই চরমুগরিয়া ত্যাগ ক'রলেন তবে শ্রীমন্ত বাবু?"

এবারও হাসিল শ্রীমন্ত, তারপর একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, "যখন বুঝ্‌লাম, আমাকে দিয়ে ক্ষতি হ'তে পারে মিঃ ব্রহ্মের, এমন কি ঘটনা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লে পুলিশ তাঁকেও মুক্তি দেবে না, ঠিক তখনই গা ঢাকা দিয়ে বন্দর পেরিয়ে এলাম। কিন্তু শিয়ালদায় এসেই সব উল্টে গেল, কাগজ খুলে পেলাম এই এ-পি আর ইউ-পি'র যুক্ত রিপোর্ট।

"তা হ'লে আমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই।" স্মিতহাস্যে মিঃ ঘোষ বলিলেন, "মিঃ ব্রহ্মকে তবে লিখে দেই, আসলে আপনি নিখোঁজ ন'ন্, আবার সশরীরে ফিরে যাচ্ছেন সেখানে।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর কহিল, "লিখে অবিশ্যি আপনি দেবেন নিশ্চয়ই, তবে কিছু একটা শীগ্‌গিরই আবার ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আমাকে খানিকটা ভাব্‌তে হবে। নিজের যখন বাস্তু-ঘর ব'লে একটা কিছু আছে, তখন আজ্‌কের এই মুক্তির দিনে প্রথম সেখানে গিয়েই দাঁড়ানো কর্ত্তব্য নয় কি!—বিপদের পথেও নেমেছিলাম যে সেই ঘর থেকেই! বারোখাদায়ই আজ ফিরে যাবো মনে ক'রছি, ঘোষ বাবু।"

মুখের উপর দিয়া খানিকটা পাণ্ডুরতা নামিয়া আসিল

মিঃ ঘোষের। কহিলেন, "আপনার সান্নিধ্য থেকে আমরা তবে বঞ্চিত হবো শ্রীমন্ত বাবু ?"

"ছিঃ, এ-কথা ব'লে কেন আমাকে আরও ঋণী ক'রছেন ? সেদিনই তো ব'লেছি, আপনার প্রয়োজনে যখনি আপনি কাছে ডাক্‌বেন, নিঃসঙ্কোচে এসে পাশে দাঁড়াবো। চরমুগরিয়ায় আপনার ব্রাঞ্চ আপিস না থাক্‌লে এতদিন আমিও যে কোথায়-কোথায় ফিরতাম, তারও যে ঠিক ছিল না ঘোষ বাবু। আপনাকে অবিশ্যি পেয়েছি পরে, কিন্তু আপনার ছায়াকে ভিত্তি ক'রে এতদিন সেখানে যাদের পেয়েছি, তাঁদের স্নেহের ঋণও যে আমার জীবনে অনেক বড়। শুধু মিঃ ব্রহ্মই তো ন'ন্, তাঁর মা আর বোন মালতি, কারুর কাছেই কম ঋণ র'য়ে গেল না আমার।" স্বল্প থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "চিঠি অবিশ্যি আমিও তাঁদের লিখ্‌বো, তবে কয়েকটা দিন যাক্, একটু স্থির ক'রে নিই।"

নিঃশব্দে একবার কলিং বেল টিপিলেন মিঃ ঘোষ।

বনমালী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

—"বাবুর জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এস।"

বাধা দিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "চা হ'লে মন্দ হয় না, কিন্তু খাবারের কিছু প্রয়োজন নেই।"

কিন্তু সে-কথায় কান দিলেন না মিঃ ঘোষ, বলিলেন, "একটু আগে যে ব'ল্‌ছিলেন, আজই ফিরে যাবেন, কিন্তু সে কী ক'রে হয় ? কাল বড় মিটিং র'য়েছে ওয়েলিংটন পার্কে, লালকেল্লায়

প্রথম বিচারের দিন কাল মেজর জেনারেল শা' নওয়াজ, লেপ্টানেন্ট্ সায়গল আর ধীলনের। আগেই তো ব'লেছি, তাঁদের হ'রে মুভ্ ক'রছেন পণ্ডিত জওহরলাল, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি। চোখের সাম্‌নে এ মিটিং ফেলে কি আপনারই মন যেতে চাইবে ?”

শ্রীমন্ত কহিল, “সত্যিই হয়ত যেতে চাইবে না। একটু আগেই এখানে আস্‌তে গিয়ে পথে তার পরিচয় পেয়েছি। জয়ধ্বনি তুলে একটা প্রকাণ্ড প্রোসেশন গেল পথ দিয়ে, কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটিয়ে তবে আপনার এখানে এসেছি।”

“তাই বলুন !” মিঃ ঘোষ পুনরায় স্বর তুলিলেন, “কিন্তু এখানে এসে উঠেছেন কোথায় আপনি, খাওয়া-দাওয়ারও তো প্রয়োজন আছে ! চেহারা দেখে যেমন মনে হ'চ্ছে, তাতে তো ও দু'টো সম্বন্ধে খুব বেশী ভরসা পাচ্ছি না !”

“ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই, খাওয়া-দাওয়া আমি পথেই সেরেছি, আর উঠেছি মানে—” কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীমন্ত বলিল, “সোজা যে এখানেই এলাম ! কোথাও তো বড় বেশী অপেক্ষা ক'রবার অবকাশ নেই, আপনার সাথে দেখা না ক'রে গেলে মনে সত্যিই শান্তি পেতাম না ; তাই তো এলাম ! আর চেহারা এ যা দেখ্‌ছেন, এর চাইতে ভালই বা কবে ? মাথায় কিছুটা তেল-জল প'ড়লেই আবার খানিকটা ধোপ্-দুরস্ত দেখাবে। এর জন্যে আপনি ভাব্‌বেন না ঘোষ বাবু।”

“কিন্তু না ভেবেই বা পারছি কোথায় ?” মিঃ ঘোষ

বলিলেন, "এই ভাবে কি কেউ আসে! তার চাইতে এক কাজ করুন, চা'টা খেয়ে নিয়ে চলুন আমার বাসার দিকে ছুটে পড়ি। ভালমতো বিশ্রাম না নিলে আপনার শরীর খারাপ ক'রবে।" তারপর থামিয়া কহিলেন, "জার্ণির পরে কি এই ভাবে ঠায় ব'সে কাটানো সম্ভব! চলুন, নিশ্চেষ্ট মনে গিয়ে খানিকটা রেষ্ট্ নেবেন; তা ছাড়া যেতে যখন আর্জ পারছেন না, তখন আর তাড়াহুড়ো ক'রবারই-বা এমন কি আছে।" বলিয়া একবার মুচ্‌কি হাসিলেন মিঃ ঘোষ।

বনমালী ইতিমধ্যে চা আর খাবার আনিয়া টেবিলে রাখিল।

কাপে উপর্য্যুপরি বার কয়েক চুমুক দিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "আমাকে মাপ ক'রতে হবে ঘোষ বাবু। বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রবার নিতান্ত দরকার। তা ছাড়া দীর্ঘদিন ক'ল্‌কাতায় আসি না। আমি বরং একটু ঘুরেই আসি। বিশ্রাম নেবার এখন কোনো প্রয়োজন নেই; আর তা ছাড়া আপত্তি যখন ক'রছেন, তখন আজকের দিনটা থেকে কাল রাত্রির ট্রেণেই রওনা হবো।"

চা এবং খাবারের কতকাংশ শেষ করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল শ্রীমন্ত। পোষ্ট্‌আপিসে আসিয়া সৌদামিনীকে টেলিগ্রাম করিল: "Coming on 22nd morning. Attend Station."—তারিখটি আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া নিলো পোষ্টাল ক্যালেণ্ডারে: হ্যাঁ ২২শেই বটে, ২১শে রাত্রি

৯ টায় ট্রেণে চাপিলে পরের দিন ভোরে যাইয়াই তো গাড়ি ভিড়িবে বারোখাদায়! নিশ্চিন্ত মনে এবারে তবে ঘোরা যাক্ খানিকটা।

এম্‌নি করিয়াই সমস্তটা দিন কাটিয়া গেল।

বনমালীকে বাসায় পাঠাইয়া শ্রীমন্তের খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই ইতিমধ্যে করিয়া রাখিয়াছিলেন মিঃ ঘোষ। রাত্রিটা বেশ নিশ্চিন্ত আরামেই কাটিল শ্রীমন্তের।

৫, বলদেব সিংহ লেন: চমৎকার দ্বিতল ফ্ল্যাট বাড়ী মিঃ ঘোষের। মিসেস্ ঘোষও চমৎকার আলাপী আপ-টুডেট্ মহিলা। ভালো লাগিল এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশকে শ্রীমন্তের। দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিয়া নিজেকে এতটুকুও দূরে রাখিতে চেষ্টা করিল না সে। বৎসর দশ বারোর একটি মাত্র মেয়ে মিঃ ঘোষের: গানে আর নাচে এই বয়সেই বেশ কিছুটা শান্তিনিকেতনী আর্টে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। নাম কেতকী।

মিসেস্ ঘোষই একসময় উপযাচক হইয়া বলিলেন, "একটা গান গেয়ে শোনাও না মা শ্রীমন্ত বাবুকে! জানো না, প্রকাণ্ড একজন স্বদেশী কর্ম্মী উনি, গানটাও তোমার নিশ্চয়ই স্বদেশী হবে মনে করি।"

প্রথমটা কতকটা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল কেতকী, তারপর বাক্স হইতে হারমোনিয়মটা টানিয়া নিয়া কচিকণ্ঠে সুর ধরিল:

'এই কথাটা ধ'রে রাখিস্
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে-পথে তোর যেতেই হবে।
'অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুসী হ'য়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।'—

আশ্চর্য্য হইয়া গেল শ্রীমন্ত। এতটুকু কচি মেয়ে এই কেতকী কেমন করিয়া এতবড় কঠিন গান আয়ত্ব করিল! অদ্ভুত প্রকাশ ভঙ্গী ও সুর-তরঙ্গ।

হারমোনিয়মের রীডের উপরে তখনও কেতকীর কচি কচি আঙুলগুলি মন্থরগতিতে চলিতেছে :

'পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে,
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁক্‌ড়ে লয়ে'
মরিস্ নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ আঘাত খেতেই হবে!'

গান থামিলে মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই, কিন্তু থাক্‌লে আমাদের জাতীয় বিপ্লবের অনেক উপকার হ'তো।"

"সে কথা স্বতন্ত্র।" শ্রীমন্ত কহিল, "কিন্তু আমি ভাব্‌চি, এই বয়সে ও এমন গান শিখ্‌লো কি ক'রে?"

স্বর তুলিলেন এবারে মিসেস্‌ ঘোষ: "নিতান্ত ভগবানের দান ব'লে, নইলে গান বা লেখাপড়িতে কখনো কি ওর মন ব'স্‌তে চায়!"

হাসিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "সংসারে মা-বাবারা চিরকাল তাঁদের সন্তানদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তুলে আস্‌চেন। অথচ ভাবি, সন্তানেরা নিহিলিষ্ট্‌ বিদ্রোহীদের মতো যদি কখনো কিছু একটা জেহাদ ঘোষনা ক'রতো, তবে কি কাণ্ডটাই না হ'তো! আসলে ওটুকু হ'চ্ছে স্নেহের রাগ! কেতকীকে যে ওর এই বয়সেই একটি জুয়েল তৈরী ক'রেছেন, তাতে সন্দেহ কি!" বলিয়া কেতকীকে কাছে টানিয়া নিয়া আদরের সঙ্গে মৃদু চুম্বন করিল একবার শ্রীমন্ত। বলিল, "আবার যখন ঘুরে আসবো, তখন অনেকগুলো গানের বই কিনে দেবো তোমাকে কেতকী। আরও অনেক গান শোনাবে তখন আমাকে, কেমন?"

ঘাড় দোলাইয়া কেতকী কহিল, "আর ছবির বই?"

"হ্যাঁ—ছবির বইও দেবো বৈ কি লক্ষ্মীটি!"

ঘোষ পরিবারের সারা ঘরের একমাত্র আদরের মেয়ে

কেতকী। মেয়ের সুখ্যাতিতে মায়ের সমস্তখানি অন্তর খুসীতে আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শ্রীমন্ত যদি ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পারিত—কেমন এক অপূর্ব্ব আলোকে মিসেস্ ঘোষের তিল-শোভিত গৌরকান্তি মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন মিঃ ঘোষও।...

ভোরে ঘুম ভাঙিল নিচেকার বাহিরের পথের জিন্দাবাদ ধ্বনিতে।

জড়তা তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। গতদিন শরীরের উপর দিয়া কতখানি যে পরিশ্রম চলিয়া গিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে যেন তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল শ্রীমন্ত।

মিঃ ঘোষ আসিয়া কহিলেন, "ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন শ্রীমন্ত বাবু? সম্ভবতঃ প্রভাত-ফেরী কেবল বেরুল। উঠে পড়ুন এবারে, কেতকীর মা তাড়া দিয়েছেন, উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে অপেক্ষা ক'রছেন অনেকক্ষণ থেকে।"

এ-বাড়ীর ঘুম যে এত ভোরে ভাঙে, তাহা কল্পনাতেই আনিতে পারে নাই শ্রীমন্ত। তাই একরকম সলজ্জভাবেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল সে এবারে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া আসিয়া খানিকটা সহজ হইয়া বসিল।

চা এবং আনুসঙ্গিক খাবার আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আজই তো সম্ভবতঃ রওনা হ'য়ে যাচ্ছেন ? আটকিয়ে অবিশ্যি আর রাখবো না, কারণ কাজ আর কর্ত্তব্যকে যারা বাধা দেয়—জানি, মানুষের ধর্ম্মকে তারা আঘাত করে। অথচ এই একবেলা বা একদিনের কাছে-পাওয়াকেও মন ঠিক মেনে নিতে চায় না। কবে যে একেবারে আপনাকে কাছের ক'রে পাবো, ব'লতে পারেন শ্রীমন্ত বাবু ?"

"কেউ কি ব'লতে পারে সে কথা ?" শ্রীমন্ত কহিল, "মানুষের অক্ষমতা যে সেইখানেই। অথচ কাছের ক'রে পেয়েও যে আনন্দ নেই ঘোষ বাবু ! বাগান থেকে যে ফুল তুলে এনে ঘরে রাখি, তাও যে একসময় মনের সমস্তখানি প্রীতিবোধের কাছেই বাতিল হ'য়ে যায়। দূরকে দূর থেকে দেখি ব'লেই আমরা আনন্দ পাই। সেই আনন্দটুকুই মনে স্মৃতির রেখায় অটুট হ'য়ে থাকে। কাছের পাওনা নিয়ে যে মনের রঙিণতা বেশীদিনের নয়। একথা কি আপনিই স্বীকার ক'রবেন না ?"

মিঃ ঘোষ যেন এবারে হঠাৎ কেমন থামিয়া গেলেন ; তারপর কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আপনি কি তা হ'লে ব'ল্‌তে চান শ্রীমন্ত বাবু, মানুষ চিরদিন মানুষের কাছে এই দূর রচনা ক'রেই চ'ল্‌বে ! তাতে আপনার কথানুযায়ী ঐ সৌন্দর্য্য কিছুটা রক্ষা পেতে পারে হয়ত, কিন্তু স্বস্তি নেই। যে সংস্কৃতির আদর্শ আমরা সমস্ত মজ্জায় অনুভব করি, তাতে মানুষকে মানুষের কাছের ক'রেই ভাব্‌তে শিখেছি। দূরের

ক'রে ভাব্‌তে যাওয়া যে কতবড় পীড়াদায়ক, তা ঠিক বোঝাতে পারি না।...”

ইতিমধ্যে সাম্‌নেই বড় রাস্তার মোড় হইতে আর একবার তীব্র জয়ধ্বনির শব্দ কানে আসিল: ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ, চলো চলো দিল্লী চলো; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক...।

বাধা পড়িল কথায়। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াই শ্রীমন্তের ইচ্ছা ছিল বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এ-বাড়ীর নতুন এই পরিবেশের মধ্যে তাহা পারিয়া ওঠে নাই। এবারে সেই ধ্বনির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শ্রীমন্ত কহিল, “আবার একটি প্রোসেশন যাচ্ছে: সম্ভবতঃ খুব বড় প্রোসেশন এটি। আমি বরং উঠি, একবার ঘুরে দেখে আসি। আপনি যে কথার অবতারণা ক'রছেন, তা নিয়ে দ্বিরুক্তি ক'রতে গেলে সময় এগিয়ে যাবে অনেক। তবে আমার দিক দিয়ে শুধু এইটুকুই ব'ল্‌তে পারি যে, অপ্রয়োজনের পথেও যত দূরেই যখন থাকি না কেন, চিরদিন অত্যন্ত বেশীই মনের কাছাকাছি থাক্‌বো আপনাদের। আপনাদের ঋণ যে এক-জন্মেই শোধ হবার নয় ঘোষ বাবু!”

এতটুকুও আর বিলম্ব করিল না শ্রীমন্ত। একরকম ত্রস্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিসেস্ ঘোষ আসিয়া কহিলেন, “স্নান-খাওয়া-দাওয়া না ক'রেই উনি বেরিয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি ফিরবেন তো!”

“উনিই জানেন।” হাসিয়া মিঃ ঘোষ কহিলেন, “সংগ্রামশীল

জীবন, অনেকটা খেয়ালীও বটে ; সময় মতো এসে খাওয়া-দাওয়া করেন কিনা, কি ক'রে বলি !"

"না-ই যদি ব'ল্তে পারবে, তবে ওঁকে বেরুতেই বা দিলে কেন ?" কতকটা উৎকণ্ঠার সুরেই মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "দেখ না একবার নিচে নেমে গিয়ে ? অতিথ মানুষকে ভাল ক'রে যত্ন ক'রতেও জানো না তোমরা। কেবল জানো আল্গা তর্ক ক'রতে আর মোটা মোটা কথা আওড়াতে।"

আড়ালে থাকিয়া নিশ্চয়ই এতক্ষণ তবে এদিকের আলোচনাটা কান পাতিয়া শুনিয়াছেন মিসেস্ ঘোষ। কি বিষয়ের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করিলেন, তা এবারে বুঝিতে তাই আর বাকী রহিল না মিঃ ঘোষের। স্ত্রীকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে কঠিন ; তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া গিয়া একবার নিচের তলা ও রাস্তার কিছুটা অংশের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আসিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও আর শ্রীমন্তের ছায়াটুকুও দেখা গেল না। ততক্ষণে সে একেবারে ঐ শোভা-যাত্রার বিপুল জন-সমুদ্রের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এপাশে ওপাশে অনবরত ছুটিতেছে মিলিটারী ট্রাক, লরী আর ছোট ছোট জিপ্ গুলি। একটা বিশেষ রকমের সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে আজকের জন্য, স্পষ্টই বোঝা গেল। পর-পর দুইটি লরী বোঝাই বন্দুকধারী মিলিটারী গোরাসৈন্য দ্রুতবেগে চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। বেলা বাড়িয়াছে অনেক-

খানি। প্রস্তরময় মহানগরীর বুকে নভেম্বরের শীতাস্তরণ নামিয়া আসিলেও তাহা ধরা কঠিন। রোদে খাঁ খাঁ করিতেছে চারিদিক; তাহার মধ্যেই শোভাযাত্রা চলিয়াছে দৃপ্ত পদক্ষেপে, দুইপাশের বাড়ীগুলিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে গগনচুম্বী দীপ্তধ্বনি : জয় হিন্দ্,...চলো চলো দিল্লী চলো,...আই-এন-এ-বন্দীদের মুক্তি চাই,...ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ...। সমস্বরে ধ্বনি তুলিয়াছে শ্রীমন্তও। লালকেল্লার সদর দুয়ারে যাইয়া আঘাত করিবে বৈ কি এই ধ্বনি!

আবার একটা ট্রাক্ পাশ দিয়া শাঁ করিয়া চলিয়া গেল। শোভাযাত্রীদের মধ্যেই কে একজন কাছাকাছি অন্যান্য কয়েক-জনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "চলো, হ্যারিসন রোড্, কলেজ ষ্ট্রীট্ হ'য়ে সোজা ওয়েলিংটন পার্কে যাই।"

দূর হইতে দেখা গেল, ছোট বড় অসংখ্য ছেলে বই হাতে আগাইয়া আসিতেছে এই দিকেই। বিভিন্ন ইস্কুল আর কলেজের ছাত্র ওরা। স্কুল আর কলেজের দুয়ারে দুয়ারে পিকেটিং করিয়াছে আজ ওরা প্রত্যেকেই। প্রত্যেকেরই আজ এক দাবী, প্রত্যেকের মুখেই আজ এক ধ্বনি : সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্, আই-এন-এ-বন্দীদের মুক্তি চাই, ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ্, চলো চলো দিল্লী চলো...।

সুদূর বন্দর-জীবনের নিভৃতে বসিয়া কাগজের পৃষ্ঠায় সরকারী সেন্সারে মার্জ্জিত যে সামান্য ঘটনাটুকু এতদিন লক্ষ্য

করিয়া আসিয়াছে শ্রীমন্ত, আজ তাহার অনবরুদ্ধ প্রকাশ্য বাস্তবরূপ দুই চোখ ভরিয়া দেখিল সে। এও তার জীবনের একটা মস্তবড় অচিন্তনীয় বিচিত্র অধ্যায়।...

জন-সমুদ্রের আবর্ত্তে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে ওয়েলিংটন পার্ক। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের হাতে হাতে কলম আর পেন্সিল নড়িয়া উঠিয়াছে সর্ট্‌হ্যাণ্ড্‌-নোটবুকের পাতার 'পরে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন আসিয়া এক-একজন কর্ম্মী আর জননায়ক : 'বৃটিশ সরকারকে স্পষ্টভাবে আজ এদেশ ছেড়ে চ'লে যাবার সময় এসেছে! শক্তি আর কর্ত্তব্যের পরিচয় তারা আজ পর্য্যন্ত কম দেয় নি। এখন জোড়-হাত হ'য়ে নিবেদন ক'রছি, 'অনুগ্রহ ক'রে এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের পিতৃরাজ্যে ফিরে যাও কর্ত্তারা। আমাদের মাতৃভূমির জন্যে মরণ পণ ক'রে আমাদেরই যে-সব ভাইয়েরা অস্ত্র ধ'রেছিল দুর্গম সমর-ক্ষেত্রে, একমাত্র ভ্রাতৃত্বের অধিকারেই আমরা আজ তাদের মুক্তি চাই। চল্লিশ কোটি নরনারীর এই দাবী যদি ব্যর্থ হয়, তবে ব্যর্থ হ'তেও আর বিলম্ব নেই তোমাদের শাসন-প্রচেষ্টার।' বন্ধুগণ, হাতে হাত মিলিয়ে ধ্বনি তুলুন—জয় হিন্দ্‌, নেতাজী কি জয়।...'

গগন-ভেদী ধ্বনি উঠিল পার্কের বুক চিরিয়া। সাথে সাথে রাস্তার এপাশ ওপাশ হইতে আরও একটা ধ্বনি উঠিল, মানুষের কণ্ঠের নয় : গুলির : বুলেটের। মিলিটারী

সৈন্যেরা বন্দুক উঁচাইয়া ধরিয়াছে শক্ত হাতে, বন্যশক্তিতে নীল রগগুলি চামড়া ভেদ করিয়া আসিয়াছে সেই হাতে। ফট্ ফট্...ঠাস্...ঠাস্—গুড়ুম। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে চলিয়াছে ফাঁকা আওয়াজ আর গুলি।

সভার শেষে আবার শোভাযাত্রা সাম্‌নের পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইতেছিল, গুলির মুখে সহসা তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল : বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল জনতা।

ওদিকে ম্যাডান্ ষ্ট্রীট্ হইতে আর-একদল শোভাযাত্রী আগাইয়া আসিতেছে এইদিকেই।

এই মুহূর্ত্তে কি করা কর্ত্তব্য, কোন্ পথে চলিলে প্রকৃত নিরাপত্তার মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সম্ভব, সহসা কিছু একটা তাহার বুঝিয়া উঠিল না শ্রীমন্ত।

পার্কের গেটের মুখে আগাইয়া আসিতে যাইয়া ইতিমধ্যে কে একটি স্কুলছাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল : "উই নো হাউ টু রেস্‌পণ্ড্ দীজ বুলেট্‌স্, ভয় কি বন্ধুরা, এগিয়ে এস।"

বীরের মতো আগাইয়া আসিয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইল ছেলেটি সেই গুলির সামনে। চেষ্টা করিয়াও সে-পথ হইতে তাঁহাকে কেহ ফিরাইতে পারিল না, না শ্রীমন্তও। জনতার উচ্চ কলরবের মধ্যে-শ্রীমন্তের কণ্ঠস্বর ম্লান হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আবার গুরুগর্জ্জনে শব্দ হইল : ঠাস্...ঠাস্... গুড়ুম। গুলি আসিয়া বিদ্ধ হইল ছেলেটির বুকে। চোখের নিমিষে ধরাশায়ী হইয়া গেল তার সমস্ত দেহটা। দক্ষিণ

কলিকাতার কোন্ এক ব'নেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের আদর্শ সন্তান রাঘবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ গুলিবিদ্ধ বুক হইতে শেষ-বারের মতো আর-একবার যেন তার সেই সমস্তখানি প্রাণ-নিংড়ানো ধ্বনি উত্থিত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল—'উই নো হাউ টু রেস্‌পণ্ড্ দীজ বুলেট্‌স্, ভয় করি না আমরা গুলিকে. দেশের জন্যে মরণ বরণ ক'রতেও আমাদের দুঃখ নেই, এগিয়ে এস বন্ধুরা, আমাদের আজ সর্ব্বশেষ দাবী—আই-এন্-এ-বন্দীদের মুক্তি চাই, মুক্তি চাই সমস্ত রাজবন্দীদের।'

দেখিতে দেখিতে একটা শোকার্ত্ত কালো বিষাদে ভরিয়া উঠিল পার্কের সমস্তখানি আকাশ। যে শোভাযাত্রা সমস্তটা দিন ধরিয়া মহানগরীর প্রত্যেকটী রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়াছে বিপুল বিজয়ে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার যেন জীবন-তন্ত্রী আকস্মিক এই তীব্র আঘাতে কখন্ ঢিলা হইয়া গেল! ধীরে ধীরে সেই বিপুল জনতা শবানুগমন করিয়া চলিল শ্মশানের দিকে। হায় হতভাগ্য ভারতবাসি! হায় হতভাগ্য ভারত-বিধাতা!

সমস্তটা দিনের মধ্যে এক ফোটা জল পর্য্যন্ত পড়ে নাই শ্রীমন্তের মুখে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা এতক্ষণের মধ্যে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে আসে নাই।

মিসেস্ ঘোষ সারা বেলা অতিথি-আপ্যায়নের ব্রত লইয়াই বসিয়াছিলেন। মিঃ ঘোষের এখানে ওখানে নানাকাজ, তা ছাড়া আপিস; ছুটির দিনে পর্য্যন্ত বসিয়া কাটাইবার লোক ন'ন

তিনি। আদৌ ভাল লাগিতেছিল না মিসেস্ ঘোষের। কেতকীকে একবার কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "ছাখ্ তো মা একবার জান্‌লা দিয়ে নিচে উঁকি দিয়ে, দেখ্‌তে পাস কি না!"

এটুকু মিসেস্ ঘোষের নিতান্তই আত্মগত সান্ত্বনা।

জান্‌লার দিকে কিছুটা মুখ বাড়াইয়া কেতকী বলিল, "কৈ, তিনি তো নেই, বাবা আস্‌ছেন।"

মিসেস্ ঘোষ পুনরায় কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ঘোষ আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন, "শ্রীমন্ত বাবু নিশ্চয়ই ফেরেন নি, কি বলো? ফিরবেনই বা কি, ওদিকে যা অবস্থা ওয়েলিংটনে, তাতে ক'রে তাঁর মতো ঐ রগ-চটা লোক কি ঘরে এসে ব'সে থাক্‌তে পারেন! তবে ভয় হ'চ্ছে, যেমন ক'রে গুলিগোলা চ'লেছে, তার মধ্যে নিজেকে তিনি সেরে চ'ল্‌তে পারছেন কি না! বুঝ্‌লে কেতুর মা, ওঁদের জীবনের দাম আছে।"

শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল মিসেস্ ঘোষের। গুলি-গোলার কথা শুনিয়া বুকখানি একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল তাঁহার। কহিলেন, "দামই যদি থাক্‌বে, তবে এই সারাটা দিনের মধ্যে একবারও কি ভদ্রলোকের খোঁজ ক'রে উঠ্‌তে পারলে না? নিজেও দিব্যি নির্ব্বিকারভাবে বাইরে বাইরে কাটিয়ে এলে; আমার আর কি, ভদ্রলোক বাড়িতে এলেন, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে নাক-কান কাটা যাবে তোমারই।—"

কিন্তু নাক-কান কাহার কাটা যাইবে, কাহার থাকিবে—

সে বিচার পরে। কথার মাঝখানেই দরজার বাহিরে সহসা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন এবারে উভয়েই।

কেতকী যাইয়া দরজা খুলিয়া দিতেই শ্রীমন্ত আসিয়া প্রবেশ করিল। কলিকাতার রাজপথে তখন বিকাল গড়াইয়া সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

উৎকণ্ঠার সুরে মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "আচ্ছা আপনি কেমন লোক বলুন তো? বলি ক্ষিধে-তেষ্টাও তো মানুষের থাকে, আপনার কি সেটুকুও নেই?"

"থাক্‌লে বোধ হয় বেঁচে যেতাম।" শ্রীমন্ত কহিল, "অন্ততঃ সুবোধ বালকের মতো যথাসময়ে ঘরে এলেও নতুন ক'রে আজ আবার একটা কঠিন দুঃখের তাপ বোধ ক'রতে হ'তো না।" তারপর স্বল্প থামিয়া মিঃ ঘোষকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যেই কি আমাকে একটা দিন আটকিয়ে রেখেছিলেন ঘোষ বাবু?"

অলক্ষ্যেই টস্-টস্ করিয়া দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল শ্রীমন্তের বেদনাকাতর চক্ষু বাহিয়া।

একটা বিশ্রী আবহাওয়ায় সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া গেল। কাহারও মুখেই একটি কথাও প্রকাশ পাইল না।

ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিবৃত করিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় কহিল, "চিরকাল এরা এদের উদ্ধত বেয়নেট দিয়েই আমাদের দেশের দাবীকে দাবিয়ে রাখ্‌লো। অহিংস জনতা নির্ব্বিবাদে

তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই তো শবানুগমন ক'রলো! কিন্তু ক'টা বেয়নেট্ আছে ওদের হাতে? এই উত্তাল জন-সমুদ্র মহা প্লাবনের মতো যদি ঝাপিয়ে প'ড়তো তাদের উপর, তবে কি এই গণশক্তির আজকেই একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা হ'য়ে যেতো না! কী অপরাধে ম'রলো আজ রাঘবেন্দু, ব'ল্তে পারেন ঘোষ বাবু?"

"যে অপরাধে এই পৌনে দু'শো বছর ধ'রে এই দেশ পরাধীন আর পর-শাসিত, ঠিক্ সেই অপরাধেই শ্রীমন্ত বাবু।" রুদ্ধ কণ্ঠে মিঃ ঘোষ বলিলেন, "একটুকুও বিস্মিত হই নি আমি আজ্‌কের এই দুঃসংবাদে। এও আমাদের জাতির জীবনে একটা মস্তবড় শিক্ষা! রাঘবেন্দুর পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্যে ভগবানের কাছে কর-যোড়ে প্রার্থনা করা ভিন্ন আজ আমাদের আর কোনো কিছুই ক'রবার নেই শ্রীমন্ত বাবু।" বলিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন মিঃ ঘোষ, তারপর পুনরায় কহিলেন, "আসুন, সারাদিন তো উপোষে কাটিয়ে আমাদের পাপের ভাগী ক'রলেন, এবারে বিশ্রাম ক'রে খাওয়া-দাওয়া সারুন; এরপর যদি আপনাকে সত্যিই গাড়ী ধ'রতে হয়, তবে আর সময় পাবেন না। অবিশ্যি সেই সময়ের সুযোগ দিতে একটুও প্রাণ চাইছে না।"

কিছুক্ষণ অভিভূত মনে কি চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, "নতুন ক'রে আজ আবার বাধা দেবেন না ঘোষ বাবু। আবার শীগ্‌গিরই যে আস্‌তে হবে এ-পথে!

কাগজে-পত্রে যেমন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে ক'রে সাম্‌নের জানুয়ারীর গোড়ার দিকেই সম্ভবতঃ ক'ল্‌কাতায় এসে প'ড়বেন মহাত্মাজী, আজাদ, জওহরলাল প্রভৃতি। ইলেক্‌শনের কাজেরও তোড়জোড় লেগে যাবে ক'দিন পর থেকেই। আবার যে আস্‌তেই হবে সেই সময়ে। এত কাছে পেয়েও যদি মহাত্মাজীর একবার দর্শন না পাই, তবে যে অনুশোচনার আর শেষ থাক্‌বে না! আজ খুসী মনেই আমাকে বিদায় দিন ঘোষ বাবু, নইলে যাবার মুহূর্ত্তে যথেষ্ট ক্ষোভ থেকে যাবে।"

বাধা দিলেন না মিঃ ঘোষ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে রাত্রির গভীরতা ফুটিয়া উঠিতেছিল চারিদিকে। কহিলেন, "অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো সবসময়ই আপনার জন্যে। জানি, আপনারা শুধু পীড়ন সইতেই আসেন না, যুগে যুগে সহস্র অন্যায়ের মধ্যে মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাতেই আপনারা আবির্ভূত হন শ্রীমন্ত বাবু। আপনাদের কাছে দেশের কি কম ঋণ! সেই ঋণের ভার আমিও বইব বৈ কি!"

শ্রীমন্তের মুখে এবারে এতটুকুও আর ভাষা প্রকাশ পাইল না। ত্রস্তে আহারাদি সমাপন করিয়া মিসেস্ ঘোষের সঙ্গে সামান্য দুই একটি মাত্র কথা বলিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল সে। এত অল্প দর্শনের মধ্যেও কেতকীরও বড় ভাল লাগিয়া গিয়াছিল শ্রীমন্তকে। কাছে আসিয়া একসময় পুরানো কথাটি আর একবার মনে করাইয়া দিয়া কহিল, "মনে আছে তো— ছবি আর গানের বই?"

"বাঃ, মনে আবার থাক্‌বে না! ফিরেই আসি আগে. তারপর দেখো, বই দিয়ে তোমাকে একেবারে ঢেকে ফেল্‌বো।" বলিয়া মৃদুহাতে একবার কেতকীর চিবুক ধরিয়া আদরে নাড়িয়া দিল শ্রীমন্ত, তারপর মিঃ ও মিসেস্ ঘোষকে বিদায় নমস্কার করিয়া পথে আসিয়া বাস ধরিল। পৌঁছিল আসিয়া শিয়ালদায়। মন হইতে তখনও সমস্তদিনের ঘটনাবলীর একটি স্তরও মুছিয়া যায় নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘটনাগুলি কেবলই আসিয়া মনকে অনবরত আঘাত করিতেছিল, আর তাহারই মধ্যে কখন্ অলক্ষ্যে না জানি বড় স্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠিতেছিল সৌদামিনীর মুখখানি।

ট্রেণ ছাড়িতে আদৌ দেরী ছিল না। দ্রুতপায়ে আসিয়া টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল শ্রীমন্ত। হুইসেল দিয়া প্লাটফর্ম্ম ত্যাগ করিল গাড়ী, তারপর ক্রমান্বয়ে ছুটিয়া চলিল অন্ধকার রজনীকে সচকিত করিয়া নতুন প্রভাত-সূর্য্যের পথে। ষ্টেশনগুলি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে যাত্রী আর ভ্যাণ্ডারদের সচকিত কলকণ্ঠে; কুলারা একে একে অন্ধকার প্লাটফর্ম্মে জড়ো হইয়া হাঁকিয়া উঠিতেছে: দমদম···বারাকপুর···নৈহাটি··· রাণাঘাট···পোড়াদহ।—সরিসৃপের মতো ইস্পাতী লাইনের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়াছে হু-হু শব্দে। এতটুকুও ঘুমের জড়তা নাই শ্রীমন্তের চোখে। টেলিগ্রামটা সময়মতো যাইয়া নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে সৌদামিনীর হাতে। নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া

গিয়াছে সে। আশ্চর্য্য হইবারই কথা যে! শ্রীমন্ত নিজেই যে এখন পর্য্যন্ত কিছু একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বীরেশ্বর সাহা চৌধুরীর সাথে সেই ঘটনার পর হইতে তাহার ভাগ্য-লিপির পৃষ্ঠাগুলি যেন কেমন একটা দ্রুত তালেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই পরিবর্ত্তনের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে সমস্ত সত্তায়, ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে ধমনীর প্রতিটি বিন্দু রক্ত-সঞ্চালনের মধ্যে। যে গণ-জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছে সে এতদিন তাহার নিভৃত জীবন-তরঙ্গের প্রতিটি দোলায়, আজ স্পষ্টই তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গেল মহানগরীর পথে-পথে আর ওয়েলিংটন্ পার্কে। সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে আজ শঙ্খ-চক্রে সাজিয়া উঠিয়াছে নবীন কালের চক্রধারী। এই বিপুল চক্র-শক্তির উদ্দেশেই সম্ভবতঃ সেদিন তাঁহার শেষ বিদায়-মুহূর্ত্তে আহ্বান বাণী রাখিয়া গিয়াছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঃ

···বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।

প্রস্তুতি আসিয়াছে আজ সমস্ত দিকে। মিথ্যা বলে নাই সেদিন সৌদামিনী—শ্রীকৃষ্ণের দেশ এই ভারতবর্ষ; মিথ্যাচারে কলঙ্কিত কুরুরাজত্বের মিথ্যা অভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ধীরে ধীরে

যবনিকা নামিয়া আসিতেছে তার সেই ব্যর্থ রঙ্গমঞ্চের উপর। আর তাহারই আড়ালে দীপ্ত রশ্মিতে জাগিয়া উঠিতেছে নতুন যুগের নতুন সূর্য্য ; ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে সেই সোনালী সূর্য্যোদয়ের প্রচণ্ডতম সুন্দর মুহূর্ত্ত রাত্রির এই অন্ধকারের সমাধি-শিয়রে।

হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ট্রেণ। যাত্রীর ভিড়ে ভরিয়া উঠিয়াছে কম্পার্ট্‌মেণ্ট। তাহারই মধ্যে অদ্ভুত ভাবে একবার হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত। প্রস্তুতি আসিয়াছে আজ সমস্ত দিকে, প্রস্তুতি আসিয়াছে এই প্রতিদিনের নিষ্পিষ্ট জীবন-সত্তার স্তরে স্তরে। তাহারই পূর্ণতম বিকাশ এই বিক্ষুব্ধ জনতা, সত্যাশ্রয়ী চক্রধারী এই গণশক্তি।

এক ঝলক মিঠে বাতাস বহিয়া গেল। কখন্ যে রাজবাড়ী জংশন ছাড়াইয়া আসিয়াছে ট্রেণ, লক্ষ্য করে নাই শ্রীমন্ত : ছাড়াইয়া আসিয়াছে ছোট্ট ষ্টেশন খান্‌খানাপুরও। বাহিরের ঐ মিঠে বাতাসের মতই সহসা তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে কেমন যেন একটা খুসীর হাওয়া বহিয়া গেল। লাল সূর্য্যের আভা দেখা দিয়াছে পূর্ব্ব দিগন্তে। হুইসেল দিয়া একটু সাম্‌নে আসিয়াই থামিয়া গেল গাড়িটা।—বারোখাদা। এই তো তাহার সেই আজন্মের সাধন-ভূমি বারোখাদা। পূব-পশ্চিমে প্রসারিত ডবল-লাইন রেল-পথ, ওদিকে ধূ ধূ করে ছাড়া মাঠ। জঙ্গ্‌লা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে আজ সেই মাঠের চারিপাশ। হায় ষ্টেশনমাষ্টার কৈলাশ চক্রবর্ত্তী !

ফুটবোর্ডে পা দিয়া ত্রস্তে নামিয়া আসিতেই কাছে আসিয়া শ্রীমন্তের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল সৌদামিনী। পিছন হইতে সহসা বিপুল শব্দে ধ্বনি করিয়া উঠিল করিম সেখ আর তার দল। এতদিনে আজ তাহারা আবার তাহাদের মথুর দাদাবাবুকে ফিরিয়া পাইয়াছে। সমস্ত দেশের এই বিপুল গণ-অভ্যুত্থানের দিনে আজ তাহারাই কি পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারে?

লেখকের অন্যান্য বই

সমাজ-দর্শন

[সামাজিক দর্শন-সাহিত্য]

বিপ্লব

[মনস্তাত্ত্বিক গল্প সংগ্রহ]

সব্যসাচী

[কিশোর-উপন্যাস]

শতাব্দী

[জাতীয়তাবোধক কাব্য]

কীর্ত্তনখোলা

[গল্প-সিরিজ]

o

—যন্ত্রস্থ—

শোণিত-স্বর্গ

শেষ রাগিণী